পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ

(সাধকভাব)

স্বামী সারদানন্দ

চতুর্থ সংস্করণ।

(সংশোধিত)

আশ্বিন, ১৩৩৩

মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

প্রকাশক—
স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ
উদ্বোধন কার্য্যালয়,
১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার,
কলিকাতা।
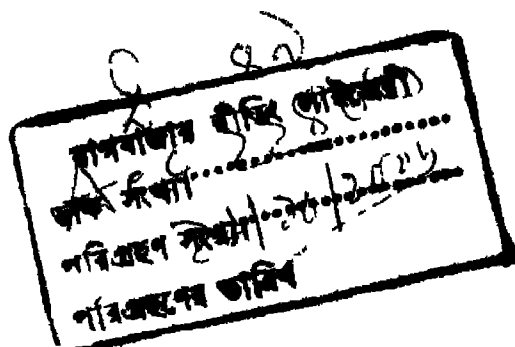
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার,
৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৬১৯।২৬

গ্রন্থ পরিচয়।

ঈশ্বরেচ্ছায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক সাধকভাবের আলোচনা সম্পূর্ণ হইল। ইহাতে আমরা তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব সাধনানুরাগ এবং সাধনতত্ত্বের দার্শনিক আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, কিন্তু সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ঠাকুরের জীবনের সকল প্রধান ঘটনাগুলির সময়নিরূপণপূর্ব্বক ধারাবাহিক ভাবে পাঠককে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। অতএব সাধকভাবকে ঠাকুরের সাধক-জীবনের এবং স্বামী শ্রীবিবেকানন্দপ্রমুখ তাঁহার শিষ্যসকল তাঁহার শ্রীপদপ্রান্তে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত জীবনের ইতিহাস বলা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান গ্রন্থ লিখিতে বসিয়া আমরা ঠাকুরের জীবনের সকল ঘটনার সময়নিরূপণ করিতে পারিব কি না তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দিহান ছিলাম। ঠাকুর তাঁহার সাধক-জীবনের কথাসকল আমাদিগের অনেকের নিকটে বলিলেও, উহাদিগের সময়নিরূপণ করিয়া ধারা-বাহিক ভাবে কাহারও নিকটে বলেন নাই। তজ্জন্য তাঁহার ভক্ত-সকলের মনে তাঁহার জীবনের ঐকালের কথাসকল দুর্ব্বোধ্য ও জটিল হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু অনুসন্ধানের ফলে আমরা তাঁহার কৃপায় এখন অনেকগুলি ঘটনার যথার্থ সময়নিরূপণে সমর্থ হইয়াছি।

ঠাকুরের জন্ম-সাল লইয়া এতকাল পর্য্যন্ত গণ্ডগোল চলিয়া আসিতেছিল। কারণ, ঠাকুর আমাদিগকে নিজ মুখে বলিয়াছিলেন, তাঁহার যথার্থ জন্মপত্রিকাখানি হারাইয়া গিয়াছিল এবং পরে যেখানি করা হইয়াছিল, সেখানি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। একশত বৎসরেরও অধিক

কালের পঞ্জিকাসকল সন্ধানপূর্ব্বক আমরা এখন ঐ বিরোধ মীমাংসা করিতেও সক্ষম হইয়াছি, এবং ঐজন্য ঠাকুরের জীবনের ঘটনাগুলির সময় নিরূপণ করা আমাদের পক্ষে সুসাধ্য হইয়াছে। ঠাকুরের ৺ষোড়শী পূজা সম্বন্ধে সত্যঘটনা কাহারও এতদিন জানা ছিল না। বর্ত্তমান গ্রন্থপাঠে পাঠকের ঐ ঘটনা বুঝা সহজ হইবে।

পরিশেষে, শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া গ্রন্থখানি লোক-কল্যাণ সাধন করুক, ইহাই কেবল তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা। ইতি—

প্রণতঃ

গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

বিষয় পৃষ্ঠা

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

বিষয় | পৃষ্ঠা

দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

বিষয় পৃষ্ঠা

বেদান্তসাধনের শেষ কথা ও ইসলাম ধর্ম্মসাধন ... ২৯২—৩০৪

সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

ত্রিংশ অধ্যায়।

বিষয় পৃষ্ঠা

একত্রিংশ অধ্যায়।

পরিশিষ্ট।

বিষয় পৃষ্ঠা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

অবতরণিকা।

সাধকভাবালোচনার প্রয়োজন।

আচার্য্যদিগের সাধক-ভাব লিপিবদ্ধ পাওয়া যায় না।

জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসপাঠে দেখিতে পাওয়া যায়, লোক-গুরু বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্য ভিন্ন অবতারপুরুষসকলের জীবনে সাধকভাবের কার্য্যকলাপ বিস্তৃত লিপিবদ্ধ নাই। যে উদ্দাম অনুরাগ ও উৎসাহ হৃদয়ে পোষণ করিয়া তাঁহারা জীবনে সত্যলাভে অগ্রসর হইয়াছিলেন, যে আশা নিরাশা, ভয় বিস্ময়, আনন্দ ব্যাকুলতার তরঙ্গে পড়িয়া তাঁহারা কখনও উল্লসিত এবং কখনও মুহ্যমান হইয়াছিলেন—অথচ নিজ গন্তব্যলক্ষ্যে নিয়ত দৃষ্টি স্থির রাখিতে বিস্মৃত হন নাই, তদ্বিষয়ের বিশদ আলোচনা তাঁহাদিগের জীবনেতিহাসে পাওয়া যায় না। অথবা, জীবনের শেষভাগে অনুষ্ঠিত বিচিত্র কার্য্য-কলাপের সহিত তাঁহাদিগের বাল্যাদি কালের শিক্ষা, উদ্যম ও কার্য্যকলাপের একটা স্বাভাবিক পূর্ব্বাপর কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে—

বৃন্দাবনের গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাপক দ্বারকা-নাথ শ্রীকৃষ্ণে পরিণত হইলেন তাহা পরিষ্কার বুঝা যায় না। ঈশার মহদুদার জীবনে ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বের কথা দুটা একটা মাত্রই জানিতে পারা যায়। আচার্য্য শঙ্করের দিগ্বিজয়কাহিনীমাত্রই সবিস্তার লিপিবদ্ধ। এইরূপ, অন্যত্র সর্ব্বত্র।

তাঁহারা কোন কালে অসম্পূর্ণ ছিলেন এ কথা ভক্ত-মানব ভাবিতে চাহে না।

ঐরূপ হইবার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। ভক্তদিগের ভক্তির আতিশয্যেই বোধ হয় ঐ সকল কথা লিপিবদ্ধ হয় নাই। নরের অসম্পূর্ণতা দেবচরিত্রে আরোপ করিতে সঙ্কুচিত হইয়াই তাঁহারা বোধ হয় ঐ সকল কথা লোক-নয়নের অন্তরালে রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছেন। অথবা হইতে পারে—মহাপুরুষচরিত্রের সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ মহান্ ভাবসকল সাধারণের সম্মুখে উচ্চাদর্শ ধারণ করিয়া তাহাদিগের যতটা কল্যাণ সাধিত করিবে, ঐ সকল ভাবে উপনীত হইতে তাঁহারা যে অলৌকিক উদ্যম করিয়াছেন, তাহা ততটা করিবে না ভাবিয়া উহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা তাঁহারা অনাবশ্যক বোধ করিয়াছেন।

ভক্ত আপনার ঠাকুরকে সর্ব্বদা পূর্ণ দেখিতে চাহেন। নরশরীর ধারণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাতে যে নরসুলভ দুর্ব্বলতা, দৃষ্টি ও শক্তিহীনতা কোন কালে কিছুমাত্র বর্ত্তমান ছিল তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। বালগোপালের মুখগহ্বরে তাঁহারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত দেখিতে, সর্ব্বদা প্রয়াসী হন এবং বালকের অসম্বদ্ধ চেষ্টাদির ভিতরে পরিণতবয়স্কের বুদ্ধি ও বহুদর্শিতার পরিচয় পাইবার কেবলমাত্র প্রত্যাশা রাখেন না, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা এবং বিশ্বজনীন উদারতা ও প্রেমের সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া উঠেন। অতএব, নিজ ঐশ্বরিক স্বরূপে সর্ব্বসাধারণকে ধরা না দিবার

জন্যই অবতারপুরুষেরা সাধনভজনাদি মানসিক চেষ্টা এবং আহার, নিদ্রা, ক্লান্তি, ব্যাধি এবং দেহত্যাগ প্রভৃতি শারীরিক অবস্থানিচয়েব মিথ্যা ভাণ করিয়া থাকেন,—এইরূপ সিদ্ধান্ত কবা তাঁহাদিগের পক্ষে বিচিত্র নহে। আমাদের কালেই আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি কত বিশিষ্ট ভক্ত ঠাকুরের শারীবিক ব্যাধি সম্বন্ধে ঐরূপে মিথ্যা ভাণ বলিয়া ধারণা কবিয়াছিলেন।

ঐরূপ ভাবিলে ভক্তের ভক্তির হানি হয়, একথা যুক্তিযুক্ত নহে।

নিজ দুর্ব্বলতাব জন্যই ভক্ত ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। বিপরীত সিদ্ধান্ত করিলে তাঁহাব ভক্তির হানি হয বলিয়াই, বোধ হয় তিনি নরসুলভ চেষ্টা ও উদ্দেশ্যাদি অবতাবপুরুষে আবোপ কবিতে চাহেন না। অতএব, তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। তবে এ কথা ঠিক যে, ভক্তিব অপবিণত অবস্থাতেই ভক্তে ঐরূপ দুর্ব্বলতা পবিলক্ষিত হয। ভক্তির প্রথমাবস্থাতেই ভক্ত ভগবানকে ঐশ্বর্য্যবিবহিত কবিয়া চিন্তা কবিতে পারেন না। ভক্তি পরিপক্ক হইলে, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ কালে গভীব ভাব ধারণ করিলে, ঐরূপ ঐশ্বর্য্য-চিন্তা ভক্তিপথেব অন্তবায বলিয়া বোধ হইতে থাকে, এবং ভক্ত তখন উহা যত্নে দূবে পবিহার কবেন। সমগ্র ভক্তিশাস্ত্র ঐ কথা বাবম্বার বলিযাছেন। দেখা যায শ্রীকৃষ্ণমাতা যশোদা গোপালের দিব্য বিভূতিনিচযের নিত্য পবিচয় পাইয়াও তাঁহাকে নিজ বালকবোধেই লালন তাড়নাদি কবিতেছেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে জগৎকাবণ ঈশ্বর বলিযা জানিযাও তাঁহাতে কান্তভাব ভিন্ন অন্যভাবেব আরোপ কবিতে পারিতেছেন না। এইরূপ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

ভগবানেব শক্তিবিশেষের সাক্ষাৎ পরিচারক কোনরূপ দর্শনাদি লাভের জন্য আগ্রহাতিশয় জানাইলে, ঠাকুব সেজন্য তাঁহার

ভক্তদিগকে অনেক সময় বলিতেন, "ওগো ঐরূপ দর্শন করতে চাওয়াটা ভাল নয়; ঐশ্বর্য্য দেখ্‌লে ভয় আস্‌বে; খাওয়ান, পরান, ভালবাসায় (ঈশ্বরের সহিত) 'তুমি আমি' ভাব, এটা আর থাক্‌বে না।" কত সময়েই না আমরা তখন ক্ষুণ্ণমনে ভাবিয়াছি, ঠাকুর কৃপা করিয়া ঐরূপ দর্শনাদিলাভ করাইয়া দিবেন না বলিয়াই আমাদিগকে ঐরূপ বলিয়া ক্ষান্ত করাইতেছেন। সাহসে নির্ভর করিয়া কোনও ভক্ত যদি সে সময় প্রাণের বিশ্বাসের সহিত বলিত, "আপনার কৃপাতে অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে, কৃপা করিয়া আমাকে ঐরূপ দর্শনাদি করাইয়া দিন।" ঠাকুর তাহাতে মধুর নম্রভাবে বলিতেন, "আমি কি কিছু করিয়া দিতে পারি রে—মা'র যা ইচ্ছা তাই হয়।" ঐরূপ বলিলেও যদি সে ক্ষান্ত না হইয়া বলিত, "আপনার ইচ্ছা হইলেই মার ইচ্ছা হইবে।" ঠাকুর তাহাতে অনেক সময় তাহাকে বুঝাইয়া বলিতেন, "আমি ত মনে করি যে, তোদের সকলের সব রকম অবস্থা, সব রকম দর্শন হোক্, কিন্তু তা হয় কৈ?" উহাতেও ভক্ত যদি ক্ষান্ত না হইয়া বিশ্বাসের জেদ্ চালাইতে থাকিত তাহা হইলে ঠাকুর তাহাকে আর কিছু না বলিয়া স্নেহপূর্ণ দর্শন ও মৃদুমন্দ হাস্যের দ্বারা তাহার প্রতি নিজ ভালবাসার পরিচয়মাত্র দিয়া নীরব থাকিতেন; অথবা বলিতেন, "কি বল্‌ন বাবু, মা'র যা ইচ্ছা তাই হোক।" ঐরূপ নির্ব্বন্ধাতিশয়ে পড়িয়াও কিন্তু ঠাকুর তাহার ঐরূপ ভ্রমপূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া তাহার ভাব নষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেন না। ঠাকুরের ঐরূপ ব্যবহার আমরা অনেক সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং তাঁহাকে বার বার বলিতে শুনিয়াছি, "কারও ভাব নষ্ট করতে নেই রে, কারও ভাব নষ্ট করতে নেই।"

ঠাকুরের উপদেশ—ঐশ্বর্য্য উপলব্ধিতে 'তুমি আমি' ভাবে ভালবাসা থাকে না, কাহারও ভাব নষ্ট করিবে না।

প্রবন্ধোক্ত বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও কথাটি যখন পাড়া গিয়াছে তখন একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া পাঠককে বুঝাইয়া দেওয়া ভাল। ইচ্ছা ও স্পর্শমাত্রে অপরের শরীরমনে ধর্ম্মশক্তি সঞ্চারিত করিবার ক্ষমতা আধ্যাত্মিক জীবনে অতি অল্প সাধকের ভাগ্যে লাভ হইয়া থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ কালে ঐ ক্ষমতায় ভূষিত হইয়া প্রভূত লোক-কল্যাণ সাধন করিবেন, ঠাকুর একথা আমাদিগকে বারম্বার বলিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মত উত্তমাধিকারী সংসারে বিরল—প্রথম হইতে ঠাকুর ঐ কথা সম্যক্ বুঝিয়া বেদান্তোক্ত অদ্বৈতজ্ঞানের উপদেশ দিয়া, তাঁহার চরিত্র ও ধর্ম্মজীবন একভাবে গঠিত করিতেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রণালীতে দ্বৈতভাবে ঈশ্বরোপসনায় অভ্যস্ত স্বামিজীর নিকট বেদান্তের 'সোঽহং' ভাবের উপাসনাটা তখন পাপ বলিয়া পরিগণিত হইলেও ঠাকুর তাঁহাকে তদনুশীলন করাইতে নানাভাবে চেষ্টা করিতেন। স্বামিজী বলিতেন "দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইবামাত্র ঠাকুর অপর সকলকে যাহা পড়িতে নিষেধ করিতেন, সেই সকল পুস্তক আমায় পড়িতে দিতেন। অন্যান্য পুস্তকের সহিত তাঁহার ঘরে একখানি 'অষ্টাবক্র-সংহিতা' ছিল। কেহ সেখানি বাহির করিয়া পড়িতেছে দেখিতে পাইলে ঠাকুর তাহাকে ঐ পুস্তক পড়িতে নিষেধ করিয়া 'মুক্তি ও তাহার সাধন,' 'ভগবদগীতা' বা কোন পুরাণগ্রন্থ পড়িবার জন্য দেখাইয়া দিতেন। আমি কিন্তু তাঁহার নিকট যাইলেই ঐ অষ্টাবক্র সংহিতাখানি বাহির করিয়া পড়িতে বলিতেন। অথবা অদ্বৈতভাব-পূর্ণ আধ্যাত্মিক-রামায়ণের কোন অংশ পাঠ করিতে বলিতেন। যদি বলিতাম, 'ও বই প'ড়ে কি হবে? আমি ভগবান্, একথা মনে করাও পাপ। ঐ পাপ কথা এই পুস্তকে লেখা আছে। ও বই

ভাব নষ্ট করা সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত—কাশীপুরের বাগানে শিবরাত্রির কথা।

পুড়িয়ে ফেলা উচিত।' ঠাকুর তাহাতে হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "আমি কি তোকে পড়তে বল্‌ছি? একটু প'ড়ে আমাকে শুনাতে বল্‌ছি। খানিক প'ড়ে আমাকে শুনা না। তাতে ত আর তোকে মনে কর্‌তে হবে না, তুই ভগবান্‌।' কাজেই অনুরোধে পড়িয়া অল্পবিস্তর পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইতে হইত।"

স্বামিজীকে ঐভাবে গঠিত করিতে থাকিলেও ঠাকুর, তাঁহার অন্যান্য বালকদিগকে—কাহাকেও সাকারোপাসনা, কাহাকেও নিরাকার সগুণ ঈশ্বরোপাসনা, কাহাকেও শুদ্ধা ভক্তির ভিতর দিয়া, আবার কাহাকেও বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ভিতর দিয়া—অন্য নানাভাবে ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর করাইয়া দিতেছিলেন, এইরূপে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ বালক ভক্তগণ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট একত্র শয়ন উপবেশন, আহার বিহার ও ধর্ম্মচর্চ্চা প্রভৃতি করিলেও ঠাকুর অধিকারিভেদে তাহাদিগকে নানাভাবে গঠিত করিতেছিলেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস। কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর গলরোগে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহে ভক্তদিগের ধর্ম্মজীবন-গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছেন —বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের। আবার স্বামিজীকে সাধনমার্গের উপদেশ দিয়া এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে সহায়তামাত্র করিয়াই ঠাকুর ক্ষান্ত ছিলেন না। নিত্য সন্ধ্যার পর অপর সকলকে সরাইয়া দিয়া তাঁহাকে নিকটে ডাকাইয়া একাদিক্রমে দুই তিন ঘণ্টাকাল ধরিয়া তাঁহার সহিত অপর বালক ভক্তদিগকে সংসারে পুনরায় ফিরিতে না দিয়া কি ভাবে পরিচালিত ও একত্র রাখিতে হইবে তদ্বিষয়ে আলোচনা ও শিক্ষাপ্রদান করিতেছিলেন। ভক্তদিগের প্রায় সকলেই তখন ঠাকুরের এইরূপ আচরণে ভাবিতেছিলেন, নিজ সঙ্ঘ সুপ্রতিষ্ঠিত

করিবার জন্যই ঠাকুর গলরোগরূপ একটা মিথ্যা ভাণ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন—ঐ কার্য্য সুসিদ্ধ হইলেই আবার পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইবেন। স্বামী বিবেকানন্দ কেবল দিন দিন প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছিলেন, ঠাকুব যেন ভক্তদিগেব নিকট হইতে বহুকালের জন্য বিদায় গ্রহণ কবিবাব মত সকল আয়োজন ও বন্দোবস্ত করিতেছেন। তিনিও ঐ ধাবণা সকল সমযে বাখিতে পারিযাছিলেন কি না সন্দেহ।

সাধনবলে স্বামিজীর ভিতর তখন স্পর্শসহায়ে অপরে ধর্ম্মশক্তি-সংক্রমণ কবিবাব ক্ষমতাব ঈষৎ উন্মেষ হইযাছে। তিনি মধ্যে মধ্যে নিজের ভিতর ঐরূপ শক্তিব উদয স্পষ্ট অনুভব করিলেও, কাহাকেও ঐভাবে স্পর্শ কবিযা ঐ বিষযের সত্যাসত্য এপর্য্যন্ত নির্দ্ধারণ করেন নাই। কিন্তু নানাভাবে প্রমাণ পাইযা বেদান্তের অদ্বৈতমতে বিশ্বাসী হইযা, তিনি তর্কযুক্তিসহাযে ঐ মত বালক ও গৃহস্থ ভক্তদিগের ভিতব প্রবিষ্ট কবাইবাব চেষ্টা কবিতেছিলেন। তুমুল আন্দোলনে ঐ বিষব লইযা ভক্তদিগেব ভিতর কখন কখন বিষম গণ্ডগোল চলিতে-ছিল। কাবণ স্বামিজীব স্বভাবই ছিল, যখন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তখনি তাহা 'হাঁকিয়া ডাকিযা' সকলকে বলিতেন এবং তর্কযুক্তিসহাযে অপবকে গ্রহণ কবাইতে চেষ্টা করিতেন। ব্যবহারিক জগতে সত্য যে, অবস্থা ও অধিকাবিভেদে নানা আকাব ধারণ করে—বালক স্বামিজী তাহা তখনও বুঝিতে পাবেন নাই।

আজ ফাল্গুনী শিবরাত্রি। বালক-ভক্তদিগেব মধ্যে তিন চারিজন স্বামিজীর সহিত স্বেচ্ছায ব্রতোপবাস কবিয়াছে। পূজা ও জাগরণে রাত্রি কাটাইবাব তাহাদের অভিলাষ। গোলমালে ঠাকুরের পাছে আরামের ব্যাঘাত হয় এজন্য বসতবাটীর পূর্ব্বে কিঞ্চিদ্দূরে অবস্থিত, রন্ধনশালার জন্য নির্ম্মিত একটি গৃহে পূজার আয়োজন হইয়াছে। সন্ধ্যার পরে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এবং নবীন মেঘে

সময়ে সময়ে মহাদেবের জটাপটলের ন্যায় বিদ্যুৎপুঞ্জের আবির্ভাব দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দিত হইয়াছেন।

দশটার পর প্রথম প্রহরের পূজা জপ ও ধ্যান সাঙ্গ করিয়া স্বামিজী পূজার আসনে বসিয়াই বিশ্রাম ও কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সঙ্গীদিগের মধ্যে একজন তাঁহার নিমিত্ত তামাকু সাজিতে বাহিরে গমন করিল এবং অপর একজন কোন প্রয়োজন সারিয়া আসিতে বসতবাটীর দিকে চলিয়া গেল। এমন সময় স্বামিজীর ভিতর সহসা পূর্ব্বোক্ত দিব্য বিভূতির তীব্র অনুভবের উদয় হইল এবং তিনিও উহা অন্য কার্য্যে পরিণত করিয়া উহার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বাসনায় সম্মুখোপবিষ্ট স্বামী অভেদানন্দকে বলিলেন, "আমাকে খানিক-ক্ষণ ছুঁয়ে থাক ত।" ইতিমধ্যে তামাকু লইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বালক দেখিল স্বামিজী স্থিরভাবে ধ্যানস্থ রহিয়াছেন এবং অভেদানন্দ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাঁহার দক্ষিণ জানু স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে ও তাহার ঐ হস্ত ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। দুই এক মিনিটকাল ঐভাবে অতিবাহিত হইবার পর স্বামিজী চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন, "বস্, হয়েছে। কিরূপ অনুভব কর্‌লি ?"

অ। ব্যাটারি (Electric Battery) ধর্‌লে যেমন কি একটা ভিতরে আস্‌ছে জান্‌তে পারা যায় ও হাত কাঁপে, ঐ সময়ে তোমাকে ছুঁয়ে সেইরূপ অনুভব হতে লাগ্‌ল।

অপর ব্যক্তি অভেদানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, "স্বামিজীকে স্পর্শ করে তোমার হাত আপনা আপনি ঐরূপ কাঁপ্‌ছিল ?"

অ। হাঁ, স্থির করে রাখ্‌তে চেষ্টা করেও রাখ্‌তে পার্‌ছিলুম না।

ঐ সম্বন্ধে অন্য কোন কথাবার্ত্তা তখন আর হইল না। স্বামিজী তামাকু খাইলেন। পরে সকলে দুই-প্রহরের পূজা ও ধ্যানে মনো-নিবেশ করিলেন। অভেদানন্দ ঐকালে গভীর ধ্যানস্থ হইল। ঐরূপ

গভীরভাবে ধ্যান করিতে আমরা তাহাকে ইতিপূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই। তাহার সর্ব্বশরীর আড়ষ্ট হইয়া গ্রীবা ও মস্তক বাঁকিয়া গেল এবং কিছুক্ষণের জন্য বহির্জ্জগতের সংজ্ঞা এককালে লুপ্ত হইল। উপস্থিত সকলের মনে হইল স্বামিজীকে ইতিপূর্ব্বে স্পর্শ করার ফলেই তাহার এখন ঐরূপ গভীর ধ্যান উপস্থিত হইয়াছে। স্বামিজীও তাহার ঐরূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া জনৈক সঙ্গীকে ইঙ্গিত করিয়া উহা দেখাইলেন।

রাত্রি চারিটায় চতুর্থ প্রহরের পূজা শেষ হইবার পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পূজাগৃহে উপস্থিত হইয়া স্বামিজীকে বলিলেন, "ঠাকুর ডাকিতেছেন।" শুনিয়াই স্বামিজী বসতবাটীর দ্বিতলগৃহে ঠাকুরের নিকট চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের সেবা করিবার জন্য রামকৃষ্ণানন্দও সঙ্গে যাইলেন।

স্বামিজীকে দেখিয়াই ঠাকুর বলিলেন, "কি রে? একটু জমতে না জমতেই খরচ? আগে নিজের ভিতর ভাল করে জমতে দে, তখন কোথায় কি ভাবে খরচ করতে হবে তা বুঝতে পারবি—মা-ই বুঝিয়ে দেবেন। ওর ভিতর তোর ভাব ঢুকিয়ে ওর কি অপকারটা কল্লি বল দেখি? ও এতদিন এক ভাব দিয়ে যাচ্ছিল, সেটা সব নষ্ট হয়ে গেল!—ছয়মাসের গর্ভ যেন নষ্ট হল। যা হবার হয়েছে; এখন হতে হঠাৎ অমনটা আর করিস নি। যা হোক, ছোঁড়াটার অদেষ্ট ভাল।"

স্বামিজী বলিতেন, "আমি ত একেবারে অবাক্। পূজার সময় নীচে আমরা যা যা করেছি ঠাকুর সমস্ত জান্তে পেরেছেন! কি করি—তাঁর ঐরূপ ভৎ‍র্সনায় চুপ করে রইলুম।"

ফলে দেখা গেল অভেদানন্দ যে ভাবসহায়ে পূর্ব্বে ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হইতেছিল তাহার ত একেবারে উচ্ছেদ হইয়া যাইলই, আবার

অদ্বৈতভাব ঠিক্ ঠিক্ ধরা ও বুঝা কালসাপেক্ষ হওয়ায় বেদান্তের দোহাই দিয়া সে কখন কখন সদাচারবিরোধী অনুষ্ঠানসকল করিয়া ফেলিতে লাগিল। ঠাকুর তাহাকে এখন হইতে অদ্বৈত-ভাবের উপদেশ করিতে ও সস্নেহে তাহার ঐরূপ কার্য্যকলাপের ভুল দেখাইয়া দিতে থাকিলেও অভেদানন্দের, ঐভাবপ্রণোদিত হইয়া জীবনের প্রত্যেক কার্য্যানুষ্ঠানে যথাযথভাবে অগ্রসর হওয়া, ঠাকুরের শরীর ত্যাগের বহুকাল পরে সাধিত হইয়াছিল।

নরলীলায় সমস্ত কার্য্য সাধারণ নরের ন্যায় হয়।

সত্যলাভ অথবা জীবনে উহার পূর্ণাভিব্যক্তির জন্য অবতারপুরুষ-কৃত চেষ্টাসকলকে মিথ্যা ভাণ বলিয়া যাঁহারা গ্রহণ করেন ঐ শ্রেণীর ভক্তদিগকে আমাদিগের বক্তব্য যে, ঠাকুরকে তাঁহাদিগের ন্যায় অভি-প্রায় প্রকাশ করিতে আমরা কখনও শুনি নাই। বরং অনেক সময় তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, 'নরলীলায় সমস্ত কার্য্যই সাধারণ নরের ন্যায় হয়; নরশরীর স্বীকার করিয়া ভগ-বানকে নরের ন্যায় সুখ দুঃখ ভোগ করিতে এবং নরের ন্যায় উদ্যম, চেষ্টা ও তপস্যা দ্বারা সকল বিষয়ে পূর্ণত্ব লাভ করিতে হয়।' জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসও ঐ কথা বলে, এবং যুক্তিসহায়ে একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঐরূপ না হইলে জীবের প্রতি কৃপায় ঈশ্বরকৃত নরবপুধারণের কোন সার্থকতা থাকে না।

দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধে ঠাকুরের মত।

ভক্তগণকে ঠাকুর যে সকল উপদেশ দিতেন, তাহার ভিতর আমরা দুই ভাবের কথা দেখিতে পাই। তাঁহার কয়েকটি উক্তির উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। দেখা যায়, একদিকে তিনি তাঁহার ভক্তগণকে বলিতেছেন, "(আমি) ভাত বেঁধেছি, তোরা বাড়া ভাতে বসে যা," "ছাঁচ তৈয়ারী হয়েছে তোরা সেই ছাঁচে নিজের নিজের মনকে

ফাঁল্ ও গড়ে তোল্," "কিছুই যদি না পারবি ত আমার উপর বকলমা দে"—ইত্যাদি। আবার অন্যদিকে বলিতেছেন, "এক এক করে সব বাসনা ত্যাগ কর্, তবে ত হবে," "ঝড়ের আগে এঁটো পাতার মত হয়ে থাক্," "কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করে ঈশ্বরকে ডাক্," "আমি ষোল টাং (ভাগ) করেছি, তোরা এক টাং (ভাগ বা অংশ) কর,"—ইত্যাদি। আমাদের বোধ হয় ঠাকুরের ঐ দুই ভাবের কথার অর্থ অনেক সময় না বুঝিতে পারিয়াই আমরা দৈব ও পুরুষাকার, নির্ভর ও সাধনের কোন্‌টা ধরিয়া জীবনে অগ্রসর হইব তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন আমরা জনৈক বন্ধুর* সহিত মানবের স্বাধীনেচ্ছা কিছুমাত্র আছে কিনা, এই বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ বাদানুবাদের পর উহার যথার্থ মীমাংসা পাইবার নিমিত্ত ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হই। ঠাকুর বালকদিগের বিবাদ কিছুক্ষণ রহস্য করিয়া শুনিতে লাগিলেন, পরে গম্ভীরভাবে বলিলেন, "স্বাধীন ইচ্ছা ফিচ্ছা কারও কিছু কি আছে রে? ঈশ্বরেচ্ছাতেই চিরকাল সব হচ্চে ও হবে। মানুষ ঐ কথা শেষকালে বুঝ্‌তে পারে। তবে কি জানিস্, যেমন গরুটাকে লম্বা দড়ি দিয়ে খোঁটায় বেঁধে রেখেছে। গরুটা খোঁটার একহাত দূরে দাঁড়াতে পারে, আবার দড়িগাছটা যত লম্বা ততদূরে গিয়েও দাঁড়াতে পারে—মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাটাও ঐরূপ জান্‌বি। গরুটা এতটা দূরের ভিতর যেখানে ইচ্ছা বসুক, দাঁড়াক বা ঘুরে বেড়াক—মনে করেই মানুষ তাকে বাঁধে। তেমনি ঈশ্বরও মানুষকে কতকটা শক্তি দিয়ে তার ভিতরে সে যেমন ইচ্ছা, যতটা ইচ্ছা ব্যবহার করুক বলে ছেড়ে দিয়েছেন। তাই মানুষ মনে

---

* স্বামী নিরঞ্জনানন্দ। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে হরিদ্বারে ইঁহার শরীরত্যাগ হয়।

কর্‌ছে সে স্বাধীন। দড়িটা কিন্তু খোঁটায় বাঁধা আছে। তবে কি জানিস্, তাঁর কাছে কাতর হয়ে প্রার্থনা কল্লে তিনি নেড়ে বাঁধ্‌তে পারেন, দড়িগাছটা আরও লম্বা করে দিতে পারেন, চাই কি গলার বাঁধন একেবারে খুলেও দিতে পারেন।"

কথাগুলি শুনিয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে মহাশয়, সাধন ভজন করাতে ত মানুষের হাত নাই? সকলেই ত বলিতে পারে—আমি যাহা কিছু করিতেছি সব তাঁহার ইচ্ছাতেই করিতেছি?"

ঠাকুর—মুখে শুধু বল্লে কি হবে রে? কাঁটা নেই খোঁচা নেই, মুখে বল্লে কি হবে? কাঁটা হাতে পড়্‌লেই কাঁটা ফুটে 'উঃ' করে উঠ্‌তে হবে। সাধনভজন করাটা যদি মানুষের হাতে থাকৃত তবে ত সকলেই তা কর্‌তে পার্‌ত—তা পারে না কেন? তবে কি জানিস্, যতটা শক্তি তিনি তোকে দিয়েছেন ততটা ঠিক্ ঠিক্ ব্যবহার না কর্‌লে তিনি আর অধিক দেন না। ঐ জন্যই পুরুষকার বা উত্তমের দরকার। দেখ্ না, সকলকেই কিছু না কিছু উত্তম করে তবে ঈশ্বরকৃপার অধিকারী হতে হয়। ঐরূপ কর্‌লে তাঁর কৃপায় দশ জন্মের ভোগটা এক জন্মেই কেটে যায়। কিন্তু (তাঁর উপর নির্ভর করে) কিছু না কিছু উত্তম কর্‌তেই হয়। ঐ বিষয়ে একটা গল্প শোন—

ঐ বিষয়ে শ্রীবিষ্ণু ও নারদ-সংবাদ।

"গোলক-বিহারী বিষ্ণু একবার নারদকে কোন কারণে অভিশাপ দেন যে তাকে নরকভোগ কর্‌তে হবে। নারদ ভেবে আকুল। নানারূপে স্তবস্তুতি করে তাঁকে প্রসন্ন করে বল্লে—আচ্ছা ঠাকুর, নরক কোথায়, কিরূপ, কত রকমই বা আছে আমার জান্‌তে ইচ্ছা হচ্চে, কৃপা করে আমাকে বলুন। বিষ্ণু তখন ভুঁয়ে খড়ি দিয়ে স্বর্গ, নরক, পৃথ্বী যেখানে যেরূপ আছে এঁকে দেখিয়ে বল্লেন, 'এই খানে স্বর্গ আর এইখানে নরক।' নারদ বল্লে, বটে? তবে আমার

এই নরক ভোগ হল—বলেই ঐ আঁকা নরকের উপর গড়াগড়ি দিয়ে উঠে ঠাকুরকে প্রণাম করলে। বিষ্ণু হাসতে হাসতে বললেন, 'সে কি? তোমার নরক ভোগ হল কৈ?' নারদ বললে, 'কেন ঠাকুর, তোমারই সৃজন ত স্বর্গ নরক? তুমি এঁকে দেখিয়ে যখন বললে—'এই নরক'—তখন ঐ স্থানটা সত্য সত্যই নরক হল, আর আমি তাতে গড়াগড়ি দেওয়াতে আমার নরকভোগ হয়ে গেল।' নারদ কথাগুলি প্রাণের বিশ্বাসের সহিত বললে কি না? বিষ্ণুও তাই 'তথাস্তু' বললেন। নারদকে কিন্তু তাঁর উপর ঠিক ঠিক বিশ্বাস করে ঐ আঁকা নরকে গড়াগড়ি দিতে হল, (ঐ উদ্যমটুকু করে) তবে তার ভোগ কাটল।" এইরূপে কৃপার রাজ্যেও যে উদ্যম ও পুরুষকারের স্থান আছে তাহা ঠাকুর ঐ গল্পটি সহায়ে কখনও কখনও আমাদিগকে বুঝাইয়া বলিতেন।

মানবের অসম্পূর্ণতা স্বীকার করিয়া অবতার-পুরুষের মুক্তির পথ আবিষ্কার করা।

নরদেহ ধারণ করিয়া নরবৎ লীলায় অবতারপুরুষদিগকে আমাদিগের ন্যায় অনেকাংশে দৃষ্টিহীনতা, অল্পজ্ঞতা প্রভৃতি অনুভব করিতে হয়। আমাদিগেরই ন্যায় উদ্যম করিয়া তাঁহাদিগকে ঐ সকলের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার পথ আবিষ্কার করিতে হয়, এবং যতদিন না ঐ পথ আবিষ্কৃত হয় ততদিন তাঁহা-দিগের অন্তরে নিজ দেবস্বরূপের আভাস কখনও কখনও অল্পক্ষণের জন্য উদিত হইলেও উহা আবার প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এইরূপে 'বহুজনহিতায়' মায়ার আবরণ স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহাদিগকে আমাদিগেরই ন্যায় আলোক-আঁধারের রাজ্যের ভিতর পথ হাতড়াইতে হয়। তবে, স্বার্থসুখচেষ্টার লেশমাত্র তাঁহাদের ভিতরে না থাকায় তাঁহারা জীবনপথে আমাদিগের অপেক্ষা অধিক আলোক দেখিতে পান এবং অভ্যন্তরীণ সমগ্র শক্তিপুঞ্জ সহজেই একমুখী করিয়া অচিরেই জীবনসমস্যার সমাধানকরতঃ লোককল্যাণসাধনে নিযুক্ত হয়েন।

নরের অসম্পূর্ণতা যথাযথভাবে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন বলিয়া দেব-মানব ঠাকুরের মানবভাবের আলোচনায় আমাদিগের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়, এবং ঐ জন্যই আমরা তাঁহার মানবভাব সকল সর্ব্বদা পুরোবর্ত্তী রাখিয়া তাঁহার দেবভাবের আলোচনা করিতে পাঠককে অনুরোধ করি। আমাদেরই মত একজন বলিয়া তাঁহাকে না ভাবিলে তাঁহার সাধনকালের অলৌকিক উদ্যম ও চেষ্টাদির কোন অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। মনে হইবে, যিনি নিত্য পূর্ণ, তাঁহার আবার সত্যলাভের জন্য চেষ্টা কেন? মনে হইবে, তাঁহার জীবনপাতী চেষ্টাটা একটা 'লোক দেখানো' ব্যাপার মাত্র। শুধু তাহাই নহে, ঈশ্বরলাভের জন্য উচ্চাদর্শসমূহ নিজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার উদ্যম, নিষ্ঠা ও ত্যাগ আমাদিগকে ঐরূপ করিতে উৎসাহিত না করিয়া হৃদয় বিষম উদাসীনতায় পূর্ণ করিবে এবং ইহজীবনে আমাদিগের আর জড়ত্বের অপনোদন হইবে না।

মানব বলিয়া না ভাবিলে অবতার পুরুষের জীবন ও চেষ্টার অর্থ পাওয়া যায় না।

ঠাকুরের কৃপালাভের প্রত্যাশী হইলেও আমাদিগকে তাঁহাকে আমাদিগেরই ন্যায় মানবভাবসম্পন্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, ঠাকুর আমাদিগের দুঃখে সমবেদনাভাগী হইয়াই ত আমাদিগের দুঃখমোচনে অগ্রসর হইবেন? অতএব যে দিক্ দিয়াই দেখ, তাঁহাকে মানবভাবাপন্ন বলিয়া চিন্তা করা ভিন্ন আমাদিগের গত্যন্তর নাই। বাস্তবিক, যতদিন না আমরা সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নির্গুণ দেব-স্বরূপে স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব, ততদিন পর্য্যন্ত জগৎকারণ ঈশ্বরকে এবং ঈশ্বরাবতার-দিগকে মানবভাবাপন্ন বলিয়াই আমাদিগকে ভাবিতে ও গ্রহণ

বদ্ধ মানব, মানব-ভাবে মাত্রই বুঝিতে পারে।

করিতে হইবে। "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ"—কথাটি ঐরূপে বাস্তবিকই সত্য। তুমি যদি স্বয়ং সমাধিবলে নির্বিকল্প ভূমিতে পৌঁছাইতে পারিয়া থাক, তবেই তুমি ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপের উপলব্ধি ও ধারণা করিয়া তাঁহার যথার্থ পূজা করিতে পারিবে। আর, যদি তাহা না পারিয়া থাক, তবে তোমার পূজা উক্ত দেবভূমিতে উঠিবার ও যথার্থ পূজাধিকার পাইবার চেষ্টামাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে এবং জগৎ কারণ ঈশ্বরকে বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন মানব বলিয়াই তোমার স্বতঃ ধারণা হইতে থাকিবে।

দেবত্বে আরূঢ় হইয়া ঐরূপে ঈশ্বরের মায়াতীত দেবস্বরূপের যথার্থ পূজা করিতে সমর্থ ব্যক্তি বিরল। আমাদিগের মত দুর্ব্বল অধিকারী উহা হইতে এখনও বহুদূরে অবস্থিত। সেজন্য আমাদিগের ন্যায় সাধারণ ব্যক্তির প্রতি করুণাপরবশ হইয়া আমাদিগের হৃদয়ের পূজা গ্রহণ করিবার জন্যই ঈশ্বরের মানবভূমিতে অবতরণ—মানবীয় ভাব ও দেহ স্বীকার করিয়া দেবমানব-রূপধারণ। পূর্ব্বপূর্ব্ব যুগাবির্ভূত দেব-মানবদিগের সহিত তুলনায় ঠাকুরের সাধনকালের ইতিহাস আলোচনা করিবার আমাদের অনেক সুবিধা আছে। কারণ, ঠাকুর স্বয়ং তাঁহার জীবনের ঐ কালের কথা সময়ে সময়ে আমাদিগের নিকট বিস্তৃতভাবে আলোচনা করায় সে সকলের জলন্ত চিত্র আমাদের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। আবার, আমরা তাঁহার নিকট যাইবার স্বল্পকাল পূর্ব্বেই তাঁহার সাধক-জীবনের বিচিত্রাভিনয় দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীর লোকসকলের চক্ষুসম্মুখে সংঘটিত হইয়াছিল। এবং ঐ সকল ব্যক্তিদিগের অনেক তখনও ঐ স্থানে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহাদিগের প্রমুখাৎ ঐ বিষয়ে কিছু কিছু শুনিবারও আমরা অবসর

ঐজন্য মানবের প্রতি করুণায় ঈশ্বরের মানবদেহ ধারণ, সুতরাং মানব ভাবিয়া অবতারপুরুষের জীবনালোচনাই কল্যাণকর।

পাইয়াছিলাম। সে যাহা হউক, ঐ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সাধনতন্ত্রের মূলসূত্রগুলি একবার সাধারণভাবে আমাদিগের আবৃত্তি করিয়া লওয়া ভাল। অতএব ঐ বিষয়ে আমরা এখন কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

প্রথম অধ্যায়।

সাধক ও সাধনা।

ঠাকুরের জীবনে সাধকভাবের পরিচয় যথাযথ পাইতে হইলে আমাদিগকে সাধনা কাহাকে বলে তদ্বিষয় প্রথমে বুঝিতে হইবে। অনেকে হয়ত এ কথায় বলিবেন, ভারত ত চিরকাল কোনও না কোনও ভাবে ধর্ম্মসাধনে লাগিয়া রহিয়াছে তবে ঐ কথা আবার পাড়িয়া পুঁথি বাড়ান কেন? আবহমানকাল হইতে ভারত আধ্যাত্মিক রাজ্যের সত্যসকল সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে নিজ জাতীয় শক্তি যতদূর ব্যয় করিয়া আসিয়াছে এবং এখনও করিতেছে, পৃথিবীর অপর কোন্ দেশের কোন্ জাতি এতদূর করিয়াছে? কোন্ দেশে ব্রহ্মজ্ঞ অবতার-পুরুষসকলের আবির্ভাব এত অধিক পরিমাণে হইয়াছে? অতএব সাধনার সহিত চিরপরিচিত আমাদিগকে ঐ বিষয়ের মূলসূত্রগুলি পুনরাবৃত্তি করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন।

কথা সত্য হইলেও ঐরূপ করিবার প্রয়োজন আছে। কারণ, সাধনা সম্বন্ধে অনেক স্থলে জনসাধারণের একটা কিম্ভূতকিমাকার ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্দেশ্য বা গন্তব্যের প্রতি লক্ষ্য হারাইয়া তাহারা অনেক সময় কেবলমাত্র শারীরিক কঠোরতায়, দুষ্প্রাপ্য বস্তুসকলের সংযোগে স্থানবিশেষে ক্রিয়াবিশেষের নিরর্থক অনুষ্ঠানে, শ্বাসপ্রশ্বাসরোধে এবং এমন কি অসম্বন্ধ মনের বিসদৃশ চেষ্টাদিতেও সাধনার বিশিষ্ট পরিচয় পাইয়া থাকে। আবার এরূপও দেখা যায় যে, কুসংস্কার এবং কুঅভ্যাসে

সাধনা সম্বন্ধে সাধারণ মানবের ভ্রান্ত ধারণা।

বিকৃত মনকে প্রকৃতিস্থ ও সহজভাবাপন্ন করিয়া আধ্যাত্মিক পথে চালিত করিতে মহাপুরুষগণ কখন কখন যে সকল ক্রিয়া বা উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন সেই সকলকেই সাধনা বলিয়া ধারণাপূর্ব্বক সকলের পক্ষেই ঐ সমূহের অনুষ্ঠান সমভাবে প্রয়োজন বলিয়া অনেক স্থলে প্রচারিত হইতেছে। বৈরাগ্যবান্ না হইয়া—সংসারের ক্ষণস্থায়ী রূপরসাদি ভোগের জন্য সমভাবে লালায়িত থাকিয়া মন্ত্র বা ক্রিয়াবিশেষের সহায়ে জগৎকারণ ঈশ্বরকে মন্ত্রৌষধিবশীভূত সর্পের ন্যায় নিজ কর্তৃত্বাধীন করিতে পারা যায়, এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেককে বৃথা চেষ্টায় কালক্ষেপ করিতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অতএব যুগযুগান্তরব্যাপী অধ্যবসায় ও চেষ্টার ফলে ভারতের ঋষিমহাপুরুষগণ সাধনসম্বন্ধে যে সকল তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন তাহার সংক্ষেপ আলোচনা এখানে বিষয়-বিরুদ্ধ হইবে না।

ঠাকুর বলিতেন, "সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন বা ঈশ্বরদর্শন শেষকালের কথা"—সাধনার চরম উন্নতিতেই উহা মানবের ভাগ্যে উপস্থিত হয়।

সাধনার চরম ফল, সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন।

হিন্দুর সর্ব্বোচ্চ প্রামাণ্য শাস্ত্র বেদোপনিষৎ ঐ কথাই বলিয়া থাকেন। শাস্ত্র বলেন, জগতে স্থূল সূক্ষ্ম, চেতন অচেতন যাহা কিছু তুমি দেখিতে পাইতেছ—ইট, কাঠ, মাটী, পাথর, মানুষ, পশু, গাছ পালা, জীব জানোয়ার, দেব, উপদেব—সকলই এক অদ্বয় ব্রহ্মবস্তু। ব্রহ্মবস্তুকেই তুমি নানারূপে নানাভাবে দেখিতেছ, শুনিতেছ, স্পর্শ, ঘ্রাণ ও আস্বাদ করিতেছ। তাঁহাকে লইয়া তোমার সকল প্রকার দৈনন্দিন ব্যবহার আজীবন নিষ্পন্ন হইলেও তুমি তাহা বুঝিতে না পারিয়া ভাবিতেছ ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ও ব্যক্তির সহিত তুমি ঐরূপ করিতেছ। কথাগুলি শুনিয়া আমাদের মনে যে সন্দেহপরম্পরার উদয় হইয়া থাকে এবং ঐ সকল নিরসনে শাস্ত্র যাহা বলিয়া থাকেন, প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তাহার মোটামুটি

ভাবটি পাঠককে এখানে বলিলে উহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা।

প্র। ঐ কথা আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে না কেন?

উ। তোমরা ভ্রমে পড়িয়াছ। যতক্ষণ না ঐ ভ্রম দূরীভূত হয় ততক্ষণ কেমন করিয়া ঐ ভ্রম ধরিতে পারিবে? যথার্থ বস্তু ও অবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই আমরা বাহিরের ও ভিতরের ভ্রম ধরিয়া থাকি। পূর্ব্বোক্ত ভ্রম ধরিতে হইলেও তোমাদের ঐরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন।

প্র। আচ্ছা, ঐরূপ ভ্রম হইবার কারণ কি, এবং কবে হইতেই বা আমাদের এই ভ্রম আসিয়া উপস্থিত হইল?

ভ্রম বা অজ্ঞানবশতঃ সত্য প্রত্যক্ষ হয় না। অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়া অজ্ঞানের কারণ বুঝা যায় না।

উ। ভ্রমের কারণ সর্ব্বত্র যাহা দেখিতে পাওয়া যায় এখানেও তাহাই—অজ্ঞান। ঐ অজ্ঞান কখন যে উপস্থিত হইল তাহা কিরূপে জানিবে বল? অজ্ঞানের ভিতর যতক্ষণ পড়িয়া রহিয়াছ ততক্ষণ উহা জানিবার চেষ্টা বৃথা। স্বপ্ন যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ সত্য বলিয়াই প্রতীতি হয়। নিদ্রাভঙ্গে জাগ্রদবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই উহাকে মিথ্যা বলিয়া ধারণা হয়। বলিতে পার—স্বপ্ন দেখিবার কালে কখনও কখনও কোন কোন ব্যক্তির 'আমি স্বপ্ন দেখিতেছি' এইরূপ ধারণা থাকিতে দেখা যায়। সেখানেও জাগ্রদবস্থার স্মৃতি হইতেই তাহাদের মনে ঐ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। জাগ্রদবস্থায় জগৎ প্রত্যক্ষ করিবার কালে কাহারও কাহারও অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুর স্মৃতি ঐরূপে হইতে দেখা যায়।

প্র। তবে উপায়?

উ। উপায়—ঐ অজ্ঞান দূর কর। ঐ ভ্রম বা অজ্ঞান যে দূর করা যায় তাহা তোমাদের নিশ্চিত বলিতে পারি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব

ঋষিগণ উহা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং কেমন করিয়া দূর করিতে হইবে বলিয়া গিয়াছেন।

প্র। আচ্ছা, কিন্তু ঐ উপায় জানিবার পূর্ব্বে আরও দুই একটি প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমরা এত লোকে যাহা দেখিতেছি, প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহাকে তুমি ভ্রম বলিতেছ, আর অল্পসংখ্যক ঋষিরা যাহা বা যেরূপে জগৎটাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাই সত্য বলিতেছ—এটা কি সম্ভব হইতে পারে না যে, তাঁহারা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাই ভুল?

জগৎকে ঋষিগণ যেরূপ দেখিয়াছেন তাহাই সত্য। উহার কারণ।

উ। বহুসংখ্যক ব্যক্তি যাহা বিশ্বাস করিবে তাহাই যে সর্ব্বদা সত্য হইবে এমন কিছু নিয়ম নাই। ঋষিদিগের প্রত্যক্ষ সত্য বলিতেছি কারণ, ঐ প্রত্যক্ষসহায়ে তাঁহারা সর্ব্ববিধ দুঃখের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকারে ভয়শূন্য ও চিরশান্তির অধিকারী হইয়াছিলেন এবং নিশ্চিত মৃত্যু মানবজীবনের সকল প্রকার ব্যবহারচেষ্টাদির একটা উদ্দেশ্যের'ও সন্ধান পাইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন যথার্থজ্ঞান মানবমনে সর্ব্বদা সহিষ্ণুতা, সন্তোষ, করুণা, দীনতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজির বিকাশ করিয়া উহাকে অদ্ভুত উদারতাসম্পন্ন করিয়া থাকে; ঋষিদিগের জীবনে ঐরূপ অসাধারণ গুণ ও শক্তির পরিচয় আমরা শাস্ত্রে পাইয়া থাকি, এবং তাঁহাদিগের পদানুসরণে চলিয়া যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করেন তাঁহাদিগের ভিতরে ঐ সকলের পরিচয় এখনও দেখিতে পাই।

অনেকের একরূপ ভ্রম হইলেও ভ্রম কখনও সত্য হয় না।

প্র। আচ্ছা, কিন্তু আমাদের সকলেরই ভ্রম একপ্রকারের হইল কিরূপে? আমি যেটাকে পশু বলিয়া বুঝি তুমিও সেটাকে পশু ভিন্ন মানুষ বলিয়া বুঝ না; এইরূপ, সকল বিষয়েই। এত লোকের ঐরূপে সকল বিষয়ে একই কালে একই প্রকার ভুল হওয়া

অল্প আ[illegible] সংকথা নহে। পাঁচজনে একটা বিষয়ে ভুল ধারণা করিলেও [illegible] জনের ঐ বিষয়ে সত্যদৃষ্টি থাকে, সর্ব্বত্র এইরূপই [illegible] এখানে কিন্তু ঐ নিয়মের একেবারে ব্যতিক্রম হইতেছে। এজন্ত তোমার কথা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

উ। অল্পসংখ্যক ঋষিদিগকে জনসাধারণের মধ্যে গণনা না করাতেই তুমি নিয়মের ব্যতিক্রম এখানে দেখিতে পাইতেছ। নতুবা পূর্ব্ব প্রশ্নেই এ বিষয়ের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। তবে যে, জিজ্ঞাসা করিতেছ সকলের একপ্রকারে ভ্রম হইল কিরূপে?—তাহার উত্তরে শাস্ত্র বলেন, এক অসীম অনন্ত সমষ্টি-মনে জগৎরূপ কল্পনার উদয় হইয়াছে।

বিরাট মনে জগৎরূপ কল্পনা বিদ্যমান বলিয়াই মানবসাধারণের একরূপ ভ্রম হইতেছে। বিরাট মন কিন্তু ঐভ্রমে আবদ্ধ নহে।

তোমার, আমার এবং জনসাধারণের ব্যষ্টিমন ঐ বিরাট মনের অংশ ও অঙ্গীভূত হওয়ায় আমাদিগকে ঐ একই প্রকার কল্পনা অনুভব করিতে হইতেছে। এ জন্যই আমরা প্রত্যেক পশুটাকে পশু ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া ইচ্ছামত দেখিতে বা কল্পনা করিতে পারি না। ঐজন্যই আবার যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া আমাদের মধ্যে একজন সর্ব্বপ্রকার ভ্রমের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিলেও অপর সকলে যেমন ভ্রমে পড়িয়া আছে সেইরূপই থাকে। আর এক কথা, বিরাট মনে জগৎরূপ কল্পনার উদয় হইলেও তিনি আমাদিগের মত অজ্ঞানবন্ধনে জড়ীভূত হইয়া পড়েন না। কারণ, সর্ব্বদর্শী তিনি অজ্ঞানপ্রসূত জগৎকল্পনার ভিতরে ও বাহিরে অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুকে ওত প্রোত ভাবে বিদ্যমান দেখিতে পাইয়া থাকেন। উহা করিতে পারি না বলিয়াই আমাদের কথা স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। ঠাকুর যেমন বলিতেন, "সাপের মুখে বিষ রয়েছে, সাপ ঐ মুখ দিয়ে নিত্য আহারাদি করছে, সাপের

তাতে কিছু হচ্ছে না; কিন্তু সাপ যাকে কামড়ায় ঐ বিষে তার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।”

অতএব শাস্ত্রদৃষ্টে দেখা গেল, বিশ্ব-মনের কল্পনাসম্ভূত জগৎটা একভাবে আমাদেরও মনঃকল্পিত। কারণ, আমাদিগের ক্ষুদ্র ব্যষ্টি-মন, সমষ্টিভূত বিশ্ব-মনের সহিত শরীর ও অবয়বাদির ন্যায় অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে নিত্য অবস্থিত। আবার ঐ জগৎরূপ কল্পনা যে এককালে বিশ্ব-মনে ছিল না, পরে আরম্ভ হইল, এ কথা বলিতে পারা যায় না। কারণ, নাম ও রূপ বা দেশ ও কালরূপ পদার্থদ্বয়—যাহা না থাকিলে কোনরূপ বিচিত্রতার সৃষ্টি হইতে পারে না—জগৎরূপ কল্পনারই মধ্যগত বস্তু অথবা ঐ কল্পনার সহিত উহারা অবিচ্ছেদ্যভাবে নিত্য বিদ্যমান। স্থিরভাবে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই পাঠক ঐ কথা বুঝিতে পারিবেন এবং বেদাদি শাস্ত্র যে কেন সৃজনীশক্তির মূলীভূত কারণ প্রকৃতি বা মায়াকে অনাদি বা কালাতীত বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাও হৃদয়ঙ্গম হইবে। জগৎটা যদি মনঃকল্পিতই হয় এবং ঐ কল্পনার আরম্ভ যদি আমরা 'কাল' বলিতে যাহা বুঝি তাহার ভিতরে না হইয়া থাকে, তবে কথাটা দাঁড়াইল এই যে, কালরূপ কল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই জগৎরূপ কল্পনাটা তদাশ্রয় বিশ্ব-মনে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদিগের ক্ষুদ্র ব্যষ্টি-মন বহুকাল ধরিয়া ঐ কল্পনা দেখিতে থাকিয়া জগতের অস্তিত্বেই দৃঢ়ধারণা করিয়া রহিয়াছে এবং জগৎরূপ কল্পনার অতীত অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাৎদর্শনে বহুকাল বঞ্চিত থাকিয়া জগৎটা যে মনঃকল্পিত বস্তুমাত্র এ কথা এককালে ভুলিয়া গিয়া আপনার ভ্রম এখন ধরিতে পারিতেছে না। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যথার্থ বস্তু ও অবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই আমরা বাহিরের ও ভিতরের ভ্রম ধরিতে সর্ব্বদা সক্ষম হই।

জগৎরূপ কল্পনা দেশ-কালের বাহিরে বর্ত্তমান। প্রকৃতি অনাদি।

এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, জগৎ সম্বন্ধে আমাদিগের ধারণা ও অনুভবাদি বহুকাল-সঞ্চিত অভ্যাসের ফলে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, এবং তৎসম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানে উপনীত হইতে হইলে আমাদিগকে এখন নাম রূপ, দেশ কাল, মন বুদ্ধি প্রভৃতি জগদন্তর্গত সকল বিষয়েব অতীত পদার্থেব সহিত পরিচিত হইতে হইবে। ঐ পরিচয় পাইবাব চেষ্টাকেই বেদপ্রমুখ শাস্ত্র 'সাধন' বলিবা নির্দ্দেশ কবিয়াছেন; এবং ঐ চেষ্টা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসাবে যে স্ত্রী বা পুরুষে বিদ্যমান তাঁহারাই ভাবতে সাধক নামে অভিহিত হইবা থাকেন।

দেশকালাতীত জগৎ-কারণের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টাই সাধনা।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে, জগদতীত বস্তু অনুসন্ধানের পূর্ব্বোক্ত চেষ্টা, দুইটি প্রধান পথে এতকাল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। প্রথম শাস্ত্র যাহাকে "নেতি, নেতি" বা জ্ঞান-মার্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিযাছেন; এবং দ্বিতীয, যাহা 'ইতি, ইতি' বা ভক্তি-মার্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞানমার্গের সাধক চরম-লক্ষ্যের কথা প্রথম হইতে হৃদয়ে ধাবণা ও সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া জ্ঞাতসাবে তদভিমুখে দিন দিন অগ্রসব হইতে থাকেন। ভক্তিপথের পথিকেরা চরমে কোথায় উপস্থিত হইবেন তদ্বিষযে অনেক স্থলে অজ্ঞ থাকেন এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর লক্ষ্যান্তব পবিগ্রহ কবিতে কবিতে অগ্রসব হইবা পরিশেষে জগদতীত অদ্বৈতবস্তুর সাক্ষাৎপবিচয লাভ কবিবা থাকেন। নতুবা জগৎসম্বন্ধে সাধাবণ জনগণেব যে ধাবণা আছে তাহা উভয় পথেব পথিকগণকেই ত্যাগ কবিতে হয। জ্ঞানী উহা প্রথম হইতেই সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ কবিতে চেষ্টা কবেন; এবং ভক্ত উহার কতক ছাড়িবা কতক রাখিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেও পবিণামে জ্ঞানীব ন্যায়ই উহার সমস্ত ত্যাগ করিয়া 'একমেবাদ্বিতীয়ং' তত্ত্বে উপস্থিত হন। জগৎসম্বন্ধে উল্লিখিত

'নেতি, নেতি' ও 'ইতি ইতি' সাধনপথ।

স্বার্থপর, ভোগসুখৈকলক্ষ্য সাধারণ ধারণার পরিহারকেই শাস্ত্র 'বৈরাগ্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নিত্যপরিবর্ত্তনশীল নিশ্চিত-মৃত্যু মানবজীবনে জগতের অনিত্যতা-জ্ঞান সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয়। তজ্জন্য জগৎসম্বন্ধীয় সাধারণ ধারণা ত্যাগ করিয়া 'নেতি, নেতি'-মার্গে জগৎকারণের অনুসন্ধান করা প্রাচীন যুগে মানবের প্রথমেই উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। সে জন্য ভক্তি ও জ্ঞান উভয় মার্গ সমকালে প্রচলিত থাকিলেও ভক্তিপথের সকল বিভাগের সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি হইবার পূর্ব্বেই উপনিষদে জ্ঞানমার্গের সম্যক্ পরিপুষ্টি হওয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

'নেতি নেতি'—নিত্যস্বরূপ জগৎকারণ ইহা নহে, উহা নহে—করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইয়া মানব স্বল্পকালেই যে অন্তর্মুখী হইয়া পড়িয়াছিল, উপনিষদ্ এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। মানব বুঝিয়াছিল, অন্য বস্তুসকল অপেক্ষা তাহার দেহমনই তাহাকে সর্ব্বাগ্রে জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে; অতএব দেহ-মনাবলম্বনে জগৎ-কারণের অন্বেষণে অগ্রসর হইলে উহার সন্ধান শীঘ্র পাইবার সম্ভাবনা। আবার, "হাঁড়ির একটা ভাত টিপিয়া যেমন বুঝিতে পারা যায়, ভাতহাঁড়িটা সুসিদ্ধ হইয়াছে কি না," তদ্রূপ আপনার ভিতরে নিত্য-কারণ-স্বরূপের অনুসন্ধান পাইলেই অপর বস্তু ও ব্যক্তিসকলের অন্তরে উহার অন্বেষণ পাওয়া যাইবে। এজন্য জ্ঞানপথের পথিকের নিকট "আমি কোন্ পদার্থ" এই বিষয়ের অনুসন্ধানই একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে।

নেতি, নেতি' পথের লক্ষ্য, 'আমি কোন্ পদার্থ' তদ্বিষয় সন্ধান করা।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জগৎসম্বন্ধীয় সাধারণ ধারণা, জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়-বিধ সাধকেই ত্যাগ করিতে হয়। ঐ ধারণার একান্ত ত্যাগেই মানব-

মন সর্ব্ববৃত্তিরহিত হইয়া সমাধির অধিকারী হয়। ঐরূপ সমাধিকেই শাস্ত্র নির্ব্বিকল্প সমাধি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

নির্ব্বিকল্প সমাধি।

জ্ঞানপথের সাধক, 'আমি বাস্তবিক কোন্ পদার্থ' এই তত্ত্বের অনুসন্ধানে অগ্রসর হইয়া কিরূপে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে উপস্থিত হন এবং ঐ কালে তাঁহার কীদৃশ অনুভব হইয়া থাকে, তাহা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি। * অতএব ভক্তিপথের পথিক ঐ সমাধির অনুভবে কিরূপে উপস্থিত হইয়া থাকেন, পাঠককে এখন তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা কর্ত্তব্য।

ভক্তিমার্গকে 'ইতি ইতি'-সাধনপথ বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি। কারণ, ঐ পথের পথিক জগতের অনিত্যতা প্রত্যক্ষ করিলেও জগৎ-কর্ত্তা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়া তৎকৃত জগৎরূপ কার্য্য সত্য বর্ত্তমান বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ভক্ত জগৎ ও তন্মধ্যগত সর্ব্ব বস্তু ও ব্যক্তিকে ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত দেখিয়া আপনার করিয়া লন। ঐ সম্বন্ধ দর্শন করিবার পথে যাহা অন্তরায় বলিয়া প্রতীতি হয় তাহাকে তিনি দূর-পরিহার করেন। তদ্ভিন্ন, ঈশ্বরের কোন এক রূপের † প্রতি অনুরাগে ও ধ্যানে তন্ময় হওয়া এবং তাঁহারই প্রীতির নিমিত্ত সর্ব্বকার্য্যানুষ্ঠান করা ভক্তের আশু লক্ষ্য হইয়া থাকে।

রূপের ধ্যানে তন্ময় হইয়া কেমন করিয়া জগতের অস্তিত্ব ভুলিয়া নির্ব্বিকল্প অবস্থায় পৌঁছিতে পারা যায় এইবার আমরা তাহার অনুশীলন

---

* গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ, ২য় অধ্যায় দেখ।

† ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনাকেও আমরা রূপের ধ্যানের মধ্যেই গণনা করিতেছি। কারণ, আকার-রহিত সর্ব্বগুণান্বিত ব্যক্তিত্বের ধ্যান করিতে যাইলে আকাশ জল, বায়ু বা তেজ প্রভৃতি পদার্থনিচয়ের সদৃশ পদার্থবিশেষই মনোমধ্যে উদিত হইতে থাকে।

করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভক্ত, ঈশ্বরের কোন এক রূপকে নিজ ইষ্ট বলিয়া পরিগ্রহ করিয়া তাহারই চিন্তা ও ধ্যান করিতে থাকেন। প্রথম প্রথম, ধ্যান করিবার কালে, তিনি ঐ ইষ্টমূর্ত্তির সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণ ছবি মানসনয়নের সম্মুখে আনিতে পারেন না; কখন উহার হস্ত, কখন পদ এবং কখন বা মুখখানিমাত্র তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয়; উহাও আবার দর্শন মাত্রেই যেন লয় হইয়া যায়, সম্মুখে স্থির ভাবে অবস্থান করে না। অভ্যাসের ফলে ধ্যান গভীর হইলে ঐ মূর্ত্তির সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণ ছবি, মানসচক্ষের সম্মুখে সময়ে সময়ে উপস্থিত হয়। ধ্যান ক্রমে গভীরতর হইলে ঐ ছবি, যতক্ষণ না মন চঞ্চল হয় ততক্ষণ স্থির ভাবে সম্মুখে অবস্থান করে। পরে, ধ্যানের গভীরতার তারতম্যে ঐ মূর্ত্তির চলা ফেরা, হাসা, কথাকহা এবং চরমে উহার স্পর্শ পর্য্যন্তও ভক্তের উপলব্ধি হয়। তখন ঐ মূর্ত্তিকে সর্ব্ব প্রকারে জীবন্ত বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় এবং ভক্ত চক্ষু মুদ্রিত বা নিমীলিত করিয়া ধ্যান করুন না কেন, ঐ মূর্ত্তির ঐ প্রকার চেষ্টাদি সমভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। পরে, "আমার ইষ্টই ইচ্ছামত নানারূপ ধারণ করিয়াছেন"—এই বিশ্বাসের ফলে ভক্ত-সাধক আপন ইষ্টমূর্ত্তি হইতে নানাবিধ দিব্যরূপ সকলের সন্দর্শন লাভ করেন। ঠাকুর বলিতেন—"যে ব্যক্তি একটি রূপ ঐ প্রকার জীবন্ত ভাবে দর্শন করিয়াছে তাহার অন্য সব রূপের দর্শন সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয়।"

'ইতি ইতি' পথে নির্ব্বিকল্প সমাধি-লাভের বিবরণ।

ইতিপূর্ব্বে যে সকল কথা বলা হইল তাহা হইতে একটি বিষয় আমরা বুঝিতে পারি। ঐরূপ জীবন্ত মূর্ত্তিসকলের দর্শনলাভ যাঁহার ভাগ্যে উপস্থিত হয়, তাঁহার নিকট জাগ্রৎকালে দৃষ্ট পদার্থ সকলের ন্যায়, ধ্যানকালে দৃষ্ট ভাবরাজ্যগত ঐ সকল মূর্ত্তির সমান অস্তিত্ব অনুভব হইতে থাকে। ঐরূপে বাহ্য জগৎ ও ভাবরাজ্যের সমানাস্তিত্ববোধ যত বৃদ্ধি

পাইতে থাকে ততই তাঁহার মনে বাহ্য জগৎটাকে মনঃ-কল্পিত বলিয়া ধারণা হইতে থাকে। আবার গভীর ধ্যানকালে ভাবরাজ্যের অনুভব ভক্তের মনে এত প্রবল হইয়া উঠে যে, সেই সময়ের জন্য তাঁহার বাহ্য জগতের অনুভব ঈষন্মাত্রও থাকে না। ভক্তের ঐ অবস্থাকেই শাস্ত্র সবিকল্পসমাধি নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ প্রকার সমাধিকালে মানসিক শক্তিপ্রভাবে ভক্তের মনে বাহ্য জগতের বিলয় হইলেও ভাব-রাজ্যের বিলয় হয় না। জগতে দৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিসকলের সহিত ব্যবহার করিয়া আমরা নিত্য যেরূপ সুখদুঃখাদির অনুভব করিয়া থাকি, আপন ইষ্টমূর্ত্তির সহিত ব্যবহারে ভক্ত তখন, ঠিক তদ্রূপ অনুভব করিতে থাকেন। কেবলমাত্র ইষ্টমূর্ত্তিকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার মনে তখন যত কিছু সংকল্প-বিকল্পের উদয় হইতে থাকে। এক বিষয়কে মুখ্যরূপে অবলম্বন করিয়া ভক্তের মনে ঐ সময়ে বৃত্তি-পরম্পরার উদয় হওয়ায় জন্য শাস্ত্র তাঁহার ঐ অবস্থাকে সবিকল্পক বা বিকল্পসংযুক্ত সমাধি বলিয়াছেন।

এইরূপে ভাবরাজ্যের অন্তর্গত বিষয় বিশেষের চিন্তায় ভক্তের মনে স্থূল বাহ্য জগতের এবং এক ভাবের প্রাবল্যে অন্য ভাবসকলের বিলয় সাধিত হয়। যে ভক্তসাধক এতদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন, সমাধির নির্ব্বিকল্পভূমি লাভ তাঁহার নিকট অধিক দূরবর্ত্তী নহে। জগতের বহুকালাভ্যস্ত অস্তিত্বজ্ঞান যিনি এতদূর দূরীকরণে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহার মন যে সমধিক শক্তিসম্পন্ন ও দৃঢ়সংকল্প হইয়াছে, একথা বলিতে হইবে না। মনকে এককালে নির্ব্বিকল্প করিতে পারিলে ঈশ্বরসম্ভোগ অধিক ভিন্ন অল্প হয় না, একথা একবার ধারণা হইলেই তাঁহার সমগ্র মন ঐদিকে সোৎসাহে ধাবিত হয় এবং শ্রীগুরু ও ঈশ্বরকৃপায় তিনি অচিরে ভাবরাজ্যের চরম ভূমিতে আরোহণ করিয়া অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থানপূর্ব্বক চিরশান্তির অধিকারী হন। অথবা বলা যাইতে পারে, প্রগাঢ় ইষ্টপ্রেমই তাঁহাকে ঐ ভূমি দেখাইয়া দেয় এবং

ব্রজগোপিকাগণের ন্যায় উহার প্রেরণায় তিনি আপন ইষ্টের সহিত তখন একত্বানুভব করেন।

জ্ঞানী এবং ভক্ত সাধককুলের চরম লক্ষ্যে উপনীত হইবার ঐরূপ ক্রম শাস্ত্রনির্দ্ধারিত। অবতারপুরুষসকলে কিন্তু দেব এবং মানব উভয় ভাবের একত্র সম্মিলন আজীবন বিদ্যমান থাকায় সাধনকালেই তাঁহাদিগকে কখন কখন সিদ্ধের ন্যায় প্রকাশ ও শক্তিসম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। দেব এবং মানব উভয় ভূমিতে তাঁহাদিগের স্বভাবতঃ বিচরণ করিবার শক্তি থাকাতে ঐরূপ হইয়া থাকে; অথবা, ভিতরের দেবভাব তাঁহাদিগের সহজ স্বাভাবিক অবস্থা হওয়ায় উহা তাঁহাদিগের মানবভাবের বাহিরাবরণকে সময়ে সময়ে ভেদ করিয়া ঐরূপে স্বতঃপ্রকাশিত হয়,—মীমাংসা যাহাই হউক না কেন, ঐরূপ ঘটনা কিন্তু

অবতার-পুরুষে দেব ও মানব উভয় ভাব বিদ্যমান থাকায় সাধনকালে তাঁহাদিগকে সিদ্ধের ন্যায় প্রতীতি হয়। দেব ও মানব উভয় ভাবে তাঁহাদিগের জীবনালোচনা আবশ্যক।

অবতারপুরুষসকলের জীবন মানববুদ্ধির নিকটে দুর্ভেদ্য জটিলতাময় করিয়া রাখিয়াছে। ঐ জটিল রহস্য কখনও যে সম্পূর্ণ ভেদ হইবে, বোধ হয় না। কিন্তু শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উহার অনুশীলনে মানবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়, এক কথা ধ্রুব। প্রাচীন পৌরাণিক যুগে অবতার-চরিত্রের মানবভাবটি ঢাকিয়া চাপিয়া দেবভাবটির আলোচনাই করা হইয়াছিল—সন্দেহশীল বর্ত্তমান যুগে ঐ চরিত্রের দেবভাবটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়া মানবভাবটির আলোচনাই চলিয়াছে—বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা ঐ চরিত্রের আলোচনায় উহাতে তদুভয় ভাব যে একত্র একই কালে বিদ্যমান থাকে এই কথাই পাঠককে বুঝাইতে প্রয়াস করিব। বলা বাহুল্য, দেব-মানব ঠাকুরের পুণ্যদর্শন জীবনে না ঘটিলে অবতার-চরিত্র ঐরূপে দেখিতে আমরা কখনই সমর্থ হইতাম না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অবতারজীবনে সাধকভাব।

পুণ্য-দর্শন ঠাকুরের দিব্যসঙ্গলাভে কৃতার্থ হইয়া আমরা তাঁহার জীবন ও চরিত্রের যতই অনুধ্যান করিয়াছি ততই তাঁহাতে দেব ও মানব উভয়বিধ ভাবের বিচিত্র সম্মিলন দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। মধুর সামঞ্জস্যে ঐরূপ বিপরীত ভাবসমষ্টির একত্র একাধারে বর্ত্তমান, যে সম্ভবপর একথা তাঁহাকে না দেখিলে আমাদের কখনই ধারণা হইত না। ঐরূপ দেখিয়াছি বলিয়াই আমাদিগের ধারণা, তিনি দেব-মানব,—পূর্ণ দেবত্বের ভাব ও শক্তিসমূহ মানবীয় দেহ ও ভাবাবরণে প্রকাশিত হইলে যাহা হয়, তিনি তাহাই। ঐরূপ দেখিয়াছি বলিয়াই বুঝিয়াছি যে, ঐ উভয় ভাবের কোনটিই তিনি বৃথা ভাণ করেন নাই এবং মানব ভাব তিনি লোকহিতায় যথার্থই স্বীকার করিয়া উহা হইতে দেবত্বে উঠিবার পথ আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন। আবার, দেখিয়াছি বলিয়াই একথা বুঝিতে পারিয়াছি যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের সকল অবতার-পুরুষের জীবনেই ঐ উভয় ভাবের ঐরূপ বিচিত্র প্রকাশ নিশ্চয় উপস্থিত হইয়াছিল।

ঠাকুরে দেব ও মানব ভাবের মিলন।

শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া অবতারপুরুষসকলের মধ্যে কাহারও জীবনকথা আলোচনা করিতে যাইলেই আমরা ঐরূপ দেখিতে পাইব। দেখিতে পাইব, তাঁহারা কখন আমাদের ভাব-ভূমিতে থাকিয়া জগতস্থ যাবতীয় বস্তু ও ব্যক্তির সহিত আমাদিগেরই ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন—আবার, কখন বা উচ্চ ভাব-ভূমিতে বিচরণপূর্ব্বক

আমাদিগের অজ্ঞাত, অপরিচিত ভাব ও শক্তিসম্পন্ন এক নূতন রাজ্যের সংবাদ আমাদিগকে আনিয়া দিতেছেন!—তাঁহাদের ইচ্ছা না থাকিলেও কে যেন সকল বিষয়েব যোগাযোগ কবিষা তাঁহাদিগকে ঐরূপ করাইতেছে! আশৈশবই ঐরূপ। তবে, শৈশবে সময়ে সময়ে ঐ শক্তির পরিচয় পাইলেও উহা যে তাঁহাদিগেব নিজস্ব এবং অন্তরেই অবস্থিত একথা তাঁহারা অনেক সময়ে বুঝিতে পাবেন না, অথবা ইচ্ছামাত্রেই ঐ শক্তিপ্রয়োগে উচ্চ-ভাব-ভূমিতে আবোহণপূর্ব্বক দিব্যভাবসহায়ে জগদন্তর্গত সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে দেখিতে ও তাঁহাদিগের সহিত তদনুরূপ ব্যবহাব কবিতে পারেন না। কিন্তু ঐ শক্তির অস্তিত্ব জীবনে বাবম্বাব প্রত্যক্ষ করিতে করিতে উহাব সহিত সম্যক্‌রূপে পরিচিত হইবাব প্রবল বাসনা তাঁহাদেব মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে এবং ঐ বাসনাই তাঁহাদিগকে অলৌকিক অনুরাগসম্পন্ন করিয়া সাধনে নিযুক্ত করে।

সকল অবতার-পুরুষেই ঐরূপ।

তাঁহাদিগেব ঐরূপ বাসনায স্বার্থপবতাব নাম গন্ধ থাকে না। ঐহিক বা পাবলৌকিক কোন প্রকাব ভোগ-সুখ লাভের প্রেরণা ত দূরেব কথা, পৃথিবীস্থ অপর অপব সকল ব্যক্তির যাহা হইবাব হউক আমি মুক্তিলাভ করিয়া ভূমানন্দে থাকি—এইরূপ ভাব পর্য্যন্ত তাঁহাদিগেব ঐ বাসনায় দেখা যায় না। কেবল, যে অজ্ঞাত দিব্য শক্তিব নিয়োগে তাঁহারা জন্মাবধি অসাধারণ দিব্যভাবসকল অনুভব করিতেছেন এবং স্থূল জগতে দৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিসকলের ন্যায় ভাববাজ্যগত সকল বিষয়ের সমসমান অস্তিত্ব সময়ে সময়ে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, সেই শক্তি কি বাস্তবিকই জগতের অন্তরালে অবস্থিত অথবা স্বকপোলকল্পনা-বিজৃম্ভিত, তদ্বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানই তাঁহাদিগের ঐ বাসনার মূলে

অবতার-পুরুষে স্বার্থ-সুখের বাসনা থাকে না।

পরিলক্ষিত হয়। কারণ, অপর সাধারণের প্রত্যক্ষ ও অনুভবাদির সহিত আপনাদিগের প্রত্যক্ষ সকলের তুলনা করিয়া একথা তাঁহাদিগের স্বল্পকালেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, তাঁহারা আজীবন জগতস্থ বস্তু ও ব্যক্তিসকলকে যে ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছেন অপরে তদ্রূপ করিতেছে না—ভাবরাজ্যের উচ্চভূমি হইতে জগৎটা দেখিবার সামর্থ্য তাহাদের এক প্রকার নাই বলিলেই হয়।

তাহাদিগের করুণা ও পরার্থে সাধন ভজন।

শুধু তাহাই নহে। পূর্ব্বোক্ত তুলনায় তাঁহাদের আর একটি কথাও সঙ্গে সঙ্গে ধারণা হইয়া পড়ে। তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, সাধারণ ও দিব্য দুই ভূমি হইতে জগৎটাকে দুই ভাবে দেখিতে পান বলিয়াই দুই দিনের নশ্বর জীবনে আপাতমনোরম রূপরসাদি তাঁহাদিগকে মানবসাধারণের ন্যায় প্রলোভিত করিতে পারে না, এবং নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল সংসারের নানা অবস্থাবিপর্য্যয়ে, অশান্তি ও নৈরাশ্যের নিবিড় ছায়া তাঁহাদিগের মনকে আবৃত করিতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত শক্তিকে সম্যক্‌প্রকারে আপনার করিয়া লইয়া কেমন করিয়া ইচ্ছামাত্র উচ্চ ও উচ্চতর ভাব-ভূমি সকলে স্বয়ং আরোহণ এবং যতকাল ইচ্ছা তথায় অবস্থান করিতে পারিবেন, এবং আপামর সাধারণকে ঐরূপ করিতে শিখাইয়া শান্তির অধিকারী করিবেন, এই চিন্তাতেই তাঁহাদের করুণাপূর্ণ মন এককালে নিমগ্ন হইয়া পড়ে। এজন্যই দেখা যায়, সাধনা ও করুণার দুইটি প্রবল প্রবাহ তাঁহাদিগের জীবনে নিরন্তর পাশাপাশি প্রবাহিত হইতেছে! মানবসাধারণের সহিত আপনাদিগের অবস্থার তুলনায় ঐ করুণা তাঁহাদিগের অন্তরে শতধারে বর্দ্ধিত হইতে পারে কিন্তু ঐরূপেই যে উহার উৎপত্তি হয় একথা বলা যায় না। উহা সঙ্গে লইয়াই তাহারা সংসারে জন্মিয়া থাকেন। ঠাকুরের ঐ বিষয়ক একটি দৃষ্টান্ত স্মরণ কর—

ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'তিন বন্ধুর আনন্দ-কানন দর্শন' সম্বন্ধে ঠাকুরের গল্প।

"তিন বন্ধুতে মাঠে বেড়াতে গিয়েছিল। বেড়াতে বেড়াতে মাঠের মাঝখানে উপস্থিত হয়ে দেখ্‌লে উঁচু পাঁচিলে ঘেরা একটা জায়গা—তার ভিতর থেকে গান বাজনার মধুর আওয়াজ আস্‌ছে! শুনে ইচ্ছা হোলো, ভিতরে কি হচ্ছে দেখ্‌বে। চারিদিকে ঘুরে দেখ্‌লে, ভিতরে ঢোক্‌বার একটিও দরজা নাই। কি করে?—একজন কোন রকমে একটা মই যোগাড় করে পাঁচিলের উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌লো ও অপর দুই জন নীচে দাঁড়িয়ে রইলো। প্রথম লোকটি পাঁচিলের উপরে উঠে ভিতরের ব্যাপার দেখে আনন্দে অধীর হয়ে হাঃ হাঃ করে হাস্‌তে হাস্‌তে লাফিয়ে পড়্‌লো—কি যে ভিতরে দেখ্‌লে তা নীচের দুজনকে বল্‌বার জন্য একটুও অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌লে না। তারা ভাব্‌লে বাঃ, বন্ধু ত বেশ, একবার বল্‌লেও না কি দেখ্‌লে!—যা হোক দেখ্‌তে হলো। আর একজন ঐ মই বেয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। উপরে উঠে সেও প্রথম লোকটির মত হাঃ হাঃ করে হেসে ভিতরে লাফিয়ে পড়্‌লো। তৃতীয় লোকটি তখন কি করে—ঐ মৈ বেয়ে উপরে উঠ্‌লো ও ভিতরের আনন্দের মেলা দেখ্‌তে পেলে। দেখে প্রথমে তার মনে খুব ইচ্ছা হলো সেও উহাতে যোগ দেয়। পরেই ভাবলে—কিন্তু আমি যদি এখনি উহাতে যোগদান করি তা হলে বাহিরের অপর দশজনে ত জান্‌তে পার্‌বে না, এখানে এমন আনন্দ উপভোগের জায়গা আছে; একলা এই আনন্দটা ভোগ কর্‌বো? ঐ ভেবে, সে জোর করে নিজের মনকে ফিরিয়ে নেবে এলো ও দুচোকে যাকেই দেখ্‌তে পেলে তাকেই হেঁকে বল্‌তে লাগ্‌লো—ওহে এখানে এমন আনন্দের স্থান রয়েছে, চল চল সকলে মিলে ভোগ করি। ঐরূপে বহু ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে সেও উহাতে যোগ দিলে।" এখন বুঝ তৃতীয় ব্যক্তির মনে দশজনকে

সঙ্গে লইয়া আনন্দোপভোগের ইচ্ছার কারণ যেমন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তদ্রূপ অবতার-পুরুষসকলের মনে লোককল্যাণসাধনের ইচ্ছা কেন যে আশৈশব বিদ্যমান থাকে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না।

পূর্ব্বোক্ত কথায় কেহ কেহ হয়ত স্থির করিবেন, অবতার-পুরুষসকলকে আমাদিগের ন্যায় দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়সকলের সহিত কখনও সংগ্রাম করিতে হয় না; শিষ্ট শান্ত বালকের ন্যায় উহারা বুঝি আজন্ম তাঁহাদিগের বশে নিরন্তর উঠিতে বসিতে থাকে এবং সেই জন্য সংসারের রূপরসাদি হইতে মনকে ফিরাইয়া তাঁহারা সহজেই উচ্চ লক্ষ্যে চালিত করিতে পারেন। উত্তরে আমরা বলি, তাহা নহে, ঐ বিষয়েও নরবৎ নরলীলা হইয়া থাকে; এখানেও তাঁহাদিগকে সংগ্রামে জয়ী হইয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হয়।

অবতার-পুরুষদিগকে সাধারণ মানবের ন্যায় সংযম অভ্যাস করিতে হয়।

মানব-মনের স্বভাবসম্বন্ধে যিনি কিছুমাত্র জানিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই দেখিতে পাইয়াছেন স্থূল হইতে আরম্ভ হইয়া সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম অনন্ত বাসনাস্তরসমূহ উহার ভিতরে বিদ্যমান রহিয়াছে। এক-টিকে যদি কোনরূপে অতিক্রম করিতে তুমি সমর্থ হইয়াছ তবে আর একটি আসিয়া তোমার পথরোধ করিল—সেটিকে পরাজিত করিলে ত আর একটি আসিল—স্থূলকে পরাজিত করিলে ত সূক্ষ্ম আসিল—তাহাকে পশ্চাৎপদ করিলে ত সূক্ষ্মতর বাসনাশ্রেণী তোমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দণ্ডায়মান হইল! কাম যদি ছাড়িলে ত কাঞ্চন আসিল; স্থূলভাবে কাম-কাঞ্চন গ্রহণে বিরত হইলে ত সৌন্দর্য্যানুরাগ, লোকৈষণা মান-যশাদি সম্মুখে উপস্থিত হইল; অথবা মায়িকসম্বন্ধ সকল যত্নপূর্ব্বক পরিহার করিলে তবে আলস্য বা করুণাকারে মায়ামোহ আসিয়া তোমার হৃদয় অধিকার করিল।

মনের অনন্ত বাসনা।

মনের ঐরূপ স্বভাবের উল্লেখ করিয়া বাসনাজাল হইতে দূরে থাকিতে ঠাকুর আমাদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক করিতেন। নিজ জীবনের ঘটনাবলী * ও চিন্তাপর্য্যন্ত সময়ে সময়ে দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করিয়া তিনি ঐ বিষয় আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেন। পুরুষ-ভক্তদিগের ন্যায় স্ত্রীভক্তদিগকেও তিনি ঐ কথা বারম্বার বলিয়া তাঁহাদিগের অন্তরে ঈশ্বরানুরাগ উদ্দীপিত করিতেন। তাঁহার এক-দিনের ঐরূপ ব্যবহার এখানে বলিলেই পাঠক ঐ কথা বুঝিতে পারিবেন।

বাসনাত্যাগ সম্বন্ধে ঠাকুরের প্রেরণা।

স্ত্রী বা পুরুষ ঠাকুরের নিকট যে কেহই যাইতেন সকলেই তাঁহার অমায়িকতা, সদ্ব্যবহার, ও কামগন্ধরহিত অদ্ভুত ভালবাসার আকর্ষণ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন এবং সুবিধা হইলেই পুনরায় তাঁহার পুণ্যদর্শনলাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। ঐরূপে তাঁহারা যে নিজেই তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন তাহা নহে, নিজের পরিচিত সকলকে ঠাকুরের নিকট লইয়া যাইয়া তাহারাও যাহাতে তাঁহার দর্শনে বিমলানন্দ উপভোগ করিতে পারে তজ্জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেন। আমাদিগের পরিচিতা জনৈকা ঐরূপে একদিন তাঁহার বৈমাত্রেয়া ভগ্নী ও তাঁহার স্বামীর সহোদরাকে সঙ্গে লইয়া অপরাহ্নে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে ঠাকুর তাঁহাদের পরিচয় ও কুশল প্রশ্নাদি করিয়া, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগবান্ হওয়াই মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, এই বিষয়ে কথা পাড়িয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—

* গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ, ১ম অধ্যায় ২৮ পৃষ্ঠা এবং ২য় অধ্যায় ৬০ ও ৬৩ পৃষ্ঠা দেখ

"ভগবানের শরণাপন্ন কি সহজে হওয়া যায় গা? মহামায়ার এমনি কাণ্ড—হতে কি দেয়? যার তিনকুলে কেউ নেই তাকে দিয়ে একটা বিড়াল পুষিয়ে সংসার করাবে!—সেও বিড়ালের মাছ, দুধ ঘুরে ঘুরে জোগাড় করবে, আর বলবে, 'মাছ, দুধ না হলে বিড়ালটা খায় না, কি করি?'

ঐবিষয়ে স্ত্রীভক্তদিগকে উপদেশ।

"হয়ত, বড় বনেদি ঘর। পতি পুত্তুর সব মরে গেল—কেউ নেই—রইল কেবল গোটাকতক রাঁড়ি!—তাদের মরণ নাই! বাড়ির এখানটা পড়ে গেছে, ওখানটা ধসে গেছে, ছাদের উপর অশ্বথ গাছ জন্মেছে—তার সঙ্গে দুচার গাছা ডেঙ্গো ডাঁটাও জন্মেছে; রাঁড়িরা তাই তুলে চচ্চড়ি রাঁধচে ও সংসার কর্‌চে। কেন? ভগবানকে ডাকুক না কেন? তাঁর শরণাপন্ন হোক্ না—তার ত সময় হয়েছে। তা হবে না!

"হয়ত বা কারুর বিয়ের পরে স্বামী মরে গেল—কড়ে রাঁড়ি! ভগবানকে ডাকুক্ না কেন? তা নয়—ভাইয়ের ঘরে গিন্নি হোল! মাথায় কাগা খোঁপা, আঁচলে চাবির থোলো বেঁধে, হাত নেড়ে গিন্নিপনা কচ্চেন—সর্ব্বনাশীকে দেখ্‌লে পাড়া শুদ্ধ লোক ডরায়!—আর বলে বেড়াচ্চেন—'আমি না হলে দাদার খাওয়াই হয় না।'—মর মাগি, তোর কি হোলো তা ত্যাখ্—তা না।"

এক রহস্যের কথা—আমাদের পরিচিতা রমণীর ভগ্নীর ঠাকুরঝি—যিনি অদ্য প্রথমবার ঠাকুরের দর্শন লাভ করিলেন, ভ্রাতার ঘরে গৃহিনী ভগ্নীদিগের শ্রেণীভুক্তা ছিলেন। ঠাকুরকে কেহই সে কথা ইতিপূর্ব্বে বলে নাই। কিন্তু কথায় কথায় ঠাকুর ঐ দৃষ্টান্ত আনিয়া বাসনার প্রবল প্রতাপ ও মানবমনে অনন্ত বাসনান্তরের কথা বুঝাইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য কথাগুলি ঐ স্ত্রীলোকটির অন্তরে

অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। দৃষ্টান্তগুলি শুনিয়া আমাদিগের পরিচিতা রমণীর ভগ্নী তাঁহার গা ঠেলিয়া চুপি চুপি বলিলেন—"ও ভাই,—আজই কি ঠাকুরের মুখ দিয়ে এই কথা বেরুতে হয়!—ঠাকুরঝি কি মনে কর্‌বে!" পরিচিতা বলিলেন "তা কি কর্‌বো; ওঁর ইচ্ছা, ওঁকে আর ত কেউ শিখিয়ে দেয় নি?"

অবতার-পুরুষদিগের সূক্ষ্ম বাসনার সহিত সংগ্রাম।

মানবপ্রকৃতির আলোচনায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যাহার মন যত উচ্চে উঠে, সূক্ষ্ম বাসনাবাজি তাহাকে তত তীব্র যাতনা অনুভব করায়। চুরি, মিথ্যা বা লাম্পট্য যে অসংখ্যবার করিয়াছে, তাহার ঐরূপ কার্য্যের পুনরনুষ্ঠান তত কষ্টকর হয় না, কিন্তু উদার উচ্চ অন্তঃকরণ ঐ সকলের চিন্তামাত্রেই আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া বিষম যন্ত্রণায় মুহ্যমান হয়। অবতার-পুরুষসকলকে আজীবন স্থূলভাবে বিষয়গ্রহণে অনেকস্থলে বিরত থাকিতে দেখা যাইলেও, অন্তরের সূক্ষ্ম বাসনাশ্রেণীর সহিত সংগ্রাম যে তাঁহারা আমাদিগের ন্যায় সমভাবেই করিয়া থাকেন এবং মনের ভিতর উহাদিগের মূর্ত্তি দেখিয়া আমাদিগের অপেক্ষা শত সহস্রগুণ অধিক যন্ত্রণা অনুভব করেন, একথা তাঁহারা স্বয়ং স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অতএব রূপরসাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে ফিরাইতে তাঁহাদিগের সংগ্রামকে ভাণ কিরূপে বলিব?

অবতার-পুরুষের মানবভাব সম্বন্ধে আপত্তি ও মীমাংসা।

শাস্ত্রদর্শী কোন পাঠক হয়ত এখনও বলিবেন, "কিন্তু তোমার কথা মানি কিরূপে? এই দেখ অদ্বৈতবাদীর শিরোমণি আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার গীতা-ভাষ্যের প্রারম্ভে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও নরদেহধারণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাব, সকল জীবের নিয়ামক, জন্মাদিরহিত ঈশ্বর লোকানুগ্রহ করিবেন বলিয়া

নিজ মায়াশক্তি দ্বারা যেন দেহবান্ হইয়াছেন, যেন জন্মিয়াছেন, এইরূপ পরিলক্ষিত হয়েন।' * স্বয়ং আচার্য্যই যখন ঐ কথা বলিতেছেন, তখন তোমাদের পূর্ব্বোক্ত কথা দাঁড়ায় কিরূপে?" আমরা বলি, আচার্য্য ঐরূপ বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমাদিগের দাঁড়াইবার স্থল আছে। আচার্য্যের ঐকথা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি, ঈশ্বরের দেহধারণ বা নামরূপবিশিষ্ট হওয়াটাকে যেমন ভাণ বলিতেছেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তোমার, আমার এবং জগতের প্রত্যেক বস্তু ও ব্যক্তির নামরূপবিশিষ্ট হওয়া-টাকে ভাণ বলিতেছেন। সমস্ত জগৎটাকেই তিনি ব্রহ্মবস্তুর উপরে মিথ্যাভাণ বলিতেছেন বা উহার বাস্তব সত্তা স্বীকার করিতেছেন না। † অতএব তাঁহার ঐ উভয় কথা একত্রে গ্রহণ করিলে তবেই তৎকৃত মীমাংসা বুঝা যাইবে। অবতারের দেহধারণ ও সুখদুঃখাদি অনুভব-গুলিকে মিথ্যা ভাণ বলিয়া ধরিব এবং আমাদিগের ঐ বিষয়গুলিকে সত্য বলিব একরূপ তাঁহার অভিপ্রায় নহে। আমাদিগের অনুভব ও প্রত্যক্ষকে সত্য বলিলে অবতার-পুরুষদিগের প্রত্যক্ষাদিকেও সত্য বলিয়া ধরিতে হইবে! সুতরাং পূর্ব্বোক্ত কথায় আমরা অন্যায় কিছু বলি নাই।

কথাটির আর এক ভাবে আলোচনা করিলে পরিষ্কার বুঝা যাইবে।

ঐ কথার তত্ত্বভাবে আলোচনা।

অদ্বৈতভাব-ভূমি ও সাধারণ বা দ্বৈতভাব-ভূমি হইতে দৃষ্টি করিয়া জগৎসম্বন্ধে দুই প্রকার ধারণা আমাদিগের উপস্থিত হয়—শাস্ত্র এই কথা বলেন। প্রথমটিতে আরোহণ করিয়া জগৎরূপ পদার্থটা কতদূর সত্য বুঝিতে

---

* স চ ভগবান্ . অজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাতইব লোকানুগ্রহং কুর্ব্বন্ লক্ষ্যতে।

গীতা—শাঙ্করভাষ্যের উপক্রমণিকা।

† শারীরকভাষ্যে অধ্যাসনিরূপণ দেখ।

থাইলে প্রত্যক্ষ বোধ হয়, উহা নাই বা কোনও কালে ছিল না—'একমেবাদ্বিতীয়ং' ব্রহ্ম-বস্তু ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নাই; আর দ্বিতীয় বা দ্বৈতভাব-ভূমিতে থাকিয়া জগৎটাকে দেখিলে নানা নামরূপের সমষ্টি উহাকে সত্য ও নিত্য বর্তমান বলিয়া বোধ হয়, যেমন আমাদিগের ন্যায় মানবসাধারণের সর্বক্ষণ হইতেছে। দেহস্থ থাকিয়াও বিদেহভাবসম্পন্ন অবতার ও জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের অদ্বৈতভূমিতে অবস্থান জীবনে অনেক সময় হওয়ায় নিম্নের দ্বৈতভূমিতে অবস্থানকালে জগৎটাকে স্বপ্নতুল্য মিথ্যা বলিয়া ধারণা হইয়া থাকে। কিন্তু জাগ্রদবস্থার সহিত তুলনায় স্বপ্ন মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইলেও স্বপ্নসন্দর্শনকালে যেমন উহাকে এককালে মিথ্যা বলা যায় না, জীবন্মুক্ত ও অবতার-পুরুষদিগের মনের জগদাভাসকেও সেইরূপ এককালে মিথ্যা বলা চলে না।

জগৎরূপ পদার্থটাকে পূর্বোক্ত দুই ভূমি হইতে যেমন দুই ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি আবার উহার অন্তর্গত কোন ব্যক্তিবিশেষকেও ঐরূপে দুই ভাবভূমি হইতে দুই প্রকারে দেখা গিয়া থাকে। দ্বৈতভাব-ভূমি হইতে দেখিলে ঐ ব্যক্তিকে বদ্ধমানব এবং পূর্ণ অদ্বৈতভূমি হইতে দেখিলে তাহাকে নিত্য-শুদ্ধ-মুক্তস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া বোধ হয়। পূর্ণ অদ্বৈত-ভূমি ভাবরাজ্যের সর্বোচ্চ প্রদেশ। উহাতে আরোহণ করিবার পূর্বে মানব-মন উচ্চ উচ্চতর

উচ্চতর ভাবভূমি হইতে জগৎ সম্বন্ধে ভিন্ন উপলব্ধি।

নানা ভাবভূমির ভিতর দিয়া উঠিয়া পরিশেষে গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হয়। ঐ সকল উচ্চ উচ্চতর ভাবভূমিতে উঠিবার কালে জগৎ ও তদন্তর্গত ব্যক্তিবিশেষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাধকের নিকট প্রতীয়মান হইতে থাকিয়া উহাদের সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব ধারণা নানারূপে পরিবর্তিত হইতে থাকে। যথা—জগৎটাকে ভাবময় বলিয়া বোধ হয়; অথবা,

ব্যক্তিবিশেষকে শরীর হইতে পৃথক্, অদৃষ্টপূর্ব্ব শক্তিশালী, মনোময় বা দিব্য জ্যোতির্ম্ময় ইত্যাদি বলিয়া বোধ হইতে থাকে!

অবতার-পুরুষদিগের শক্তিতে মানব উচ্চ-ভাবে উঠিয়া তাঁহাদিগকে মানব-ভাবপরিশূন্য দেখে।

অবতার-পুরুষদিগের নিকট শ্রদ্ধা ও ভক্তিসম্পন্ন হইয়া উপস্থিত হইলে সাধারণ মানব অজ্ঞাতসারে পূর্ব্বোক্ত উচ্চ উচ্চতর ভাবভূমিতে আরূঢ় হইয়া থাকে। অবশ্য তাঁহাদিগের বিচিত্র শক্তিপ্রভাবেই তাহাদিগের ঐ প্রকার আরোহণসামর্থ্য উপস্থিত হয়। অতএব বুঝা যাইতেছে, ঐ সকল উচ্চভূমি হইতে তাঁহাদিগকে ঐরূপ বিচিত্রভাবে দেখিতে পাইয়াই ভক্ত সাধক তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ধারণা করিয়া বসেন যে, বিচিত্রশক্তিসম্পন্ন দিব্যভাবই তাঁহাদিগের যথার্থ স্বরূপ এবং ইতরসাধারণে তাঁহাদিগের ভিতরে যে মানবভাব দেখিতে পায় তাহা তাঁহারা মিথ্যাভাণ করিয়া তাহাদিগকে দেখাইয়া থাকেন। ভক্তির গভীরতার সঙ্গে ভক্ত সাধকের প্রথমে ঈশ্বরের ভক্তসকলের সম্বন্ধে এবং পরে ঈশ্বরের জগৎ সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণা হইতে দেখা গিয়া থাকে।

অবতার-পুরুষদিগের মনের ক্রমোন্নতি। জীব ও অবতারের শক্তির প্রভেদ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মনের উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিয়া ভাবরাজ্যে দৃষ্ট বিষয়সকলে, জগতে প্রতিনিয়ত পরিদৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিসকলের ন্যায় দৃঢ় অস্তিত্বানুভব, অবতার-পুরুষসকলের জীবনে শৈশব কাল হইতে সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। পরে, দিনের পর যতই দিন যাইতে থাকে এবং ঐরূপ দর্শন তাঁহাদিগের জীবনে বারম্বার যত উপস্থিত হইতে থাকে, তত তাঁহারা স্থূল, বাহ্য জগতের অপেক্ষা ভাবরাজ্যের অস্তিত্বেই সমধিক বিশ্বাসবান হইয়া পড়েন। পরিশেষে, সর্ব্বোচ্চ অদ্বৈতভাব-ভূমিতে উঠিয়া যে একমেবাদ্বিতীয়ং বস্তু হইতে নানা নামরূপময় জগতের বিকাশ হইয়াছে তাহার সন্ধান

পাইয়া তাঁহারা সিদ্ধকাম হন। জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের সম্বন্ধেও ঐরূপ হইয়া থাকে। তবে অবতার-পুরুষেরা অতি স্বল্পকালে যে সত্যে উপনীত হন তাহা উপলব্ধি করিতে তাঁহাদিগের আজীবন চেষ্টার আবশ্যক হয়। অথবা, স্বয়ং স্বল্পকালে অদ্বৈত-ভূমিতে আরোহণ করিতে পারিলেও অপরকে ঐ ভূমিতে আরোহণ করাইয়া দিবার শক্তি তাঁহাদিগের ভিতর, অবতার-পুরুষদিগের সহিত তুলনায় অতি অল্পমাত্রই প্রকাশিত হয়। ঠাকুরের ঐ বিষয়ক শিক্ষা স্মরণ কর—"জীব ও অবতারে শক্তির প্রকাশ লইয়াই প্রভেদ।"

অবতার—দেব-মানব, সর্ব্বজ্ঞ।

অদ্বৈত-ভূমিতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া জগৎ-কারণের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষে পরিতৃপ্ত হইয়া অবতার-পুরুষেরা যখন পুনরায় মনের নিম্ন ভূমিতে অবরোহণ করেন তখন সাধারণ দৃষ্টিতে মানবমাত্র থাকিলেও তাঁহারা যথার্থই অমানব বা দেবমানব পদবী প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহারা জগৎ ও তৎকারণ উভয় পদার্থকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া তুলনায় বাহ্যান্তর জগৎটার ছায়ার ন্যায় অস্তিত্ব সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অনুভব করিতে থাকেন। তখন তাঁহাদিগের ভিতর দিয়া মনে অসাধারণ উচ্চশক্তিসমূহ স্বতঃ লোকহিতায় নিত্য প্রকাশিত হইতে থাকে এবং জগতে পরিদৃষ্ট সকল পদার্থের আদি, মধ্য ও অন্ত সম্যক্ অবগত হইয়া তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করেন। স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন মানব আমরা তখনই তাঁহাদিগের অলৌকিক চরিত্র ও চেষ্টাদি প্রত্যক্ষপূর্ব্বক তাঁহাদিগের অভয় শরণ গ্রহণ করিয়া থাকি এবং তাঁহাদিগের অপার করুণায় পুনরায় একথা হৃদয়ঙ্গম করি যে—বহির্ম্মুখী বৃত্তি লইয়া বাহ্যজগতে পরিদৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিসকলের অবলম্বনে যথার্থ সত্যলাভ, বা জগৎ-কারণের অনুসন্ধান ও শান্তিলাভ, কখনই সফল হইবার নহে।

পাশ্চাত্যবিদ্যা-পারদর্শী পাঠক আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত কথা শ্রবণ

করিয়া নিশ্চয় বলিবেন—বাহ্যজগতের বস্তু ও ব্যক্তিসকলকে অবলম্বন করিয়া অনুসন্ধানে মানবের জ্ঞান আজকাল কতদূর উন্নত হইয়াছে ও নিত্য হইতেছে তাহা যে দেখিয়াছে সে ঐরূপ কথা কখনই বলিতে পারে না। উত্তরে আমরা বলি—জড়বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা মানবের জ্ঞানবৃদ্ধির কথা সত্য হইলেও উহার সহায়ে পূর্ণ-সত্য লাভ আমাদিগের কখনই সাধিত হইবে না। কারণ, যে বিজ্ঞান জগৎ-কারণকে - জড় অথবা আমাদিগের অপেক্ষাও অধম, নিকৃষ্ট দরের বস্তু বলিয়া ধারণা করিতে শিক্ষা দিতেছে তাহার উন্নতি দ্বারা আমরা ক্রমশঃ বহির্মুখী হইয়া অধিক ঃবিনাশে রূপরসাদি ভোগলাভকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়া বসিতেছি। অতএব একমাত্র জড় বস্তু হইতে জগতের সকল বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে একথা যন্ত্রসহায়ে কোন কালে প্রমাণ করিতে পারিলেও অন্তররাজ্যের বিষয়সকল আমাদিগের নিকট চিরকালই অন্ধকারাবৃত ও অপ্রমাণিত থাকিবে। ভোগবাসনাত্যাগ, ও অন্তর্মুখী বৃত্তিসম্পন্ন হওয়ার ভিতর দিয়াই মানবের মুক্তিলাভের পথ, একথা যতদিন না হৃদয়ঙ্গম হইবে ততদিন আমাদিগের দেশকালাতীত অখণ্ড সত্যলাভপূর্ব্বক শান্তিলাভ সুদূরপরাহতই থাকিবে।

বহির্মুখী বৃত্তি লইয়া জড়বিজ্ঞানের আলোচনায় জগৎ-কারণের জ্ঞানলাভ অসম্ভব।

ভাবরাজ্যের বিষয় লইয়া বাল্যকালে সময়ে সময়ে তন্ময় হইয়া যাইবার কথা সকল অবতার-পুরুষের জীবনেই শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে স্বীয় দেবত্বের পরিচয় নানা সময়ে নিজ পিতা মাতা ও বন্ধুবান্ধবদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়াছিলেন; বুদ্ধ বাল্যে উদ্যানে বেড়াইতে যাইয়া বোধিদ্রুমতলে সমাধিস্থ হইয়া দেবতা ও মানবের নয়না-কর্ষণ করিয়াছিলেন; ঈশা বন্য পক্ষীদিগকে প্রেমে আকর্ষণপূর্ব্বক বাল্যে

অবতার-পুরুষদিগের আশৈশব ভাবতন্ময়ত্ব।

নিজ হস্তে খাওয়াইয়াছিলেন; শঙ্কর স্বীয় মাতাকে দিব্যশক্তি-প্রভাবে মুগ্ধ ও আশ্বস্ত করিয়া বাল্যেই সংসারত্যাগ করিয়াছিলেন; এবং চৈতন্য বাল্যেই দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া ঈশ্বরপ্রেমিক হেয় উপাদেয় সকল বস্তুর ভিতরেই ঈশ্বর-প্রকাশ দেখিতে পান, একথার আভাস দিয়াছিলেন। ঠাকুরের জীবনেও ঐরূপ ঘটনার অভাব নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপে কয়েকটির এখানে উল্লেখ করিতেছি। ঘটনাগুলি ঠাকুরের নিজ মুখে শুনিয়া আমরা বুঝিয়াছি, ভাবরাজ্যে প্রথম তন্ময় হওয়া তাঁহার অতি অল্প বয়সেই হইয়াছিল। ঠাকুর বলিতেন—"ওদেশে (কামারপুকুরে) ছেলেদের ছোট ছোট টেকোয় * করে মুড়ি খেতে দেয়। যাদের ঘরে টেকো নাই তারা কাপড়েই মুড়ি খায়। ছেলেরা কেউ টেকোয়, কেউ কাপড়ে মুড়ি নিয়ে খেতে খেতে মাঠে ঘাটে বেড়িয়ে বেড়ায়। সেটা জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাস হবে; আমার তখন ছয় কি সাত বছর বয়স। একদিন সকাল বেলা ঠেকোয় মুড়ি নিয়ে মাঠের আল্‌পথ দিয়ে খেতে খেতে যাচ্ছি। আকাশে একখানা সুন্দর জলভরা মেঘ উঠেছে—তাই দেখছি ও খাচ্ছি। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেঘখানা আকাশ প্রায় ছেয়ে ফেলেছে, এমন সময় এক ঝাঁক সাদা দুধের মত বক ঐ কাল মেঘের কোল দিয়ে উড়ে যেতে লাগ্‌লো। সে এমন এক বাহার হলো!—দেখতে দেখতে অপূর্ব্বভাবে তন্ময় হয়ে এমন একটা অবস্থা হলো যে, আর হুঁস্ রইলো না! পড়ে গেলুম—মুড়িগুলি আলের ধারে ছড়িয়ে গেল। কতক্ষণ ঐভাবে পড়েছিলাম, বল্‌তে পারি না, লোকে দেখতে পেয়ে ধরাধরি করে বাড়ী নিয়ে এসেছিল। সেই প্রথম ভাবে বেহুঁস্ হয়ে যাই।"

ঠাকুরের ছয় বৎসর বয়সে প্রথম ভাবাবেশের কথা।

* চুবড়ি।

ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুরের এক ক্রোশ আন্দাজ উত্তরে আনুড় নামে গ্রাম। আনুড়ের বিষলক্ষ্মী * জাগ্রতা দেবী। চতুঃপার্শ্বস্থ দূর দূরান্তরের গ্রাম হইতে গ্রামবাসিগণ নানা প্রকার কামনাপূরণের জন্য দেবীর উদ্দেশে পূজা মানত করে এবং অভীষ্টসিদ্ধি হইলে যথাকালে আসিয়া পূজা বলি প্রভৃতি দিয়া যায়। অবশ্য, আগন্তুক যাত্রীদিগের ভিতর স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক হয়, এবং রোগশান্তির কামনাই অন্যান্য কামনা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোককে এখানে আকৃষ্ট করে। দেবীর প্রথমাবির্ভাব ও আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধীয় গল্প ও গান করিতে করিতে সদ্বংশজাতা গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা দলবদ্ধ হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে প্রান্তর পার হইয়া দেবীদর্শনে আগমন করিতেছেন—এ দৃশ্য এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ঠাকুরের বাল্যকালে কামারপুকুর প্রভৃতি গ্রাম যে বহুলোকপূর্ণ এবং এখন অপেক্ষা অনেক অধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল তাহার নিদর্শন, জনশূন্য জঙ্গলপূর্ণ ভগ্ন ইষ্টকালয়, জীর্ণ পতিত দেবমন্দির ও রাসমঞ্চ প্রভৃতি দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়।

৮ বিশালাক্ষী দর্শন করিতে যাইয়া ঠাকুরের দ্বিতীয় ভাবাবেশের কথা।

---

* উক্ত দেবীর নাম বিষলক্ষ্মী বা বিশালাক্ষী তাহা স্থির করা কঠিন। প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থে মনসা দেবীর অন্য নাম বিষহরী দেখিতে পাওয়া যায়। বিষহরী শব্দটি বিষলক্ষ্মীতে পরিণত সহজেই হইতে পারে। আবার মনসা-মঙ্গলাদি গ্রন্থে মনসাদেবীর রূপ বর্ণনায় বিশালাক্ষী শব্দেরও প্রয়োগ আছে। অতএব মনসা দেবীই সম্ভবতঃ বিষলক্ষ্মী বা বিশালাক্ষী নামে অভিহিতা হইয়া এখানে লোকের পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিষলক্ষ্মী বা বিশালাক্ষী দেবীর পূজা রাঢ়ের অন্যত্র অনেক স্থলেও দেখিতে পাওয়া যায়। কামারপুকুর হইতে ঘাটাল আসিবার পথে একস্থলে আমরা উক্ত দেবীর একটি সুন্দর মন্দির দেখিয়াছিলাম। মন্দিরসংলগ্ন নাট্যমন্দির, পুষ্করিণী, বাগিচা প্রভৃতি দেখিয়া ধারণা হইয়াছিল, এখানে পূজার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

সেজন্য আমাদের অনুমান, আনুড়ের দেবীর নিকট তখন যাত্রিসংখ্যাও অনেক অধিক ছিল।

প্রান্তর মধ্যে শূন্য অশ্বথতলেই দেবীর অবস্থান, বর্ষাতপাদি হইতে রক্ষার জন্য কৃষকেরা সামান্য পর্ণাচ্ছাদন মাত্র বৎসর বৎসর করিয়া দেয়। ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দির যে এককালে বর্ত্তমান ছিল তাহার পরিচয় পার্শ্বের ভগ্নস্তূপে পাওয়া যায়। গ্রামবাসীদিগকে উক্ত মন্দিরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলে, দেবী স্বেচ্ছায় উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন! বলে—

গ্রামের রাখাল বালকগণ দেবীর প্রিয় সঙ্গী; প্রাতঃকাল হইতে তাহারা এখানে আসিয়া গরু ছাড়িয়া দিয়া বসিবে, গল্প গান করিবে, খেলা করিবে, বনফুল তুলিয়া তাঁহাকে সাজাইবে এবং দেবীর উদ্দেশে যাত্রী বা পথিকপ্রদত্ত মিষ্টান্ন ও পয়সা নিজেরা গ্রহণ করিয়া আনন্দ করিবে—এ সকল মিষ্ট উপদ্রব না হইলে তিনি থাকিতে পারেন না। এক সময়ে কোন গ্রামের এক ধনী ব্যক্তির অভীষ্ট পূরণ হওয়ায় সে ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেয় এবং দেবীকে উহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিতা করে। পুরোহিত সকাল সন্ধ্যা, নিত্য যেমন আসে, আসিয়া পূজা করিয়া মন্দিরদ্বার রুদ্ধ করিয়া যাইতে লাগিল এবং পূজার সময় ভিন্ন অন্য সময়ে, যে সকল দর্শনাভিলাষী আসিতে লাগিল তাহারা দ্বারের জাফ্‌রির রন্ধ্র মধ্য দিয়া দর্শনী প্রণামী মন্দিরের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যাইতে থাকিল। কাজেই কৃষাণ বালকদিগের আর পূর্ব্বের ন্যায় ঐ সকল পয়সা আত্মসাৎ করা ও মিষ্টান্নাদি ক্রয় করিয়া দেবীকে একবার দেখাইয়া ভোজন ও আনন্দ করার সুবিধা রহিল না। তাহারা ক্ষুণ্ণমনে মাকে জানাইল—মা মন্দিরে ঢুকিয়া আমাদের খাওয়া বন্ধ করিলি? তোর দৌলতে নিত্য লাড্ডু মোয়া খাইতুম, এখন আমাদের আর ঐ সকল কে খাইতে দিবে? সরল বাল

বালকদিগের ঐ অভিযোগ দেবী শুনিলেন এবং সেই রাত্রে মন্দির এমন ফাটিয়া গেল যে পরদিন ঠাকুর চাপা পড়িবার ভয়ে পুরোহিত শশব্যস্তে দেবীকে পুনবায় বাহিরে অম্বরতলে আনিয়া রাখিল। তদবধি যে কেহ পুনবায় মন্দির নির্ম্মাণের জন্য চেষ্টা করিয়াছে তাহাকেই দেবী স্বপ্নে বা অন্য নানা উপাযে জানাইয়াছেন, ঐ কর্ম্ম তাঁহাব অভিপ্রেত নয়। গ্রামবাসীবা বলে—তাহাদেব কাহাকেও কাহাকেও মা ভয দেখাইয়াও নিবস্ত কবিয়াছেন।—স্বপ্নে বলিয়াছেন, "আমি বাখালবালকদেব সঙ্গে মাঠেব মাঝে বেশ আছি; মন্দিবমধ্যে আমায আবদ্ধ কব্‌লে তোর সর্ব্বনাশ কব্‌বো—বংশে কাহাকেও জীবিত বাখ্‌বো না।"

ঠাকুবেব আট বৎসর বযস—এখনও উপনযন হয নাই। গ্রামের ভদ্রঘবেব অনেকগুলি স্ত্রীলোক এক দিন দলবদ্ধ হইবা পূর্ব্বোক্তরূপে ৺বিশালাক্ষী দেবীব মানত শোধ কবিতে মাঠ ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিলেন। ঠাকুবেব নিজ পবিবাবের দুই একজন স্ত্রীলোক এবং গ্রামেব জমিদার ধর্ম্মদাস লাহার বিধবা কন্যা প্রসন্ন ইঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। প্রসন্নের সরলতা, ধর্ম্মপ্রাণতা পবিত্রতা ও অমাযিকতা সম্বন্ধে ঠাকুবেব উচ্চ ধারণা ছিল। সকল বিষয প্রসন্নকে জিজ্ঞাসা কবিযা তাঁহাব পবামর্শ মত চলিতে ঠাকুর, মাতাঠাকুবাণীকে অনেকবার বলিযাছিলেন এবং প্রসন্নেব কথা সময়ে সমযে নিজ স্ত্রীভক্তদিগকেও বলিতেন। প্রসন্নও ঠাকুবকে বালককাল হইতে অকৃত্রিম স্নেহ করিতেন। এবং অনেক সময তাঁহাকে যথার্থ গদাধব বলিয়াই জ্ঞান করিতেন। সবলা স্ত্রীলোক গদাধরেব মুখে ঠাকুর দেবতার পুণ্য কথা এবং ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত শুনিয়া মোহিত হইয়া অনেকবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন—"হাঁ গদাই, তোকে সমযে সময়ে ঠাকুর বলে মনে হয় কেন বল্‌ দেখি? হাঁরে, সত্যি সত্যিই ঠাকুর মনে

হয়!" গদাই শুনিয়া মধুর হাসি হাসিতেন কিন্তু কিছুই বলিতেন না; অথবা অন্য পাঁচ কথা পাড়িয়া তাঁহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেন। প্রসন্ন সে সকল কথায় না ভুলিয়া গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিতেন—"তুই যাই বলিস্ তুই কিন্তু মানুষ নোস্।" প্রসন্ন ৺রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করিয়া নিজ হস্তে নিত্য সেবার আয়োজন করিয়া দিতেন। পাল পার্ব্বণে ঐ মন্দিরে যাত্রা গান হইত। প্রসন্ন কিন্তু উহার অল্পই শুনিতেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—"গদাইয়ের গান শুনে আর কোন গান মিঠে লাগেনি—গদাই কান খারাপ করে দিয়ে গিয়েছে।"—অবশ্য এ সকল অনেক পরের কথা।

স্ত্রীলোকেরা যাইতেছেন দেখিয়া বালক গদাই বলিয়া বসিলেন, 'আমিও যাইব।' বালকের কষ্ট হইবে ভাবিয়া স্ত্রীলোকেরা নানারূপে নিষেধ করিলেও কোন কথা না শুনিয়া গদাধর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। স্ত্রীলোক-দিগেরও তাহাতে আনন্দ ভিন্ন বিরক্তি হইল না। কারণ, সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত রঙ্গরসপ্রিয় বালক কাহার না মন হরণ করে? তাহার উপর এই অল্প বয়সে গদাইয়ের ঠাকুর দেবতার গান ছড়া সব কণ্ঠস্থ। পথে চলিতে চলিতে তাঁহাদিগের অনুরোধে তাহার দুই চারিটা সে বলিবেই বলিবে। আর ফিরিবার সময় তাহার ক্ষুধা পাইলেও ক্ষতি নাই, দেবীর প্রসাদী নৈবেদ্য দুগ্ধাদি ত তাঁহাদিগের সঙ্গেই থাকিবে, তবে আর কি? গদাইয়ের সঙ্গে যাওয়ায় বিরক্ত হইবার কি আছে বল। রমণীগণ ঐ প্রকার নানা কথা ভাবিয়া গদাইকে সঙ্গে লইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে পথ বাহিয়া চলিলেন এবং গদাইও তাঁহারা যেরূপ ভাবিয়াছিলেন, ঠাকুর দেবতার গল্প গান করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে চলিতে লাগিলেন।

কিন্তু বিশালাক্ষী দেবীর মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রান্তর পার হইবার পূর্ব্বেই এক অভাবনীয় ঘটনা উপস্থিত হইল। বালক গান করিতে করিতে সহসা থামিয়া গেল, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি অবশ আড়ষ্ট

হইয়া গেল, চক্ষে অবিরল জলধারা বহিতে লাগিল এবং 'কি অসুখ করিতেছে' বলিয়া তাঁহাদিগের বারম্বার সস্নেহ আহ্বানে সাড়া পর্য্যন্ত দিল না। পথ চলিতে অনভ্যস্ত, কোমল বালকের রৌদ্র লাগিয়া সর্দ্দি গর্ম্মি হইয়াছে ভাবিয়া রমণীগণ বিশেষ শঙ্কিতা হইলেন এবং সন্নিহিত পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া বালকের মস্তকে ও চক্ষে প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও বালকের কোনরূপ সংজ্ঞার উদয় না হওয়ায় তাঁহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এখন উপায়?—দেবীর মানত পূজাই বা কেমন করিয়া দেওয়া হয় এবং পরের বাছা গদাইকে বা ভালয় ভালয় কিরূপে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়, প্রান্তরে জনমানব নাই যে সাহায্য করে—এখন উপায়? স্ত্রীলোকেরা বিশেষ বিপন্না হইলেন এবং ঠাকুর দেবতার কথা ভুলিয়া বালককে ঘিরিয়া বসিয়া কখন ব্যজন, কখন জলসেক এবং কখন বা তাহার নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল এইরূপে গত হইলে প্রসন্নের প্রাণে সহসা উদয় হইল—বিশ্বাসী সরল বালকের উপর দেবীর ভর হয় নাই ত?—সরলপ্রাণ পবিত্র বালক ও স্ত্রীপুরুষদের উপরেই ত দেবদেবীর ভর হয়, শুনিয়াছি। প্রসন্ন সঙ্গী রমণীগণকে ঐকথা বলিলেন এবং এখন হইতে গদাইকে না ডাকিয়া একমনে ৺বিশালাক্ষীর নাম করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রসন্নের পুণ্যচারিত্র্যে তাঁহার উপর শ্রদ্ধা রমণীগণের পূর্ব্ব হইতেই ছিল, সুতরাং সহজেই ঐ কথায় বিশ্বাসিনী হইয়া এখন দেবীজ্ঞানে বালককেই সম্বোধন করিয়া বারম্বার বলিতে লাগিলেন—'মা বিশালাক্ষি প্রসন্না হও, মা রক্ষা কর, মা বিশালাক্ষি মুখ তুলে চাও, মা অকূলে কূল দাও।'

আশ্চর্য্য! রমণীগণ কয়েকবার ঐরূপে দেবীর নাম গ্রহণ করিতে না করিতেই গদাইয়ের মুখমণ্ডল মধুর হাস্যে রঞ্জিত হইয়া উঠিল এবং বালকের অল্প সল্প সংজ্ঞার লক্ষণ দেখা গেল! তখন আশ্বাসিতা হইয়া

তাঁহারা বালকশরীরে বাস্তবিকই দেবীর ভর হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও মাতৃসম্বোধনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। *

ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিয়া বালক প্রকৃতিস্থ হইল এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, ইতিপূর্ব্বের ঐরূপ অবস্থার জন্য তাহার শরীরে কোনরূপ অবসাদ বা দুর্ব্বলতা লক্ষিত হইল না। রমণীগণ তখন তাহাকে লইয়া ভক্তি-গদ্গদচিত্তে ৺দেবস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং যথাবিধি পূজা দিয়া গৃহে ফিরিয়া ঠাকুরের মাতার নিকট সকল কথা আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। তিনি তাহাতে ভীতা হইয়া গদাইয়ের কল্যাণে সেদিন কুল-দেবতা ৺রঘুবীরের বিশেষ পূজা দিলেন এবং ৺বিশালাক্ষীর উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া তাঁহারও বিশেষ পূজা অঙ্গীকার করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের আর একটি ঘটনা, বাল্যকাল হইতে তাঁহার উচ্চ ভাবভূমিতে মধ্যে মধ্যে আরূঢ় হওয়ার বিষয়ে বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করে। ঘটনাটি এইরূপ হইয়াছিল—

কামারপুকুরে ঠাকুরের পিত্রালয়ের দক্ষিণ পশ্চিমে কিয়দ্দূরে এক-ঘর সুবর্ণ-বণিক বাস করিত। পাইনরা যে, তখন বিশেষ শ্রীমান ছিল তৎপরিচয় তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত ইষ্টক-নির্ম্মিত শিবমন্দিরে এখনও পাওয়া যায়। ঐ পরিবারের দুই একজন মাত্র এখনও বাঁচিয়া আছে এবং ঘর দ্বার ভগ্ন ও ভূমিসাৎ হইয়াছে। গ্রামের লোকের নিকট শুনিতে পাওয়া যায় পাইনদের তখন বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ছিল, বাটীতে লোক ধরিত না এবং জমী জারাৎ, চাষ বাস, গরু লাঙ্গলও যেমন ছিল নিজেদের ব্যবসায়েও তেমনি বেশ দুপয়সা আয় ছিল। তবে পাইনরা গ্রামের জমিদারদের মত ধনাঢ্য ছিল না, মধ্যবিৎ গৃহস্থ-শ্রেণীভুক্ত ছিল।

* কেহ কেহ বলেন, এই সময়ে ভক্তির আতিশয্যে স্ত্রীলোকেরা বিশালাক্ষীর নিমিত্ত আনীত নৈবেদ্যাদিও বালককে ভোজন করিতে দিয়াছিলেন।

পাইনদের কর্ত্তা বিশেষ ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। সমর্থ হইলেও নিজের বসতবাটীটি ইষ্টকনির্ম্মিত করিতে প্রয়াস পান নাই, বরাবর মাঠ-কোটাতেই * বাস করিতেন ; দেবালয়টি কিন্তু ইষ্টক পোড়াইয়া বিশিষ্ট শিল্পী নিযুক্ত করিয়া সুন্দরভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কর্ত্তার নাম সীতানাথ ছিল। তাঁহার সাত পুত্র ও আট কন্যা ছিল, এবং বিবাহিতা হইলেও কন্যাগুলি, কি কারণে বলিতে পারি না, সর্ব্বদা পিত্রালয়েই বাস করিত। শুনিয়াছি, ঠাকুরের যখন দশ বার বৎসর বয়স তখন উহাদের সর্ব্বকনিষ্ঠা যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। কন্যাগুলি সকলেই রূপবতী ও দেবদ্বিজভক্তি-পরায়ণা ছিল এবং প্রতিবেশী বালক গদাইকে বিশেষ স্নেহ করিত। ঠাকুর বাল্যকালে অনেক সময় এই ধর্ম্মনিষ্ঠ পরিবারের ভিতর কাটাইতেন এবং পাইনদের বাটীতে তাঁহার উচ্চ ভাবভূমিতে উঠিয়া অনেক লীলার কথা এখনও গ্রামে শুনিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান ঘটনাটি কিন্তু আমরা ঠাকুরের নিকটেই শুনিয়াছিলাম।

শিবরাত্রিকালে শিব সাজিয়া ঠাকুরের তৃতীয় ভাবাবেশ।

কামারপুকুরে বিষ্ণুভক্তি ও শিবভক্তি পরস্পর দ্বেষাদ্বেষি না করিয়া বেশ পাশাপাশি চলিত বলিয়া বোধ হয়। এখনও শিবের গাজনের ন্যায় বৎসর বৎসর বিষ্ণুর চব্বিশপ্রহরী নাম-সংকীর্ত্তন সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। তবে শিবমন্দির ও শিবস্থানের সংখ্যা বিষ্ণু মন্দিরাপেক্ষা অধিক। সুবর্ণ বণিকদিগের ভিতর অনেকেই গোঁড়া বৈষ্ণব হইয়া থাকে ; নিত্যানন্দ প্রভুর উদ্ধারণ দত্তকে দীক্ষা দিয়া উদ্ধার করিবার পর হইতে ঐ জাতির ভিতর বৈষ্ণব মত বিশেষ প্রচলিত। কামারপুকুরের পাইনরা কিন্তু শিব ও বিষ্ণু উভয়েরই ভক্ত

* বাঁশ, কাট, খড় ও মৃত্তিকসহায়ে নির্ম্মিত দ্বিতল বাটীকে পল্লীগ্রামে "মাট-কোঠা" বলে। ইহাতে ইষ্টকের সম্পর্ক থাকে না।

ছিল। বৃদ্ধ কর্ত্তা পাইন, একদিকে যেমন ত্রিসন্ধ্যা হরিনাম করিতেন, অন্যদিকে তেমনি শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং প্রতি বৎসর শিবরাত্রি ব্রতপালন করিতেন। রাত্রিজাগরণে সহায়ক হইবে বলিয়া ব্রতকালে পাইনদের বাটীতে যাত্রাগানের বন্দোবস্ত হইত।

একবার ঐরূপে শিবরাত্রি ব্রতকালে পাইনদের বাটীতে যাত্রার বন্দোবস্ত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী গ্রামেরই দল, শিবমহিমাসূচক পালা গাহিবে, রাত্রি একদণ্ড পরে যাত্রা বসিবে। সন্ধ্যার সময় সংবাদ পাওয়া গেল যাত্রার দলে যে বালক শিব সাজিয়া থাকে, তাহার সহসা কঠিন পীড়া হইয়াছে, শিব সাজিবার লোক বহু সন্ধানেও পাওয়া যাইতেছে না, অধিকারী হতাশ হইয়া অদ্যকার নিমিত্ত যাত্রা বন্ধ রাখিতে মিনতি করিয়া পাঠাইয়াছেন। এখন উপায়? শিবরাত্রিতে রাত্রিজাগরণ কেমন করিয়া হয়? বৃদ্ধেরা পরামর্শ করিতে বসিলেন এবং অধিকারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, শিব সাজিবার লোক দিলে তিনি অদ্য রাত্রে যাত্রা করিতে পারিবেন কি না। উত্তর আসিল, শিব সাজিবার লোক পাইলে পারিব। গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ আবার পরামর্শ জুড়িল, শিব সাজিতে কাহাকে অনুরোধ করা যায়। স্থির হইল, গদাইয়ের বয়স অল্প হইলেও সে অনেক শিবের গান জানে এবং শিব সাজিলে তাহাকে দেখাইবেও ভাল, তাহাকেই বলা যাক্। তবে শিব সাজিয়া একটু আধটু কথাবার্ত্তা কহা, তাহা অধিকারী স্বয়ং কৌশলে চালাইয়া লইবে। গদাধরকে বলা হইল। সকলের আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঐ কার্য্যে সম্মত হইলেন। পূর্ব্বনির্দ্ধারিত কথামত রাত্রি একদণ্ড পরে যাত্রা বসিল।

গ্রামের জমীদার ধর্ম্মদাস লাহার, ঠাকুরের পিতার সহিত বিশেষ সৌহার্দ্দ থাকায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গয়াবিষ্ণু লাহা ও ঠাকুর উভয়ে 'স্যাঙাৎ' পাতাইয়াছিলেন। 'স্যাঙাৎ' শিব সাজিবেন জানিয়া গয়াবিষ্ণু

ও তাঁহার দলবল মিলিয়া ঠাকুরের অনুরূপ বেশভূষা করিয়া দিতে লাগিলেন। ঠাকুর শিব সাজিয়া সাজঘরে বসিয়া শিবের কথা ভাবিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার আসরে ডাক পড়িল এবং তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে জনৈক পথপ্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে আসরের দিকে লইয়া যাইতে উপস্থিত হইল। বন্ধুর আহ্বানে ঠাকুর উঠিলেন এবং কেমন উন্মনাভাবে কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া ধীরমন্থর গতিতে সভাস্থলে* উপস্থিত হইয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন ঠাকুরের সেই জটাজটিল বিভূতিমণ্ডিত বেশ, সেই ধীরস্থির পাদ-ক্ষেপ ও পরে অচল অটল অবস্থিতি, বিশেষতঃ সেই অপার্থিব অন্তর্মুখী নির্নিমেষ দৃষ্টি ও অধরকোণে ঈষৎ হাস্যরেখা দেখিয়া লোকে আনন্দে ও বিস্ময়ে মোহিত হইয়া পল্লীগ্রামের প্রথামত সহসা উচ্চরবে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল এবং রমণীগণের কেহ কেহ উলুধ্বনি এবং শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। অনন্তর সকলকে স্থির করিবার জন্য অধি-কারী ঐ গোলযোগের ভিতরেই শিবস্তুতি আরম্ভ করিলেন। তাহাতে শ্রোতারা কথঞ্চিৎ স্থির হইল বটে, কিন্তু পরস্পরে ইসারা ও গা ঠেলিয়া 'বাহবা' 'বাহবা', 'গদাইকে কি সুন্দর দেখাইতেছে, ছোঁড়া শিবের পালাটা এত সুন্দর কর্‌তে পার্‌বে তা কিন্তু ভাবিনি, ছোঁড়াকে বাগিয়ে নিয়ে আমাদের একটা যাত্রার দল কর্‌লে হয়', ইত্যাদি— নানা কথা অনুচ্চস্বরে চলিতে লাগিল। গদাধর কিন্তু তখনও সেই একই ভাবে দণ্ডায়মান, অধিকন্তু তাঁহার বক্ষ বহিয়া অবিরত নয়নাশ্রু পতিত হইতেছে! এইরূপে কিছুক্ষণ অতীত হইলে গদাধর তখনও স্থান পরিবর্ত্তন বা বলা কহা কিছুই করিতেছেন না দেখিয়া অধিকারী ও পল্লীর বৃদ্ধ দুই জন বালকের নিকটে গিয়া দেখেন তাহার হস্ত পদ অসাড়—বালক সম্পূর্ণ সংজ্ঞাশূন্য! তখন গোলমাল দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। কেহ বলিল—জল, চোখে মুখে জল দাও; কেহ বলিল—

বাতাস কর; কেহ বলিল—শিবের ভর হয়েচে, নাম কর; আবার কেহ বলিল—ছোঁড়াটা রসভঙ্গ কর্‌লে, যাত্রাটা আর শোনা হোলো না দেখ্‌চি! যাহা হউক, বালকের কিছুতেই সংজ্ঞা হইতেছে না দেখিয়া যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল এবং গদাধরকে কাঁধে লইয়া কয়েক জন কোনরূপে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিল। শুনিয়াছি, সে রাত্রে গদাধরের সে ভাব বহু প্রযত্নেও ভঙ্গ হয় নাই, এবং বাড়ীতে কান্নাকাটি উঠিয়াছিল। পরে সূর্য্যোদয় হইলে তিনি আবার প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। *

---

* কেহ কেহ বলেন, তিনি তিন দিন সমভাবে ঐ অবস্থায় ছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

সাধকভাবের প্রথম বিকাশ।

ভাবতন্ময়তা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলি ভিন্ন আরও অনেক কথা ঠাকুরের বাল্যজীবনে শুনিতে পাওয়া যায়। ছোট খাট অনেক বিষয়ে তাঁহার মনের ঐরূপ স্বভাবের পরিচয় আমরা সময়ে সময়ে পাইয়া থাকি।

ঠাকুরের বাল্যজীবনে ভাবতন্ময়তার পরিচায়ক অন্যান্য দৃষ্টান্ত।

যেমন—গ্রামের কুম্ভকার শিবদুর্গাদি দেবদেবীর প্রতিমা গড়িতেছে, বয়স্যবর্গের সহিত যথা ইচ্ছা বেড়াইতে বেড়াইতে ঠাকুর তথায় আগমন করিয়া মূর্ত্তিগুলি দেখিতে দেখিতে সহসা বলিলেন, 'এ কি হইয়াছে? দেব-চক্ষু কি এইরূপ হয়? এই ভাবে আঁকিতে হয়'—বলিয়া যে ভাবে টান দিয়া অঙ্কিত করিলে চক্ষে অমানব শক্তি, করুণা, অন্তর্মুখীনতা ও আনন্দের একত্র সমাবেশ হইয়া মূর্ত্তিগুলিকে জীবন্ত দেবভাবসম্পন্ন করিয়া তুলিবে, তাহাকে তদ্বিষয় বুঝাইয়া দিলেন! বালক গদাধর কখনও শিক্ষালাভ না করিয়া কেমন করিয়া ঐ কথা বুঝিতে ও বুঝাইতে সক্ষম হইল, সকলে অবাক হইয়া তাহা ভাবিতে থাকিল এবং ঐ বিষয়ের কারণ খুঁজিয়া পাইল না!

যেমন—ক্রীড়াচ্ছলে বয়স্যদিগের সহিত কোন দেববিশেষের পূজা করিবার সঙ্কল্প করিয়া ঠাকুর স্বহস্তে ঐ মূর্ত্তি এমন সুন্দরভাবে গড়িলেন বা আঁকিলেন যে লোকে দেখিয়া উহা দক্ষ কুম্ভকার বা পটুয়ার কার্য্য বলিয়া স্থির করিল।

যেমন—অযাচিত অতর্কিতভাবে কোন ব্যক্তিকে এমন কোন কথা বলিলেন, যাহাতে তাহার মনোগত বহুকালের সন্দেহজাল

মিটিয়া যাইয়া সে তাহার ভাবী জীবন নিয়মিত করিবার বিশেষ সন্ধান ও শক্তি লাভপূর্ব্বক স্তম্ভিতহৃদয়ে ভাবিতে লাগিল, বালক গদাইকে আশ্রয় করিয়া তাহার আরাধ্য দেবতা কি করুণায় তাহাকে ঐরূপে পথ দেখাইলেন!

যেমন—শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা যে প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিতে-ছেন না বালক গদাই তাহা এক কথায় মিটাইয়া দিয়া সকলকে চমৎকৃত করিলেন। *

ঠাকুরের জীবনের ঐ সকল ঘটনার ছয় প্রকার শ্রেণীর নির্দ্দেশ।

ঠাকুরের বাল্যজীবন সম্বন্ধে ঐরূপ যে সকল অদ্ভুত ঘটনা আমরা শুনিয়াছি তাহার সকলগুলিই যে তাঁহার উচ্চ ভাবভূমিতে আরোহণ করিয়া দিব্যশক্তি প্রকাশের পরিচায়ক; তাহা নহে। উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি ঐরূপ হইলেও অপর সকলগুলিকে আমরা সাধারণতঃ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। উহাদিগের কতকগুলি তাঁহার অদ্ভুত স্মৃতির, কতকগুলি প্রবল বিচারবুদ্ধির, কতকগুলি বিশেষ নিষ্ঠা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার, কতকগুলি অসীম সাহসের, কতকগুলি রঙ্গরসপ্রিয়তার, এবং কতকগুলি অপার প্রেম বা করুণার পরিচায়ক। পূর্ব্বোক্ত সকল শ্রেণীর সকল ঘটনাবলীর ভিতরেই কিন্তু তাঁহার মনের অসাধারণ বিশ্বাস, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। দেখা যায়, বিশ্বাস, পবিত্রতা ও স্বার্থ-হীনতারূপ উপাদানে তাঁহার মন যেন স্বভাবতঃ নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং সংসারের নানা ঘাতপ্রতিঘাত উহাতে স্মৃতি, বুদ্ধি, প্রতিজ্ঞা, সাহস, রঙ্গরস, প্রেম বা করুণারূপ আকারে তরঙ্গসমূহের উদয় করি-তেছে। কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদিগের কথা সম্যক্‌রূপে ধারণা করিতে পারিবেন।

* গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ—৫ম অধ্যায়, ১৩৭ পৃষ্ঠা দেখ।

পল্লীতে রাম বা কৃষ্ণযাত্রা হইয়াছে, অন্যান্য লোকের সহিত বালক গদাধরও তাহা শুনিয়াছে ; ঐসকল পবিত্র পুরাণকথা ও গানের বিষয় ভুলিয়া পরদিন যে যাহার স্বার্থচেষ্টায় লাগিয়াছে, কিন্তু বালক গদাইয়ের মনে উহা যে ভাবতরঙ্গ তুলিয়াছে তাহার বিরাম নাই ; বালক ঐ সকলের পুনরাবৃত্তি করিয়া আনন্দোপভোগের জন্য বয়স্যবর্গকে সমীপস্থ আম্রকাননে একত্র করিয়াছে এবং উহাদিগের প্রত্যেককে পালার ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের ভূমিকা যথাসম্ভব আয়ত্ত করাইয়া ও আপনি প্রধান চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া উহার অভিনয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে ! সরল কৃষাণ পার্শ্বের ভূমিতে চাষ দিতে দিতে বালকদিগের ঐরূপ ক্রীড়াদর্শনে মুগ্ধহৃদয়ে ভাবিতেছে একবার মাত্র শুনিয়া পালাটির প্রায় সমগ্র কথা ও গানগুলি উহারা এরূপে আয়ত্ত করিল কিরূপে ?

অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির দৃষ্টান্ত।

উপনয়নকালে বালক, আত্মীয়স্বজন এবং সমাজপ্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে ধরিয়া বসিল, কর্ম্মকারজাতীয়া ধনী নাম্নী কামিনীকে ভিক্ষামাতাস্বরূপে বরণ করিবে ! * অথবা, ধনীর স্নেহ ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া এবং তাহার হৃদয়ের অভিলাষ জানিতে পারিয়া বালক সামাজিক শাসনের কথা ভুলিয়া ঐ নীচ জাতীয় রমণীর স্বহস্ত-পক্ক ব্যঞ্জনাদি কাড়িয়া খাইল !—ধনীর ভীতিপ্রসূত সাগ্রহ নিষেধ বালককে ঐ কার্য্য হইতে বিরত করিতে পারিল না।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞার দৃষ্টান্ত।

বিভূতিমণ্ডিত জটাধারী নাগা ফকীর দেখিলে সহর বা পল্লীগ্রামের বালকদিগের হৃদয়ে সর্ব্বদা ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে। ঐরূপ ফকীরেরা অল্পবয়স্ক বালকদিগকে নানারূপে ভুলাইয়া অথবা সুযোগ পাইলে বলপ্রয়োগে

অসীম সাহসের দৃষ্টান্ত।

---

* গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ—৪র্থ অধ্যায়, ১৪০ পৃষ্ঠা দেখ।

দূরদেশে লইয়া যাইয়া দলপুষ্টি করে, এরূপ কিংবদন্তী বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচলিত। কামারপুকুরের দক্ষিণ প্রান্তে ৺পুরীধামে যাইবার যে পথ আছে সেই পথ দিয়া তখন তখন নিত্য ঐরূপ সাধু-ফকীর, বৈরাগী-বাবাজীর দল যাওয়া আসা করিত এবং গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা আহার্য্য সংগ্রহপূর্ব্বক দুই এক দিন বিশ্রাম করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইত। কিংবদন্তীতে ভীত হইয়া বয়স্যগণ দূরে পলাইলেও বালক গদাই ভীত হইবার পাত্র ছিল না। ফকীরের দল দেখিলেই সে তাহাদিগের সহিত মিশিয়া মধুরালাপ ও সেবায় তাহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া তাহাদের আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিবার জন্য অনেক কাল তাহাদের সঙ্গে কাটাইত। কোন কোন দিন দেবোদ্দেশ্যে নিবেদিত তাহাদিগের অন্ন খাইয়াও বালক বাটীতে ফিরিত এবং মাতার নিকট ঐ বিষয়ে গল্প করিত। তাহাদিগের ন্যায় বেশধারণের জন্য বালক একদিন সর্ব্বাঙ্গে তিলকচিহ্ন এবং পিতা-মাতা-প্রদত্ত নূতন বসনখানি ছিঁড়িয়া কৌপীন ও বহির্ব্বাসরূপে ধারণপূর্ব্বক জননীর নিকট আগমন করিয়াছিল!

রসবঙ্গপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত।

গ্রামের নীচ জাতিদের ভিতর অনেকে রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিতে জানিত না। ঐ সকল গ্রন্থ শুনিবার ইচ্ছা হইলে তাহারা পড়িয়া বুঝাইয়া দিতে পারে এমন কোন ব্রাহ্মণ বা স্বশ্রেণীর লোককে আহ্বান করিত এবং ঐ ব্যক্তি আগমন করিলে ভক্তিপূর্ব্বক পদ ধৌত করিবার জল, নূতন হুঁকায় তামাকু এবং উপবেশন করিয়া পাঠ করিবার জন্য উত্তম আসন বা তদভাবে নূতন একখানি মাদুর প্রদান করিত। ঐরূপে সম্মানিত হইয়া সে ব্যক্তি ঐকালে অহঙ্কার অভিমানে স্ফীত হইয়া শ্রোতাদিগের নিকটে কিরূপ উচ্চাসন গ্রহণ করিত এবং কত প্রকার

বিসদৃশ অঙ্গভঙ্গী ও সুরে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে তাহাদিগকে আপন প্রাধান্য জ্ঞাপন করিত, তীক্ষ্ণবিচারসম্পন্ন রঙ্গরসপ্রিয় বালক তাহা লক্ষ্য করিত এবং সময়ে সময়ে অপরের নিকট গম্ভীর ভাবে উহার অভিনয় করিয়া হাস্যকৌতুকের রোল ছুটাইয়া দিত।

ঠাকুরের মনের স্বাভাবিক গঠন।

ঠাকুরের বাল্যজীবনের ঐ সকল কথার আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারি, তিনি কিরূপ মন লইয়া সাধনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। বুঝিতে পারি যে ঐরূপ মন যাহা ধরিবে তাহা করিবেই করিবে, যাহা শুনিবে তাহা কখনও ভুলিবে না এবং অভীষ্টলাভের পথে যাহা অন্তরায় বলিয়া বুঝিবে সবলহস্তে তাহা তৎক্ষণাৎ দূরে নিক্ষেপ করিবে। বুঝিতে পারি যে, ঐরূপ হৃদয় ঈশ্বরের উপর, আপনার উপর এবং মানবসাধারণের অন্তর্নিহিত দেবপ্রকৃতির উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সংসারের সকল কার্য্যে অগ্রসর হইবে, নীচ অপবিত্র ভাবসমূহ ত দূরের কথা—সঙ্কীর্ণতার স্বল্পমাত্র গন্ধও যে সকল ভাবে অনুভূত হইবে কখনই তাহাকে উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না, এবং পবিত্রতা, প্রেম ও করুণাই কেবল উহাকে সর্ব্বকাল সর্ব্ববিষয়ে নিয়মিত করিবে। ঐ সঙ্গে একথাও হৃদয়ঙ্গম হয় যে, আপনার বা অন্যের অন্তরের কোন ভাবই আপন আকার লুক্কায়িত রাখিয়া ছদ্মবেশে ঐরূপ হৃদয়মনকে কখনও প্রতারিত করিতে পারিবে না। ঠাকুরের অন্তরসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিয়া অগ্রসর হইলে তবেই আমরা তাঁহার সাধকজীবনের অলৌকিকত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব।

ঠাকুরের জীবনে সাধকভাবের প্রথম বিশেষ বিকাশ আমরা দেখিতে পাই, তিনি যখন কলিকাতায় তাঁহার ভ্রাতার চতুষ্পাঠীতে

—যেদিন বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগী হইবার জন্য অগ্রজ রামকুমারের তিরস্কার ও অনুযোগের উত্তরে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন—"চালকলা-বাঁধা বিদ্যা আমি শিখিতে চাহি না; আমি এমন বিদ্যা শিখিতে চাহি যাহাতে জ্ঞানের উদয় হইয়া মানুষ বাস্তবিক কৃতার্থ হয়!" তাঁহার বয়স তখন সতর বৎসর হইবে এবং গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁহার শিক্ষা অগ্রসর হইবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া অভিভাবকেরা তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া রাখিয়াছেন।

সাধকভাবের প্রথম প্রকাশ—'চাল কলা বাঁধা বিদ্যা শিখিব না, যাহাতে যথার্থ জ্ঞান হয়, সেই বিদ্যা শিখিব।'

ঝামাপুকুরের ৺দিগম্বর মিত্রের বাটির সমীপে জ্যোতিষ এবং স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ অগ্রজ টোল খুলিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেছিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত মিত্র-পরিবার ভিন্ন পল্লীর অপর কয়েকটি বর্দ্ধিষ্ণু ঘরে নিত্য দেবসেবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক ছাত্রগণকে পাঠ দান করিতেই তাঁহার প্রায় সমস্ত সময় অতিবাহিত হইত, সুতরাং অপরের গৃহে প্রত্যহ দুইসন্ধ্যা গমনপূর্ব্বক দেবসেবা যথারীতি সম্পন্ন করা স্বল্পকালেই তাঁহার পক্ষে বিষম ভার হইয়া উঠিয়াছিল। অথচ সহসা তিনি উহা ত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন না। কারণ, বিদায় আদায়ে টোলের যাহা উপলব্ধ হইত তাহা অল্প, এবং দিন দিন হ্রাস ভিন্ন উহার বৃদ্ধি হইতেছিল না; এরূপ অবস্থায় দেব-সেবার পারিশ্রমিকস্বরূপে যাহা পাইতেছিলেন তাহা ত্যাগ করিলে সংসার চলিবে কিরূপে? পরিশেষে নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আনাইয়া তাহার উপর উক্ত দেবসেবার ভার অর্পণ পূর্ব্বক তিনি অধ্যাপনাতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় ঝামাপুকুরের রামকুমারের টোলে বাসকালে ঠাকুরের আচরণ।

গদাধর এখানে আসিয়া অবধি নিজ মনোমত কর্ম্ম পাইয়া উহা সানন্দে সম্পাদনপূর্ব্বক অগ্রজের সেবা ও তাঁহার নিকটে কিছু কিছু পাঠাভ্যাস করিতেন। গুণসম্পন্ন প্রিয়দর্শন বালক অল্পকালেই যজমান-পরিবারবর্গের সকলের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। কামারপুকুরের ন্যায় এখানেও ঐ সকল সম্ভ্রান্ত পরিবারের রমণীগণ তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা, সরল ব্যবহার, মিষ্টালাপ এবং দেবভক্তি দর্শনে তাঁহার নিকট নিঃসঙ্কোচে আগমন করিতেন এবং তাঁহার দ্বারা ছোট খাট 'ফাই-ফরমাস' করাইয়া লইতে এবং তাঁহার মধুর কণ্ঠের ভজন শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। এইরূপে কামারপুকুরের ন্যায় এখানেও বালকের একটি আপনার দল বিনা চেষ্টায় হইয়া উঠিয়াছিল এবং বালকও অবসর পাইলেই ঐ সকল স্ত্রীপুরুষদিগের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দে দিন কাটাইতেছিলেন। সুতরাং এখানে আসিয়াও বালকের বিদ্যাশিক্ষার যে বড় একটা সুবিধা হইতেছিল না, একথা বুঝিতে পারা যায়।

পূর্ব্বোক্ত বিষয় লক্ষ্য করিয়াও রামকুমার ভ্রাতাকে সহসা কিছু বলিতে পারেন নাই। কারণ, একে ত মাতার প্রিয় কনিষ্ঠকে তাঁহার স্নেহসুখে বঞ্চিত করিয়া এক প্রকার নিজের সুবিধার জন্যই দূরে আনিয়াছেন, তাহার উপর ভ্রাতার গুণে আকৃষ্ট হইয়া লোকে তাহাকে আগ্রহপূর্ব্বক বাটীতে আহ্বান ও নিমন্ত্রণাদি করিতেছে, এই অবস্থায় যাইতে নিষেধ করিয়া বালকের আনন্দে বিঘ্নোৎপাদন করা কি যুক্তিযুক্ত? ঐরূপ করিলে বালকের কলিকাতাবাস কি বনবাসতুল্য অসহ্য হইয়া উঠিবে না? সংসারে অভাব না থাকিলে বালককে মাতার নিকট হইতে দূরে আনিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কামারপুকুরের নিকটবর্ত্তী গ্রামান্তরে কোন মহোপাধ্যায়ের নিকটে পড়িতে পাঠাইলেই চলিত। বালক তাহাতে মাতার নিকটে থাকিয়াই

বিদ্যাভ্যাস করিতে পারিত। ঐরূপ চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া রামকুমার কয়েক মাস কোন কথা না বলিলেও পরিশেষে কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রেরণায় একদিন বালককে পাঠে মনোযোগী হইবার জন্য মৃদু তিরস্কার করিলেন। কারণ সরল, সর্ব্বদা আত্মহারা বালককে পরে ত সংসারে প্রবিষ্ট হইতে হইবে? এখন হইতে যদি সে আপনার সাংসারিক অবস্থার যাহাতে উন্নতি হয় এমন পথে আপনাকে নিয়মিত করিয়া চলিতে না শিখে তবে ভবিষ্যতে কি আর ঐরূপ করিতে পারিবে? অতএব ভ্রাতৃবাৎসল্য এবং সংসারের অভিজ্ঞতা উভয়ই রামকুমারকে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল।

কিন্তু স্নেহপরবশ রামকুমার সংসারের স্বার্থপর কঠোর প্রথায় ঠেকিয়া শিখিয়া কতকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিলেও নিজ কনিষ্ঠের অদ্ভুত মানসিক গঠনসম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন না। বালক যে এই অল্প বয়সেই সংসারী মানবের সর্ব্ববিধ চেষ্টার এবং আজীবন পরিশ্রমের কারণ ধরিতে পারিয়াছে, এবং দুই দিনের প্রতিষ্ঠা ও ভোগসুখলাভকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া মানবজীবনে অন্য উদ্দেশ্য নির্দ্ধারিত করিয়াছে, একথা তিনি স্বপ্নেও হৃদয়ে আনয়ন করিতে পারেন নাই। সুতরাং তিরস্কারে বিচলিত না হইয়া সরল বালক যখন তাঁহাকে প্রাণের কথা পূর্ব্বোক্তরূপে খুলিয়া বলিল তখন তিনি বালকের কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, মাতাপিতার বহু আদরের বালক, জীবনে এই প্রথম তিরস্কৃত হইয়া অভিমান বা বিরক্তিতে ঐরূপ উত্তর প্রদান করিতেছে। সত্যনিষ্ঠ বালক তাঁহাকে আপন অন্তরের কথা বুঝাইতে সে দিন অনেক চেষ্টা পাইল, অর্থকরী বিদ্যা শিখিতে তাহার প্রবৃত্তি হইতেছে না একথা নানাভাবে প্রকাশ করিল, কিন্তু বালকের সে কথা শুনে কে?

নিজ ভ্রাতার মানসিক প্রকৃতি সম্বন্ধে রামকুমারের অনভিজ্ঞতা।

বালক ত বালক, বয়োবৃদ্ধ কাহাকেও যদি কোন দিন আমরা স্বার্থচেষ্টায় পরাঙ্মুখ দেখি তবে সিদ্ধান্ত করিয়া বসি—তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে!

বালকের ঐ সকল কথা রামকুমার সে দিন বুঝিলেন না। অধিকন্তু ভালবাসার পাত্রকে তিরস্কার করিয়া পরক্ষণে আমরা যেমন অনুতপ্ত হই এবং তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে আদর যত্ন করিয়া স্বয়ং শান্তিলাভ করিতে চেষ্টা করি, কনিষ্ঠের প্রতি তাঁহার প্রতিকার্য্যে ব্যবহার এখন কিছুকাল ঐরূপ হইয়া উঠিল। বালক গদাধর কিন্তু নিজ মনোগত অভিপ্রায় সফল করিবার জন্য এখন হইতে যে অবসর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এ বিষয়ের পরিচয় আমরা তাঁহার পর পর কার্য্য দেখিয়া বিশেষরূপে পাইয়া থাকি।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরের দুই বৎসরে ঠাকুর এবং তাঁহার অগ্রজের জীবনে পরিবর্ত্তনের প্রবাহ কিছু প্রবলভাবে চলিয়াছিল। অগ্রজের আর্থিক অবস্থা দিন দিন অবসন্ন হইতেছিল, এবং নানা ভাবে চেষ্টা করিলেও তিনি কিছুতেই ঐ বিষয়ের উন্নতি সাধন করিতে পারিতেছিলেন না। টোল বন্ধ করিয়া অপর কোন কার্য্য স্বীকার করিবেন কি না তদ্বিষয়ে নানা তোলাপাড়াও তাঁহার মনোমধ্যে চলিতেছিল। কিন্তু কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। তবে একথা মনে মনে বেশ বুঝিতেছিলেন যে, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের অন্য উপায় শীঘ্র গ্রহণ না করিয়া এরূপে দিন কাটাইলে পরিশেষে ঋণগ্রস্ত হইয়া নানা অনর্থ উপস্থিত হইবে। কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিবেন? যজন, যাজন ও অধ্যাপন ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যই ত শিখেন নাই, এবং চেষ্টা করিয়া এখন যে সময়োপযোগী কোন অর্থকরী বিদ্যা শিখিবেন সে উদ্যম উৎসাহই বা প্রাণে কোথায়? আবার, ঐরূপ শিক্ষা

রামকুমারের সাংসারিক অবস্থা।

লাভ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের পথে অগ্রসর হইলে নিজ নিত্যক্রিয়া ও পূজাদি সম্পন্ন করিবার অবসর লাভ যে কঠিন হইবে, ইহাও নিশ্চয়। সামান্যে সন্তুষ্ট সাধুপ্রকৃতি রামকুমার বৈষয়িক ব্যাপারে বিশেষ উদ্যমী পুরুষ ছিলেন না। সুতরাং "যাহা করেন ৺রঘুবীর" ভাবিয়া পূর্ব্বোক্ত চিন্তা হইতে মনকে ফিরাইয়া যাহা এত কাল করিয়া আসিয়াছেন তাহাই ভগ্নহৃদয়ে করিয়া যাইতেছিলেন। সে যাহা হউক, ঐরূপ নিশ্চয়তার মধ্যে একটি ঘটনা ঈশ্বরেচ্ছায় রামকুমারকে পথ দেখাইয়া শীঘ্রই নিশ্চিন্ত করিয়াছিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী।

সন ১২৫৬ সালে রামকুমার যখন কলিকাতায় চতুষ্পাঠী খুলিয়াছিলেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম সম্ভবতঃ ৪৫ বৎসর ছিল। সংসারের অভাব অনাটন ঐ কালের কিছু পূর্ব্ব হইতে তাঁহাকে চিন্তিত করিয়াছিল এবং তাঁহাব পত্নী একমাত্র পুত্র অক্ষয়কে প্রসবান্তে তখন মৃত্যুমুখে পতিতা হইযাছিলেন। কথিত আছে, সাধক রামকুমার তাঁহার পত্নীব মৃত্যুব কথা পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন এবং পরিবারস্থ কাহাকে কাহাকে বলিয়াছিলেন, 'ও (তাঁহাব পত্নী) এবার আর বাঁচিবে না।' ঠাকুর তখন চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন।

রামকুমারের কলিকাতায় টোল খুলিবার কারণ ও সময় নিরূপণ।

সমৃদ্ধিশালী কলিকাতায় নানা ধনী ও মধ্যবিৎ শ্রেণী লোকেব বাস; শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি ক্রিয়াকলাপে, বিবিধ ব্যবস্থাপত্রদানে এবং টোলের ছাত্রদিগকে বিদ্যালাভে পারদর্শী কবিয়া সেখানে সুপণ্ডিত বলিযা একবার খ্যাতি লাভ কবিতে পারিলে সংসারের আয়ব্যযের জন্য তাঁহাকে আর চিন্তান্বিত হইতে হইবে না, বোধ হয় এইরূপ একটা কিছু ভাবিযা বামকুমার কলিকাতায আসিয়াছিলেন। পত্নী-বিয়োগে তিনি জীবনে যে বিশেষ পরিবর্ত্তন ও অভাব অনুভব কবিতেছিলেন, বিদেশে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে তাহার হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করিবেন এই ধারণাও তাঁহাকে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল। যাহা হউক, কামাপুকুরের চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হইবাব আন্দাজ তিনি চারি বৎসর পরে তিনি ঠাকুরকে

যেজন্ত কলিকাতায় আনয়ন করিয়াছিলেন এবং ১২৫৯ সালে কলিকাতায় আসিয়া ঠাকুর যে ভাবে তিন বৎসর কাল অতিবাহিত করেন তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠককে বলিয়াছি। ঠাকুরের জীবনের ঘটনাবলী জানিতে হইলে অতঃপর আমাদিগকে অন্যত্র দৃষ্টি করিতে হইবে। বিদায় আদায়ের সুবিধার জন্য ছাতুবাবুর দলভুক্ত হইয়া তাঁহার অগ্রজ যখন নিজ চতুষ্পাঠীর শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নপর ছিলেন, তখন কলিকাতার অন্যত্র একস্থলে এক সুবিখ্যাত পরিবারমধ্যে ঈশ্বরেচ্ছায় যে ঘটনাপরম্পরার উদয় হইতেছিল তাহাতেই এখন পাঠককে মনোনিবেশ করিতে হইবে।

রাণী রাসমণি।

কলিকাতার দক্ষিণাংশে জানবাজার নামক পল্লীতে প্রথিতকীর্ত্তি রাণী রাসমণির বাস ছিল। ক্রমশঃ চারিটী কন্যার মাতা হইয়া রাণী চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন; এবং তদবধি স্বামী ৺রাজচন্দ্র দাসের প্রভূত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে স্বয়ং নিযুক্তা থাকিয়া উহার সমধিক শ্রীবৃদ্ধিসাধনপূর্ব্বক তিনি স্বল্পকাল মধ্যেই কলিকাতাবাসিগণের নিকটে সুপরিচিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। কেবলমাত্র বিষয়কর্ম্মের পরিচালনায় দক্ষতা দেখাইয়া তিনি যশস্বিনী হয়েন নাই, কিন্তু তাঁহার ঈশ্বরবিশ্বাস, ওজস্বিতা * এবং দরিদ্রদিগের সহিত

---

* শুনা যায়, রাণী রাসমণির জানবাজারের বাটীর নিকট পূর্ব্বে ইংরাজ সৈনিকদিগের একটী ব্যারাক্ বা আড্ডা তখন প্রতিষ্ঠিত ছিল। মদ্যপানে উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকেরা একদিন রাণীর দ্বাররক্ষকদিগকে বলপ্রয়োগে বশীভূত করিয়া বাটীমধ্যে প্রবেশ ও লুটপাট করিতে আরম্ভ করে। রাণীর জামাতা মথুরবাবু প্রমুখ পুরুষেরা তখন কার্য্যান্তরে বাহিরে গিয়াছিলেন। সৈনিকেরা বাধা না পাইয়া ক্রমে অন্দরে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া রাণী স্বয়ং অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিতা হইয়া তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন

নিরন্তর সহানুভূতি,* তাঁহার অজস্র দান, অকাতর অন্নব্যয় প্রভৃতি অনুষ্ঠানসমূহ তাঁহাকে সকলের বিশেষ প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল।

* কথিত আছে, গঙ্গায় মৎস্য ধরিবার জন্য ধীবরদিগের উপর ইংরাজ রাজসরকার একবার কর বসাইয়াছিলেন। ঐ সকল ধীবরদিগের অনেকে রাণীর জমিদারীতে বাস করিত। করের দায়ে উৎপীড়িত হইয়া তাহারা রাণীর নিকট আপনাদের দুঃখ কষ্টের কথা নিবেদন করে। রাণী শুনিয়া তাহাদিগকে অভয় দিলেন ও বহু অর্থ দিয়া সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে গঙ্গায় মৎস্য ধরিবার ইজারা লইলেন। সরকার বাহাদুর রাণী মৎস্য-ব্যবসায় করিবেন ভাবিয়া উক্ত অধিকার প্রদান করিবামাত্র গঙ্গার কয়েক স্থল এক কূল হইতে অন্য কূল পর্য্যন্ত রাণী এমন শৃঙ্খলিত করিলেন যে, ইংরাজরাজের জলযানসমূহের নদীমধ্যে প্রবেশপথ প্রায় বন্ধ হইয়া যাইল। তাঁহারা তখন রাণীর ঐ কার্য্যের প্রতিবাদ করিলে রাণী বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি অনেক অর্থব্যয়ে নদীতে মৎস্য ধরিবার অধিকার আপনাদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি, সেই অধিকারসূত্রেই ঐরূপ করিয়াছি। ঐরূপ করিবার কারণ, নদী মধ্য দিয়া জলযানাদি নিরন্তর গমনাগমন করিলে মৎস্যসকল অন্যত্র পলায়ন করিবে এবং আমার সমূহ ক্ষতি হইবে, অতএব নদীগর্ভ শৃঙ্খলমুক্ত কেমন করিয়া করিব? তবে যদি আপনারা নদীতে মৎস্য ধরিবার নূতন কর উঠাইয়া দিতে রাজী হন তবে আমিও আমার অধিকারস্বত্ব স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে স্বীকৃতা আছি। নতুবা ঐ বিষয় লইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে এবং সরকার বাহাদুরকে আমার ক্ষতিপূরণে বাধ্য হইতে হইবে।" শুনা যায়, রাণীর ঐরূপ যুক্তিযুক্ত কথায় এবং গরীব ধীবরদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই রাণী ঐরূপ করিতেছেন একথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সরকার বাহাদুর ঐ কর অল্প দিন বাদেই উঠাইয়া দেন এবং ধীবরেরা পূর্ব্বের ন্যায় নদীতে বিনা করে যথা ইচ্ছা মৎস্য ধরিয়া রাণীকে আশীর্ব্বাদ করিতে থাকে।

লোকহিতকর কার্য্যে রাণী রাসমণির উৎসাহ সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হইত। "সোণাই, বেলেঘাটা ও ভবানিপুরে বাজার; কালীঘাটে ঘাট ও মুমূর্ষু নিবাস, হালিসহরে জাহ্নবী-তীরে ঘাট, সুবর্ণরেখার অপর তীর হইতে কিছু দূর পর্য্যন্ত শ্রীক্ষেত্রের রাস্তা প্রভৃতিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। গঙ্গাসাগর, ত্রিবেণী, নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ ও পুরিতে তীর্থযাত্রা করিয়া রাসমণি দেবোদ্দেশে প্রচুর অর্থব্যয় করেন।" তদ্ভিন্ন মকিমপুর

বাস্তবিক নিজ গুণ ও কর্ম্মে এই রমণী তখন আপন 'রাণী' নাম সার্থক করিতে এবং ব্রাহ্মণেতরনির্ব্বিশেষে সকল জাতির হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি সর্ব্বপ্রকারে আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন রাণীর কন্যাগণের বিবাহ এবং সন্তানসন্ততি হইয়াছে; এবং একটী মাত্র পুত্র রাখিয়া রাণীর তৃতীয় কন্যার মৃত্যু হওয়ায় প্রিয়দর্শন তৃতীয় জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বা মথুরানাথ বিশ্বাস ঐ ঘটনায় পর হইয়া যাইবেন ভাবিয়া, রাণী তাঁহার চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর বিবাহ উক্ত জামাতারই সহিত সম্পন্ন করিয়া তাঁহার ছিন্নহৃদয় পুনরায় স্নেহপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। রাণীর ঐ চারি কন্যার সন্তানসন্ততিগণ এখনও বর্ত্তমান। *

জমিদারীর প্রজাগণকে নীলকরের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা এবং দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে টোনার খাল খনন করাইয়া মধুমতীর সহিত নবগঙ্গার সংযোগ বিধান করা প্রভৃতি নানা সৎকার্য্য রাণী রাসমণির দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

* পাঠকের অবগতির জন্য রাণী রাসমণির বংশতালিকা 'দক্ষিণেশ্বর' নামক পুস্তিকা হইতে এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—
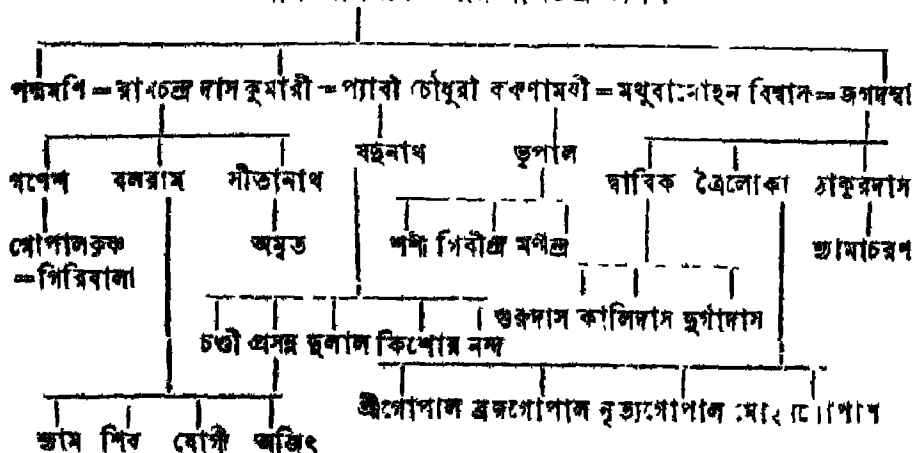
অশেষ গুণশালিনী রাণী রাসমণির শ্রীশ্রীকালিকার শ্রীপাদপদ্মে চিরকাল বিশেষ ভক্তি ছিল। জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্রে নামাঙ্কিত করিবার জন্য তিনি যে শীলমোহর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহাতে ক্ষোদিত ছিল—"কালীপদ অভিলাষী শ্রীমতী রাসমণি দাসী"। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি তেজস্বিনী রাণীর দেবীভক্তি ঐরূপে সকল বিষয়ে প্রকাশ পাইত।

রাণীর দেবীভক্তি।

৺কাশীধামে গমনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা মাতাকে দর্শন ও বিশেষভাবে পূজা করিবার বাসনা রাণীর হৃদয়ে বহুকাল হইতে বলবতী ছিল। শুনা যায়, প্রভূত অর্থ তিনি ঐজন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু স্বামীর সহসা মৃত্যু হইয়া সমগ্র বিষয়ের তত্ত্বাবধান নিজ স্কন্ধে পতিত হওয়ায় এতদিন ঐ বাসনা ফলবতী করিতে পারেন নাই। এখন জামাতৃগণ, বিশেষতঃ তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরামোহন, তাঁহাকে ঐ বিষয়ে সহায়তা করিতে শিক্ষালাভ করিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া উঠায়, রাণী ১২৫৫ সালে কাশী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সকল বিষয় স্থির হইলে যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্ব্ব রাত্রে তিনি স্বপ্নে ৺দেবীর দর্শনলাভ এবং প্রত্যাদেশ পাইলেন—কাশী যাইবার আবশ্যক নাই, ভাগীরথীতীরে মনোরম প্রদেশে আমার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা কর, আমি ঐ মূর্ত্ত্যাশ্রয়ে আবির্ভূতা হইয়া তোমার নিকট হইতে নিত্য পূজা গ্রহণ করিব!* ভক্তিপরায়ণা রাণী

রাণী রাসমণির ৺কাশী যাইবার উদ্যোগকালে প্রত্যাদেশ লাভ।

* কেহ কেহ বলেন যাত্রা করিয়া রাণী কলিকাতার উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া নৌকার উপর রাত্রিবাস করিবার কালে ঐ প্রকার প্রত্যাদেশ লাভ করেন।

ঐরূপ আদেশ লাভে বিশেষ পরিতৃপ্তা হইলেন এবং কাশীযাত্রা স্থগিত রাখিয়া সঞ্চিত ধনরাশি ঐ কার্য্যে নিযোজিত করিতে সংকল্প করিলেন।

রাণীর দেবীমন্দির নির্ম্মাণ।

ঐরূপে শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতি রাণীর বহুকাল সঞ্চিত ভক্তি এই সময়ে সাকার মূর্ত্তি পরিগ্রহে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং ভাগীরথীতীরে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড * ক্রয় করিয়া তিনি বহু অর্থব্যয়ে তদুপরি নবরত্ন পরিশোভিত সুবৃহৎ মন্দির, দেবারাম ও তৎসংলগ্ন উদ্যান নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এখন হইতে আরদ্ধ হইয়া ১২৬২ সালেও উক্ত দেবালয় সম্যক্ নির্ম্মিত হইয়া উঠে নাই দেখিয়া রাণী ভাবিয়াছিলেন, জীবন অনিশ্চিত, মন্দির নির্ম্মাণে বহুকাল ব্যয় করিলে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প হয়ত নিজ জীবনকালে কার্য্যে পরিণত হইয়া উঠিবে না। ঐরূপ আলোচনা করিয়া সন ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে স্নানযাত্রার দিনে রাণী শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। উহার পূর্ব্বের কয়েকটী কথা পাঠকের জানা আবশ্যক।

রাণীর ৺দেবীর অন্ন-ভোগ দিবার বাসনা।

প্রত্যাদেশ পাইয়াই হউক বা হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসেই হউক—কারণ, ভক্তেরা নিজ ইষ্টদেবতাকে সর্ব্বদা আত্মবৎ সেবা করিতে ভালবাসেন—শ্রীশ্রীজগদম্বাকে অন্নভোগ দিবার জন্য রাণীর প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। রাণী ভাবিয়াছিলেন—মন্দিরাদি মনের মত নির্ম্মিত হইয়াছে,

---

* কালীবাটীর জমীর পরিমাণ ৬০ বিঘা, দেবোত্তর দানপত্রে লেখা আছে। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ৬ই তারিখে উক্ত জমী কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের এটর্ণী হেষ্টি নামক জনৈক ইংরাজের নিকট হইতে ক্রয় করা হয়। অতএব মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিতে প্রায় দশ বৎসর লাগিয়াছিল।

সেবা চলিবার জন্য সম্পত্তিও যথেষ্ট দিতেছি, কিন্তু এতটা করিয়াও যদি শ্রীশ্রীজগদম্বাকে প্রাণ যেমন চাহে, নিত্য অন্নভোগ না দিতে পারি তবে সকলই বৃথা। লোকে বলিবে, রাণী রাসমণি এত বড় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু লোকের ঐরূপ কথায় কি আসে যায়? হে জগদম্বে, অন্তঃসারহীন নাম যশ মাত্র দিয়া আমাকে এ বিষয়ে ফিরাইও না! তুমি এখানে নিত্য প্রকাশিতা থাক এবং কৃপা করিয়া দাসীর প্রাণের কামনা পূর্ণ কর!

পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা-গ্রহণের ঐ বাসনা-পূরণের অন্তরায়।

রাণী দেখিলেন, দেবীকে অন্নভোগ প্রদান করিবার পথে প্রধান অন্তরায় তাঁহার জাতি ও সামাজিক প্রথা। নতুবা তাঁহার প্রাণ ত একবারও বলে না যে অন্নভোগ দিলে জগন্মাতা উহা গ্রহণ করিবেন না—হৃদয় ত ঐ চিন্তায় উৎফুল্ল ভিন্ন কখন সঙ্কুচিত হয় না। তবে এই বিপরীত প্রথার প্রচলন হইয়াছে কেন? শাস্ত্রকার কি প্রাণহীন ব্যক্তি ছিলেন? অথবা, স্বার্থপ্রেরিত হইয়া ঈশ্বরীর নিকটেও উচ্চবর্ণের উচ্চাধিকার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন? প্রাণের পবিত্রাকাঙ্ক্ষার অনুসরণপূর্ব্বক প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে কার্য্য করিলেও ভক্ত ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিবেন না—তবে উপায়? তিনি অন্নভোগ প্রদানের নিমিত্ত নানাস্থান হইতে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা সকল আনাইতে লাগিলেন—কিন্তু তাঁহারা কেহই তাঁহাকে ঐ বিষয়ে উৎসাহিত করিলেন না।

রামকুমারের ব্যবস্থাদান।

ঐরূপে মন্দিরনির্ম্মাণ ও মূর্ত্তিগঠন সম্পূর্ণ হইলেও রাণীর পূর্ব্বোক্ত সঙ্কল্প পূর্ণ হইবার কোন উপায় দেখা যাইল না। পণ্ডিতগণের নিকট ব্যবস্থার প্রত্যাখ্যাতা হইয়া তাঁহার আশা যখন ঐ বিষয়ে প্রায় নির্ম্মূলিতা হইয়াছিল, তখন

কামারপুকুরের চতুষ্পাঠী হইতে এক দিবস ব্যবস্থা আসিল—প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে রাণী যদি উক্ত সম্পত্তি কোন ব্রাহ্মণকে দান করেন এবং সেই ব্রাহ্মণ ঐ মন্দিরে দেবী প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্নভোগের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে শাস্ত্রনিয়ম যথাযথ রক্ষিত হইবে এবং ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ উক্ত দেবালয়ে প্রসাদ গ্রহণ করিলেও দোষভাগী হইবেন না।

মন্দিরোৎসর্গ সম্বন্ধে রাণীর সঙ্কল্প।

ঐরূপ ব্যবস্থা পাইয়া রাণীর হৃদয়ে আশা আবার মুকুলিতা হইয়া উঠিল। তিনি নিজ গুরুর নামে দেবালয় প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক তাঁহার অনুমতিক্রমে ঐ দেবসেবার তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারীর পদবী গ্রহণ করিয়া থাকিতে সঙ্কল্প করিলেন। রামকুমার ভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য করিতে তাঁহাকে দৃঢ়সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া অপরাপর পণ্ডিতগণ, 'কার্য্যটী সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধ', 'ঐরূপ করিলেও ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা ঐ স্থানে প্রসাদাদি গ্রহণ করিবেন না' ইত্যাদি নানা কথা পরোক্ষে বলিলেও উহা যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ হইবে, একথা বলিতে সাহসী হইলেন না।

রামকুমারের উদারতা।

ভট্টাচার্য্য রামকুমারের প্রতি রাণীর দৃষ্টি যে উক্ত ঘটনায় বিশেষ-রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল একথা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। ভাবিয়া দেখিলে তখনকার কালে রামকুমারের ঐরূপ ব্যবস্থাদান সামান্য উদারতার পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয় না। সমাজের নেতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মন তখন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল; উহার বাহিরে যাইয়া শাস্ত্রশাসনের ভিতর একটা উদার ভাব দেখিতে এবং অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা প্রদান করিতে তাঁহাদের ভিতর বিরল ব্যক্তিই সক্ষম হইতেন; ফলে অনেক স্থলে তাঁহাদিগের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিতে লোকের মনে প্রবৃত্তির উদয় হইত।

সে যাহা হউক, রামকুমারের সহিত রাণীর ঐখানেই সম্বন্ধ সমাপ্ত হইল না। বুদ্ধিমতী রাণী নিজ গুরুবংশীয়গণকে যথাযথ সম্মান প্রদান করিলেও তাঁহাদিগের শাস্ত্রজ্ঞানরাহিত্য এবং শাস্ত্রমত দেবসেবা সম্পন্ন করিবার সম্পূর্ণ অযোগ্যতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সে জন্য তাঁহাদের ন্যায্য বিদায় আদায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নূতন দেবালয়ের কার্য্যভার যাহাতে শাস্ত্রজ্ঞ সদাচারী ব্রাহ্মণগণের হস্তে অর্পিত হয় তদ্বিষয়ের বন্দোবস্তে মনোনিবেশ করিলেন। এখানেও আবার প্রচলিত সামাজিক প্রথা তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। শূদ্রপ্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর পূজা করা দূরে যাউক, সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণগণ ঐকালে প্রণাম পর্য্যন্ত করিয়া ঐ সকল মূর্ত্তির মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন না এবং রাণীর গুরুবংশীয়গণের ন্যায় ব্রহ্মবন্ধুদিগকে তাঁহারা শূদ্রমধ্যেই পরিগণিত করিতেন। সুতরাং যজনযাজনক্ষম সদাচারী কোন ব্রাহ্মণই রাণীর দেবালয়ে পূজকপদে ব্রতী হইতে সহসা স্বীকৃত হইলেন না। উহাতেও কিন্তু হতাশ না হইয়া রাণী বেতন ও পারিতোষিকের হার বৃদ্ধিপূর্ব্বক পূজকের জন্য নানা স্থানে সন্ধান করিতে লাগিলেন।

রাণী রাসমণির উপযুক্ত পূজকের অন্বেষণ।

ঠাকুরের ভগিনী শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর বাটী কামারপুকুরের অনতিদূরে সিহড় নামক গ্রামে ছিল। তথায় অনেক ব্রাহ্মণের বসতি। মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় * নামক গ্রামের এক ব্যক্তি তখন রাণীর সরকারে কর্ম্ম করিতেন। দু'পয়সা লাভ হইতে পারে ভাবিয়া ইনিই এখন রাণীর দেবালয়ের জন্য পূজক, পাচক প্রভৃতি সকল প্রকার ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী যোগাড় করিয়া দিবার

রাণীর কর্ম্মচারী সিহড় গ্রামের মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পূজক দিবার ভার গ্রহণ।

* কেহ কেহ বলে, এই বংশীয়েরা কোন সময়ে মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ভার লইতে অগ্রসর হইলেন। রাণীর দেবালয়ে চাকরি স্বীকার করাটা দূষণীয় নহে ইহা গ্রামস্থ দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকে বুঝাইবার জন্য মহেশ উক্ত বন্দোবস্তের ভার গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে নিজ অগ্রজ ক্ষেত্রনাথকে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর পূজক পদে মনোনীত করিলেন। ঐরূপে নিজ পরিবারস্থ এক ব্যক্তিকে রাণীর কার্য্যে নিযুক্ত করায় অন্যান্য ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীসকলের যোগাড় করা তাঁহার পক্ষে অনেকটা সহজ হইয়াছিল। কিন্তু নানা প্রযত্নেও তিনি শ্রীশ্রীকালিকা দেবীর মন্দিরের জন্য সুযোগ্য পূজক যোগাড় করিতে না পারিয়া বিশেষ চিন্তিত হইলেন।

রাণীর রামকুমারকে পূজকের পদ গ্রহণে অনুরোধ।

রামকুমার ভট্টাচার্য্যের সহিত মহেশ পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন। গ্রামসম্পর্কে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে একটা সুবাদও পাতান ছিল বলিয়া বোধ হয়। রামকুমার যে একজন ভক্তিমান সাধক এবং স্বেচ্ছায় শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন একথা মহেশের অবিদিত ছিল না। তাঁহার সাংসারিক অভাব অনটনের কথাও মহেশ কিছু কিছু জানিতেন। সেজন্য শ্রীশ্রীকালিকা মাতার পূজক নির্ব্বাচন করিতে যাইয়া তাঁহার দৃষ্টি এখন রামকুমারের প্রতি আকৃষ্ট হইল। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল—অশূদ্রযাজী রামকুমার কলিকাতায় আসিয়া ৺দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি দুই এক জনের বাটীতে পূজকপদ কখন কখন গ্রহণ করিলেও কৈবর্ত্তজাতীয়া রাণীর দেবালয়ে কি ঐরূপ করিতে স্বীকৃত হইবেন?—বিশেষ সন্দেহ। যাহা হউক ৺দেবী-প্রতিষ্ঠার দিন সন্নিকট, সুযোগ্য লোকও পাওয়া যাইতেছে না, অতএব সকল দিক ভাবিয়া মহেশ একবার ঐ বিষয়ে চেষ্টা করিয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। কিন্তু স্বয়ং ঐ বিষয়ে সহসা অগ্রসর না হইয়া রাণীর নিকট সকল কথা বলিয়া প্রতিষ্ঠার দিনে অন্ততঃ রামকুমার

যাহাতে পূজকের পদ গ্রহণ করিয়া সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করেন তজ্জন্য অনুরোধ ও নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতে বলিলেন। রামকুমারের নিকট হইতে পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাপত্র পাইয়া রাণী তাঁহার যোগ্যতার বিষয়ে পূর্ব্বেই উচ্চ ধারণা করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার পূজকপদে ব্রতী হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি এখন বিশেষ আনন্দিতা হইলেন এবং অতি দীনভাবে তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন—শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রতিষ্ঠা করিতে আপনার ব্যবস্থাবলেই আমি অগ্রসর হইয়াছি, এবং আগামী স্নানযাত্রার দিনে শুভ মুহূর্ত্তে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য সমুদয় আয়োজনও করিয়াছি। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর জন্য পূজক পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন সুযোগ্য ব্রাহ্মণই শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজকপদগ্রহণে সম্মত হইয়া আমাকে প্রতিষ্ঠাকার্য্যে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইতেছেন না। অতএব আপনিই এ বিষয়ে যাহা হয় একটা শীঘ্র ব্যবস্থা করিয়া আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। আপনি সুপণ্ডিত এবং শাস্ত্রজ্ঞ, অতএব ঐ পূজকের পদে যাহাকে তাহাকে নিযুক্ত করা চলে না, একথা বলা বাহুল্য।

রাণীর ঐ প্রকার অনুরোধ পত্র লইয়া মহেশ রামকুমারের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে নানারূপে বুঝাইয়া সুযোগ্য পূজক না পাওয়া পর্য্যন্ত পূজকের আসন গ্রহণে স্বীকৃত করাইলেন। ঐরূপে লোভপরিশূন্য ভক্তিমান রামকুমার নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতিষ্ঠা বন্ধ হইবার আশঙ্কাতেই প্রথম দক্ষিণেশ্বর * আগমন করেন

* দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে শ্রীযুক্ত রামকুমারের প্রথমাগমন সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বিবরণ আমরা ঠাকুরের অনুগত ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত হৃদয়রামের নিকটে প্রাপ্ত হইয়াছি। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল ভট্টাচার্য্য কিন্তু ঐ সম্বন্ধে অন্য কথা বলেন। তিনি বলেন— কামারপুকুরের নিকটবর্ত্তী দেশড়া নামক গ্রামের রামধন ঘোষ রাণী রাসমণির

এবং পরে রাণী ও মথুর বাবুর অনুনয় বিনয়ে সুযোগ্য পূজকের অভাব দেখিয়া ঐ স্থানে যাবজ্জীবন থাকিয়া যান। শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছাতেই সংসারে ছোট বড় সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, দেবী-ভক্ত রামকুমার ঐবিষয়ে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা জানিতে পারিয়া ঐ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন কি না—কে বলিতে পারে।

সে যাহা হউক, ঐরূপ অসম্ভাবিত উপায়ে রামকুমারকে পূজকরূপে পাইয়া রাণী রাসমণি সন ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতি-বার স্নানযাত্রার দিবসে মহা সমারোহে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নবমন্দিরে

কর্ম্মচারী ছিলেন। কার্য্যদক্ষতায় ইনি রাণীর সুনয়নে পড়িয়া ক্রমে তাঁহার দেওয়ান পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। কালীবাটী প্রতিষ্ঠার সময় ইনি, শ্রীযুক্ত রামকুমারের সহিত পরিচয় থাকায়, বিদায় লইতে আসিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ-পত্র দেন। রামকুমার তাহাতে রাণীর জানবাজারস্থ ভবনে উপস্থিত হইয়া রামধনকে বলেন, রাণী "কৈবর্ত্তজাতীয়া, আমরা তাঁহার নিমন্ত্রণ ও দান গ্রহণ করিলে একঘরে হইতে হইবে।" রামধন তাহাতে তাঁহাকে খাতা দেখাইয়া বলেন, কেন?—এই দেখ কত ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, তাঁহারা সকলে ঠাকুর ও রাণীর বিদায় গ্রহণ করিবে। রামকুমার তাহাতে বিদায় গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া কালীবাটী প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিনে ঠাকুরের সহিত দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিনে যাত্রা, কালীকীর্ত্তন, ভাগবত পাঠ, রামায়ণ কথা ইত্যাদি নানা বিষয়ে কালীবাটীতে আনন্দের প্রবাহ ছুটিয়াছিল। রাত্রিকালেও ঐরূপ আনন্দের বিরাম হয় নাই এবং অসংখ্য আলোকমালায় দেবালয়ের সর্ব্বত্র দিবসের ন্যায় উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়া-ছিল। ঠাকুর বলিতেন, 'ঐ সময়ে দেবালয় দেখিয়া মনে হইয়াছিল, রাণী যেন রজত-গিরি তুলিয়া আনাইয়া এখানে বসাইয়া দিয়াছেন।' পূর্ব্বোক্ত আনন্দোৎসব দেখিবার জন্য শ্রীযুক্ত রামকুমার প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব দিনে কালীবাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

রামলাল ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্বোক্ত কথায় অনুমিত হয়, রামধন ও মহেশ উভয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্ব্বক পূজকের পদ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

প্রতিষ্ঠিতা করিলেন। শুনা যায়, 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' শব্দে সেদিন ঐ স্থান দিবারাত্র সমভাবে কোলাহলপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং রাণী অকাতরে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া অতিথি অভ্যাগত সকলকে আপনার ন্যায় আনন্দিত করিয়া তুলিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। সুদূর কান্যকুব্জ, বারাণসী, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, উড়িষ্যা এবং নবদ্বীপ প্রভৃতি পণ্ডিতপ্রধান স্থানসমূহ হইতে বহু অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ঐ উপলক্ষে সমাগত হইয়া ঐদিনে প্রত্যেকে রেশমী বস্ত্র, উত্তরীয় এবং বিদায়স্বরূপে এক একটী স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শুনা যায়, দেবালয় নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রাণী নয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন এবং ২, ২৬০০০ মুদ্রার বিনিময়ে ত্রৈলোক্যনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁ মহকুমার অন্তর্গত শালবাড়ি পরগণা ক্রয় করিয়া দেবসেবার জন্য দানপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন।

রাণীর ৺দেবী প্রতিষ্ঠা।

কেহ কেহ বলেন, ভট্টাচার্য্য রামকুমার ঐদিন সিধা লইয়া গঙ্গাতীরে রন্ধন করতঃ আপন অভীষ্ট দেবীকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ ভোজন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের ঐ কথা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, দেবীভক্ত রামকুমার স্বয়ং ব্যবস্থা দিয়া দেবীর অন্নভোগের বন্দোবস্ত করাইয়াছিলেন। তিনিই এখন ঐ নিবেদিত অন্ন গ্রহণ না করিয়া আপন বিধানের এবং ভক্তিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন একথা নিতান্তই অযৌক্তিক। ঠাকুরের মুখেও আমরা ঐরূপ কথা শুনি নাই। অতএব আমাদিগের ধারণা, তিনি পূজান্তে হৃষ্টচিত্তে শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসাদী নৈবেদ্যান্নই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর কিন্তু ঐ আনন্দোৎসবে সম্পূর্ণহৃদয়ে যোগদান করিলেও আহারের বিষয়ে নিজ নিষ্ঠা রক্ষাপূর্ব্বক সন্ধ্যাগমে নিকটবর্ত্তী বাজার হইতে এক পয়সার মুড়ি

প্রতিষ্ঠার দিনে ঠাকুরের আচরণ।

মুড়্‌কি কিনিয়া খাইয়া পদব্রজে শ্যামাপুকুরের চতুষ্পাঠীতে আসিয়া সে রাত্রি বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরে কালীবাটী প্রতিষ্ঠা করা সম্বন্ধে ঠাকুর স্বয়ং আমাদিগকে অনেক সময়ে অনেক কথা বলিতেন। বলিতেন—

কালীবাটির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা।

রাণী কাশীধামে যাইবার জন্য সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন; যাত্রার দিন স্থির করিয়া প্রায় এক শত খানা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নৌকা বিবিধ দ্রব্য সম্ভারে পূর্ণ করিয়া ঘাটে বাঁধাইয়া রাখিয়াছিলেন; যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্ব্ব রাত্রে স্বপ্নে ৺দেবীর নিকট হইতে প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াই ঐ সংকল্প পরিত্যাগ করেন এবং ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠার জন্য যথাযোগ্য স্থানের অনুসন্ধানে নিযুক্তা হন।

বলিতেন—রাণী প্রথমে 'গঙ্গার পশ্চিমকূল, বারাণসী সমতুল'—এই ধারণার বশবর্ত্তিনী হইয়া ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে বালি উত্তরপাড়া প্রভৃতি গ্রামে স্থানান্বেষণ করিয়া বিফলমনোরথ হয়েন।* কারণ 'দশ আনি' 'ছয় আনি' খ্যাত ঐ স্থানের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারীগণ রাণী প্রভূত অর্থ দানে স্বীকৃতা হইলেও, বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকৃত স্থানের কোথাও অপরের ব্যয়ে নির্ম্মিত ঘাট দিয়া গঙ্গায় অবতরণ করিবেন না! রাণী বাধ্য হইয়া পরিশেষে ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে এই স্থানটী ক্রয় করেন।

বলিতেন—রাণী দক্ষিণেশ্বরে যে স্থানটী মনোনীত করিলেন উহার কিয়দংশ এক সাহেবের ছিল, এবং অপরাংশে মুসলমান-দিগের কবরডাঙ্গা ও গাজিসাহেব পীরের স্থান ছিল; স্থানটীর

* বালি উত্তরপাড়া প্রভৃতি গ্রামের প্রাচীন লোকেরা এখনও একথা সত্য বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন।

কূর্ম্মপৃষ্ঠের মত আকার ছিল; ঐরূপ কূর্ম্মপৃষ্ঠাকৃতি শ্মশানই শক্তি-প্রতিষ্ঠা ও সাধনার জন্য বিশেষ প্রশস্ত বলিয়া তন্ত্রনির্দ্দিষ্ট; অতএব দৈবাধীন হইযাই রাণী যেন ঐ স্থানটী মনোনীত করেন।

আবার শক্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট অন্যান্য প্রশস্ত দিবসে মন্দিরপ্রতিষ্ঠা না করিয়া স্নানযাত্রার দিনে বিষ্ণু-পর্ব্বাহে রাণী শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতিষ্ঠা কেন করিযাছিলেন তদ্বিষয়ে কথা উত্থাপন করিযা ঠাকুর কখন কখন আমাদিগকে বলিতেন—দেবীমূর্ত্তি নির্ম্মাণা-রম্ভের দিবস হইতে রাণী যথাশাস্ত্র কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া-ছিলেন; ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন ভোজন, মাটিতে শয়ন ও যথাশক্তি জপ পূজাদি করিতেছিলেন; মন্দির ও দেবীমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইলে প্রতিষ্ঠার জন্য ধীরে সুস্থে শুভ দিবসের নির্দ্ধারণ হইতেছিল এবং মূর্ত্তিটী ভগ্ন হইবার আশঙ্কায বাক্সবন্দি করিযা রাখা হইয়াছিল; এমন সময়ে যে কোন কারণেই হউক ঐ মূর্ত্তি ঘামিয়া উঠে এবং রাণীকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ হয—'আমাকে আর কতদিন এই ভাবে আবদ্ধ করিযা রাখিবি? আমার যে বড় কষ্ট হইতেছে; যত শীঘ্র পারিস্ আমাকে প্রতিষ্ঠিতা কর্।' ঐরূপ প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াই রাণী দেবীপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত হইযা দিন দেখাইতে থাকেন এবং স্নান-যাত্রার পূর্ণিমার অগ্রে অন্য কোন প্রশস্ত দিন না পাইয়া ঐ দিবসে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে সঙ্কল্প করেন।

তদ্ভিন্ন-দেবীকে অন্নভোগ দিতে পারিবেন বলিয়া নিজ গুরুর নামে রাণীর উক্ত ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি পূর্ব্বোল্লিখিত সকল কথাই আমরা ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছিলাম। কেবল ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠার জন্য রাণীকে রামকুমারের ব্যবস্থাদানের ও ঠাকুরকে বুঝাইবার জন্য রামকুমারের ধর্ম্মপত্রানুষ্ঠানের কথা দুইটী আমরা ঠাকুরের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি।

দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে চিরকালের জন্য পূজকপদ গ্রহণ করা যে ভট্টাচার্য্য রামকুমারের প্রথম অভীপ্সিত ছিল না তাহা আমরা ঠাকুরের এই সময়ের ব্যবহারে বুঝিতে পারি। ঐ কথার অনুধাবনে মনে হয় সরল রামকুমার তখনও ঐ বিষয় বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, ৺দেবীকে অন্নভোগ প্রদানের বিধান দিয়া এবং প্রতিষ্ঠার দিনে স্বয়ং ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিবার পরে তিনি পুনরায় ঝামাপুকুরে ফিরিবেন। ঐ দিন দেবীকে অন্নভোগ নিবেদন করিতে বসিয়া তিনি যে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই বা কোনরূপ অন্যায় অশাস্ত্রীয় কার্য্য করিতেছেন এরূপ মনে করেন নাই তাহা কনিষ্ঠের সহিত তাঁহার এই সময়ের ব্যবহারে বুঝিতে পারা যায়।

প্রতিষ্ঠার পরদিনে প্রত্যূষে ঠাকুর, অগ্রজের সংবাদ লইবার জন্য এবং প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত যে সকল কার্য্য বাকি ছিল, তাহা দেখিতে কৌতূহলপরবশ হইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং কিছুকাল তথায় থাকিয়া বুঝেন, অগ্রজের সেদিন ঝামাপুকুরে ফিরিবার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং সেদিন তথায় অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেও অগ্রজের কথা না শুনিয়া তিনি ভোজনকালে পুনরায় ঝামাপুকুরে ফিরিয়া আসেন। ইহার পর ঠাকুর পাঁচ সাত দিন আর দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন নাই। দক্ষিণেশ্বরের কার্য্য সমাপনান্তে অগ্রজ যথাসময়ে ঝামাপুকুরে ফিরিবেন ভাবিয়া ঐ স্থানেই অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু সপ্তাহ অতীত হইলেও যখন রামকুমার ফিরিলেন না তখন মনে নানা প্রকার তোলাপাড়া করিয়া ঠাকুর পুনরায় সংবাদ লইতে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন এবং শুনিলেন রাণীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি চিরকালের জন্য তথায় শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজকের পদে ব্রতী হইতে সম্মত হইয়াছেন। শুনিয়াই ঠাকুরের মনে নানা কথার উদয় হইল, এবং তিনি পিতার অশূদ্রযাজিত্বের এবং

অপ্রতিগ্রাহিত্বের কথা শ্রবণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে ঐরূপ কার্য্য হইতে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, রামকুমার তাহাতে ঠাকুরকে শাস্ত্র ও যুক্তিসহায়ে নানা প্রকারে বুঝাইয়াছিলেন এবং কোন কথাই তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিতেছে না দেখিয়া পরিশেষে ধর্ম্মপত্রানুষ্ঠানরূপ * সরল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। শুনা যায়,

---

* পল্লীগ্রামে রীতি আছে, কোন বিষয় যুক্তিসহকারে মীমাংসিত হইবার সম্ভাবনা না দেখিলে লোকে দৈবের উপর নির্ভর করিয়া দেবতার ঐ বিষয়ে কি অভীপ্সিত জানিবার জন্য ধর্ম্মপত্রের অনুষ্ঠান করে এবং উহার সহায়ে দেবতার ইচ্ছা জানিয়া ঐ বিষয়ে আর যুক্তিতর্ক না করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। ধর্ম্মপত্র নিম্নলিখিত ভাবে অনুষ্ঠিত হয়—

কতকগুলি টুকরা কাগজে বা বিল্বপত্রে "হাঁ" "না" লিখিয়া একটী ঘটীতে রাখিয়া কোন শিশুকে একখণ্ড তুলিতে বলা হয়। শিশু "হাঁ," লিখিত কাগজ তুলিলে অনুষ্ঠাতা বুঝে, দেবতা তাঁহাকে ঐ কার্য্য করিতে বলিতেছেন। বলা বাহুল্য বিপরীত উঠিলে অনুষ্ঠাতা দেবতার অভিপ্রায় অন্যরূপ বুঝে। ধর্ম্মপত্রের অনুষ্ঠান কখন কখন বিষয় বিভাগাদিও হইয়া থাকে। যেমন পিতার চারি সন্তান পূর্ব্বে একত্রে ছিল, এখন হইতে পৃথক হইবার সঙ্কল্প করিয়া বিষয় বিভাগ করিতে যাইয়া উহার কোন্ অংশ কে লইবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না, গ্রামের কয়েক জন নিঃস্বার্থ ধার্ম্মিক লোককে মীমাংসা করিয়া দিতে বলিল। তাহারা তখন স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তি যতদূর সম্ভব সমান চারিভাগে বিভাগকরতঃ কোন্ ভ্রাতার ভাগ্যে কোন্ ভাগটী পড়িবে তাহা ধর্ম্মপত্রের দ্বারা মীমাংসা করিয়া থাকেন। ঐ সময়েও প্রায় পূর্ব্বের ন্যায় অনুষ্ঠান হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজখণ্ডে বিষয়াধিকারীদিগের নাম লিখিয়া কেহ না দেখিতে পায় এরূপভাবে মুড়িয়া একটী ঘটীর ভিতর রক্ষিত হয় এবং উক্ত চারিভাগে বিভক্ত সম্পত্তির প্রত্যেক ভাগ "ক" "খ" ইত্যাদি চিহ্নে নির্দ্দিষ্ট ও ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজখণ্ডে লিপিবদ্ধ হইয়া অন্য একটী পাত্রে পূর্ব্ববৎ রক্ষিত হইয়া থাকে। অনন্তর দুইজন শিশুকে ডাকিয়া এক জনকে একটী পাত্র হইতে এবং অপরকে অপর পাত্র হইতে ঐ কাগজখণ্ডগুলি তুলিতে বলা হয়। অনন্তর কাগজগুলি খুলিয়া দেখিয়া যে নামে সম্পত্তির যে ভাগটী উঠিয়াছে, তাহাই তাহাকে লইতে বাধ্য করা হয়।

ধর্ম্মপত্রে উঠিয়াছিল, "রামকুমার পুজকের পদ গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া নিন্দিত কর্ম্ম করেন নাই। উহাতে সকলেরই মঙ্গল হইবে।"

ঠাকুরের আহারসম্বন্ধে নিষ্ঠা।

ধর্ম্মপত্রের মীমাংসা দেখিয়া ঠাকুরের মন ঐ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলেও এখন অন্য এক চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, চতুষ্পাঠী ত এইবার উঠিয়া যাইল, তিনি এখন কি করিবেন। ঝামাপুকুরে ঐদিন আর না ফিরিয়া ঠাকুর ঐ বিষয়ক চিন্তাতেই মগ্ন রহিলেন এবং রামকুমার তাঁহাকে ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ পাইতে বলিলেও তাহাতে সম্মত হইলেন না। রামকুমার নানাপ্রকারে বুঝাইলেন; বলিলেন—"দেবালয়, গঙ্গাজলে রান্না, তাহার উপর শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নিবেদিত হইয়াছে ইহা ভোজনে কোন দোষ হইবে না।" ঠাকুরের কিন্তু ঐ সকল কথা মনে লাগিল না। তখন রামকুমার বলিলেন, "তবে সিধা লইয়া পঞ্চবটীতলে গঙ্গাগর্ভে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন কর; গঙ্গাগর্ভে অবস্থিত সকল বস্তুই পবিত্র, একথা ত মান?" আহার সম্বন্ধীয় ঠাকুরের মনের ঐকান্তিক নিষ্ঠা এইবার তাঁহার অন্তর্নিহিত গঙ্গাভক্তির নিকট পরাজিত হইল। শাস্ত্রজ্ঞ রামকুমার তাঁহাকে যুক্তিসহায়ে এত করিয়া বুঝাইয়া ইতিপূর্ব্বে যাহা করাইতে পারেন নাই, বিশ্বাস ও ভক্তি তাহা সংসাধিত করিল। ঠাকুর ঐ কথায় সম্মত হইলেন এবং ঐপ্রকারে ভোজন করিয়া দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের গঙ্গাভক্তি।

বাস্তবিক, আমরা আজীবন ঠাকুরকে গঙ্গার প্রতি গভীর ভক্তি করিতে দেখিয়াছি। বলিতেন, নিত্য, শুদ্ধ, ব্রহ্মই জীবকে পবিত্র করিবার জন্য বারিরূপে গঙ্গার আকারে পরিণত হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং গঙ্গা সাক্ষাৎ

ব্রহ্মবারি। গঙ্গাতীরে বাস করিলে দেবতুল্য অন্তঃকরণ হইয়া ধর্ম্ম-বুদ্ধি স্বতঃ স্ফুরিত হয়। গঙ্গার পূত বাষ্পকণাপূর্ণ পবন উভয় কূলে যতদূর সঞ্চরণ করে ততদূর পর্য্যন্ত পবিত্র ভূমি—ঐ ভূমিবাসী-দিগের জীবনে সদাচার, ঈশ্বরভক্তি, নিষ্ঠা, দান এবং তপস্যার ভাব শৈলসুতা ভাগীরথীর কৃপায় সদাই বিরাজিত।” অনেকক্ষণ যদি কেহ বিষয়কথা কহিয়াছে বা বিষয়ী লোকের সঙ্গ করিয়া আসিয়াছে ত ঠাকুর তাহাকে বলিতেন, ‘একটু গঙ্গাজল খাইয়া আয়।’ ঈশ্বরবিমুখ, বিষয়াসক্ত মানব পুণ্যাশ্রমের কোন স্থানে বসিয়া বিষয় চিন্তা করিয়া কলুষিত করিলে তথায় গঙ্গাবারি ছিটাইয়া দিতেন, এবং গঙ্গাবারিতে কেহ শৌচাদি করিতেছে দেখিলে মনে বিশেষ ব্যথা পাইতেন।

সে যাহা হউক, মনোরম ভাগীরথীতীরে বিহগকূজিত পঞ্চবটী-শোভিত উদ্যান, সুবিশাল দেবালয়ে ভক্তিমান সাধকানুষ্ঠিত সুসম্পন্ন দেবসেবা, ধার্ম্মিক সদাচারী পিতৃতুল্য অগ্রজের অকৃত্রিম স্নেহ এবং দেবদ্বিজপরায়ণা পুণ্যবতী রাণী রাসমণি ও তজ্জামাতা মথুরবাবুর শ্রদ্ধা ও ভক্তি শীঘ্রই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীকে ঠাকুরের নিকট কামারপুকুরের গৃহের ন্যায় আপনার করিয়া তুলিল, এবং কিছুকাল স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন করিলেও তিনি তথায় সানন্দচিত্তে বাস করিয়া মনের পূর্ব্বোক্ত কিংকর্ত্তব্যভাব দূরপরিহার করিতে সমর্থ হইলেন।

ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে বাস ও স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন।

ঠাকুরের আহার সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত নিষ্ঠার কথা শুনিয়া কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, ঐরূপ অনুদারতা আমাদের ন্যায় মানবের অন্তরেই সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে—ঠাকুরের জীবনে উহার উল্লেখ করিয়া ইহাই কি বলিতে চাও যে, ঐরূপ অনুদার না হইলে আধ্যাত্মিক

অনুদারতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার প্রভেদ।

জীবনের চরমোন্নতি সম্ভবপর নহে? উত্তরে বলিতে হয়, অনুদারতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা দুইটী এক বস্তু নহে। অহঙ্কারেই প্রথমটীর জন্ম এবং উহার প্রাদুর্ভাবে মানব স্বয়ং যাহা বুঝিতেছে, করিতেছে, তাহাকেই সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানে আপনার চারিদিকে গণ্ডী টানিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসে; এবং শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণের অনুশাসনে বিশ্বাস হইতেই দ্বিতীয়ের উৎপত্তি—উহার উদয়ে মানব নিজ অহঙ্কারকে খর্ব্ব করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত এবং ক্রমে পরম সত্যের অধিকারী হইয়া থাকে। নিষ্ঠার প্রাদুর্ভাবে মানব প্রথম প্রথম কিছুকাল অনুদাররূপে প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু উহার সহায়ে সে জীবনপথে উচ্চ উচ্চতর আলোক ক্রমশঃ দেখিতে পায় এবং তাহার সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী স্বভাবতঃ খসিয়া পড়ে অতএব আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে নিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। ঠাকুরের জীবনে উহার পূর্ব্বোক্তরূপ পরিচয় পাইয়া ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে শাস্ত্রশাসনের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা রাখিয়া যদি আমরা আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হই তবেই কালে যথার্থ উদারতার অধিকারী হইয়া পরম শান্তিলাভে সক্ষম হইব, নতুবা নহে। ঠাকুর যেমন বলিতেন—কাঁটা দিয়াই আমাদিগকে কাঁটা তুলিতে হইবে—নিষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়াই সত্যের উদারতায় পৌঁছিতে হইবে—শাসন, নিয়ম অনুসরণ করিয়াই শাসনাতীত, নিয়মাতীত অবস্থা লাভ করিতে হইবে।

যৌবনের প্রারম্ভে ঠাকুরের জীবনে ঐরূপ অসম্পূর্ণতা বিদ্যমান দেখিয়া কেহ কেহ হয়ত বলিয়া বসিবেন, তবে আর তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলা কেন, মানুষ বলিলেই ত হয়? আর যদি তাঁহাকে ঠাকুর বানাইতেই চাও তবে তাঁহার ঐরূপ অসম্পূর্ণতাগুলি ছাপিয়া ঢাকিয়া বলাই ভাল, নতুবা তোমাদিগের অভীষ্ট সহজে সংসিদ্ধ হইবে

না। আমরা বলি—ভ্রাতঃ, আমাদেরও এককাল গিয়াছে যখন ঈশ্বরের মানববিগ্রহধারণপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইবার কথা স্বপ্নেও সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস করি নাই ; আবার যখন তাঁহার অহেতুক কৃপায় ঐ কথা সম্ভবপর বলিয়া তিনি আমাদিগকে বুঝাইলেন তখন দেখিলাম, মানবদেহ ধারণ করিতে গেলে ঐ দেহের অসম্পূর্ণতাগুলির ন্যায় মানবমনের ত্রুটিগুলিও তাঁহাকে যথাযথভাবে স্বীকার করিতে হয়। ঠাকুর বলিতেন, "স্বর্ণাদি ধাতুতে খাদ না মিলাইলে যেমন গড়ন হয় না সেইরূপ বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণের সহিত রজঃ এবং তমোগুণের মলিনতা কিছুমাত্র মিলিত না হইলে কোন প্রকার দেহ-মন গঠিত হওয়া অসম্ভব।" নিজ জীবনের ঐ সকল অসম্পূর্ণতার কথা আমাদের নিকট প্রকাশ করিতে তিনি কখন কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই, অথচ স্পষ্টাক্ষরে আমাদিগকে বারম্বার বলিয়াছেন—"পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যিনি রাম ও কৃষ্ণাদিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তিনিই ইদানীং (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই খোলটার ভিতরে আসিয়াছেন ; তবে এবার গুপ্তভাবে আসা—রাজা যেমন ছদ্মবেশে সহর দেখিতে বাহির হন, সেই প্রকার।" অতএব ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু জানা আছে সকল কথাই আমরা বলিয়া যাইব ; হে পাঠক, তুমি উহার যতদূর বিশ্বাস ও গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বুঝিবে ততটা মাত্র লইয়া অবশিষ্টের জন্য আমাদিগকে যথা ইচ্ছা নিন্দা তিরস্কার করিলেও আমরা দুঃখিত হইব না।

পঞ্চম অধ্যায়।

পূজকের পদগ্রহণ।

মন্দিরপ্রতিষ্ঠার কয়েক সপ্তাহ পরে ঠাকুরের সৌম্যদর্শন, কোমল প্রকৃতি, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও অল্প বয়স, রাণী রাসমণির জামাতা শ্রীযুক্ত মথুর বাবুর নয়নাকর্ষণ করিয়াছিল। দেখিতে পাওয়া যায়, জীবনে যাহাদিগের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাহাদিগকে প্রথম দর্শনকালে মানবহৃদয়ে একটা প্রীতির আকর্ষণ সহসা আসিয়া উপস্থিত হয়। শাস্ত্র বলেন, উহা আমাদিগের পূর্ব্বজন্মকৃত সম্বন্ধের সংস্কার হইতে উদিত হইয়া থাকে। ঠাকুরকে দেখিয়া মথুর বাবুর মনে এখন যে ঐরূপ একটা অনির্দ্দিষ্ট আকর্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল, একথা, পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে সুদৃঢ় প্রেমসম্বন্ধ দেখিয়া আমরা নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারি।

প্রথম দর্শন হইতে মথুর বাবুর ঠাকুরের প্রতি আচরণ ও সংকল্প।

দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে এক মাস কাল পর্য্যন্ত ঠাকুর কি করা কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিতে না পারিয়া অগ্রজের অনুরোধে দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়াছিলেন। মথুর বাবু ইতিমধ্যে তাঁহাকে দেবীর বেশকারীর কার্য্যে নিযুক্ত করিবার সংকল্প মনে মনে স্থির করিয়া রামকুমার ভট্টাচার্য্যের নিকট ঐবিষয়ক প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন। রামকুমার তাহাতে ভ্রাতার মানসিক অবস্থার কথা তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিয়া তাঁহাকে ঐ বিষয়ে নিরুৎসাহিত

ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়রাম।

করেন। কিন্তু মথুর সহজে নিরস্ত হইবার পাত্র ছিলেন না। ঐরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়াও তিনি ঐ সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে অবসরানুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংযুক্ত আর এক ব্যক্তি এখন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুরের পিতৃষ্বস্রীয়া ভগিনী * শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্র শ্রীহৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কয়েক মাস পূর্ব্বে কর্ম্মের অনুসন্ধানে বর্দ্ধমান সহরে আসিয়া উপস্থিত হয়। হৃদয়ের বয়স তখন ষোল বৎসর। যুবক ঐ স্থানে নিজগ্রামস্থ পরিচিত ব্যক্তিদিগের নিকটে থাকিয়া নিজ সংকল্পসিদ্ধির কোনরূপ সুবিধা করিতে পারিতেছিল না। সে এখন লোকমুখে সংবাদ পাইল তাহার মাতুলেরা রাণী রাসমণির নব দেবালয়ে সসম্মানে অবস্থান করিতেছেন সেখানে উপস্থিত হইতে পারিলে অভিপ্রায়সিদ্ধির সুযোগ হইতে পারে। কালবিলম্ব না করিয়া হৃদয় দক্ষিণেশ্বর-দেবালয়ে উপস্থিত হইল এবং বাল্যকাল হইতে সুপরিচিত

---

* পাঠকের সুবিধার জন্য আমরা ঠাকুরের বংশতালিকা এখানে প্রদান করিতেছি—

মাণিকরাম চট্টোপাধ্যায়।

- ক্ষুদিরাম
  - রামকুমার
    - অক্ষয়
  - রামেশ্বর
    - রামলাল
    - লক্ষ্মী
    - শিবরাম
  - কাত্যায়নী
  - শ্রীরামকৃষ্ণ
  - সর্ব্বমঙ্গলা
- রামশীলা (=ভাগবত বন্দ্যোপাধ্যায়)
  - রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়
  - শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী =কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (হলধারী)
    - রাঘব
    - রামরতন
    - হৃদয়
    - রাজারাম
- নিধিরাম
- রামকানাই
  - রামতারক
  - কালিদাস
    - দীননাথ
    - রামদাস
    - হরমণি

(কাত্যায়নী / শ্রীরামকৃষ্ণ —) সারদাচরণ, শীতলমণি

প্রায় সমবয়স্ক মাতুল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত মিলিত হইয়া তথায় আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিল।

হৃদয় দীর্ঘাকৃতি এবং দেখিতে সুশ্রী সুপুরুষ ছিল। তাহার শরীর যেমন সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ ছিল, মনও তদ্রূপ উদ্যমশীল ও ভয়শূন্য ছিল। কঠোর পরিশ্রম ও অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে এবং প্রতিকূলাবস্থায় পড়িয়া স্থির থাকিয়া অদ্ভুত উপায়সকলের উদ্ভাবনপূর্ব্বক উহা অতিক্রম করিতে, হৃদয় পারদর্শী ছিল। নিজ কনিষ্ঠ মাতুলকে সে সত্যসত্যই ভালবাসিত এবং তাঁহাকে সুখী করিতে অশেষ শারীরিক কষ্টস্বীকারে কুণ্ঠিত হইত না।

সর্ব্বদা অনলস হৃদয়ের অন্তরে ভাবুকতার বিন্দুবিসর্গ ছিল না। ঐজন্য সংসারী মানবের যেমন হইয়া থাকে, হৃদয়ের চিত্ত নিজ স্বার্থচেষ্টা হইতে কখনও সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইতে পারিত না। ঠাকুরের সহিত হৃদয়ের এখন হইতে সম্বন্ধের কথার আমরা যতই আলোচনা করিব ততই দেখিতে পাইব, তাহার জীবনে ভবিষ্যতে যতটুকু ভাবুকতা ও নিঃস্বার্থ চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা ভাবময় ঠাকুরের নিরন্তর সঙ্গগুণে এবং কখন কখন তাঁহার চেষ্টার অনুকরণে আসিয়া উপস্থিত হইত। ঠাকুরের ন্যায় আহার বিহার প্রভৃতি সর্ব্ববিধ শারীরচেষ্টায় উদাসীন, সর্ব্বদা চিন্তাশীল, স্বার্থগন্ধশূন্য ভাবুক জীবনের গঠনকালে হৃদয়ের ন্যায় একজন শ্রদ্ধাসম্পন্ন সাহসী উদ্যমশীল কর্ম্মীর সহায়তা নিতান্ত প্রয়োজন। শ্রীশ্রীজগদম্বা কি সেইজন্য ঠাকুরের সাধনকালে হৃদয়ের ন্যায় পুরুষকে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিয়াছিলেন? ঠাকুর একথা আমাদিগকে বারম্বার বলিয়াছেন, হৃদয় না থাকিলে সাধনকালে তাঁহার শরীররক্ষা অসম্ভব হইত! শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণজীবনের সহিত হৃদয়ের নাম তজ্জন্য নিত্যসংযুক্ত—

এবং তজ্জন্যই সে আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধার অধিকারী হইয়া চিরকালের নিমিত্ত আমাদিগের প্রণম্য হইয়া রহিয়াছে।

হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বরে আসিবার কালে ঠাকুর বিংশতি বর্ষে কয়েক মাস মাত্র পদার্পণ করিয়াছেন। সহচররূপে তাহাকে পাইয়া তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে বাস যে, এখন হইতে অনেকটা সহজ হইয়াছিল, একথা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। তিনি এখন হইতে ভ্রমণ, শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি সকল কার্য্যই তাহার সহিত একত্রে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। চিরকাল বালক-ভাবাপন্ন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের, সাধারণ নয়নে নিষ্কারণ চেষ্টাসকলের প্রতিবাদ না করিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন ও সহানুভূতি করায়, হৃদয় এখন হইতে তাঁহার বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

হৃদয়ের আগমনে ঠাকুর।

হৃদয় আমাদিগকে নিজমুখে বলিয়াছে—"এই সময় হইতে আমি ঠাকুরের প্রতি একটা অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণ অনুভব করিতাম ও ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিতাম। তাঁহাকে ছাড়িয়া একদণ্ড কোথাও থাকিতে হইলে কষ্ট বোধ হইত। শয়ন, ভ্রমণ, উপবেশনাদি সকল কাজ একত্রে করিতাম। কেবল মধ্যাহ্নে ভোজনকালের কিছুক্ষণের জন্য আমাদিগকে পৃথক্ হইতে হইত। কারণ, ঠাকুর সিধা লইয়া পঞ্চবটীতে স্বহস্তে পাক করিয়া খাইতেন এবং আমি ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ পাইতাম। তাঁহার রন্ধনাদির সমস্ত জোগাড় আমি করিয়া দিয়া যাইতাম এবং অনেক সময়ে প্রসাদও পাইতাম। ঐরূপে রন্ধন করিয়া খাইয়াও কিন্তু তিনি মনে শান্তি পাইতেন না—আহার সম্বন্ধে তাঁহার নিষ্ঠা তখন এত প্রবল ছিল। মধ্যাহ্নে ঐরূপে রন্ধন করিলেও রাত্রে কিন্তু তিনি আমাদিগের ন্যায় শ্রীশ্রীজগদম্বাকে

ঠাকুরের প্রতি হৃদয়ের ভালবাসা।

নিবেদিত প্রসাদী লুচি খাইতেন। কতদিন দেখিয়াছি ঐরূপে লুচি খাইতে খাইতে তাঁহার চক্ষে জল আসিয়াছে এবং আক্ষেপ করিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে বলিয়াছেন, 'মা আমাকে কৈবর্ত্তের অন্ন খাওয়ালি' !"

ঠাকুর কখন কখন নিজমুখে আমাদিগকে এই সময়ের কথা এইরূপে বলিয়াছেন, "কৈবর্ত্তের অন্ন খাইতে হইবে, ভাবিয়া মনে তখন দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইত। গরীব কাঙ্গালেরাও অনেকে তখন রাসমণির ঠাকুরবাড়ীতে ঐ জন্য খাইতে আসিত না। খাইবার লোক জুটিত না বলিয়া কতদিন প্রসাদী অন্ন গরুকে খাওয়াইতে এবং অবশিষ্ট গঙ্গায় ফেলিয়া দিতে হইয়াছে।" তবে ঐরূপে রন্ধন করিয়া তাঁহাকে বহুদিন যে খাইতে হয় নাই, একথাও আমরা হৃদয় ও ঠাকুর উভয়ের মুখেই শুনিয়াছি। আমাদের ধারণা, কালী-বাটীতে পূজকের পদে ঠাকুর যতদিন না ব্রতী হইয়াছিলেন ততদিনই ঐরূপ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ঐপদে ব্রতী হওয়া দেবালয়প্রতিষ্ঠার দুই তিন মাস পরেই হইয়াছিল।

ঠাকুর যে তাহাকে বিশেষ ভালবাসেন একথা হৃদয় বুঝিত। তাঁহার সম্বন্ধে একটা কথা কেবল সে কিছুতেই বুঝিতে পারিত না। উহা ইহাই, জ্যেষ্ঠ মাতুল রামকুমারকে যখন সে কোন বিষয়ে সহায়তা করিতে যাইত, মধ্যাহ্নে আহারাদির পর যখন একটু শয়ন করিত, অথবা সায়াহ্নে যখন সে মন্দিরে আরাত্রিক দর্শন করিত, তখন ঠাকুর কিছুক্ষণের জন্য কোথায় অন্তর্হিত হইতেন! অনেক খুঁজিয়াও সে তখন তাঁহার সন্ধান পাইত না। পরে দুই এক ঘণ্টা গত হইলে তিনি যখন ফিরিতেন তখন জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, 'এইখানেই ছিলাম।' কোন কোন দিন সন্ধান করিতে যাইয়া সে তাঁহাকে পঞ্চবটীর দিক হইতে ফিরিতে দেখিয়া ভাবিত

ঠাকুরের আচরণ সম্বন্ধে যাহা হৃদয় বুঝিতে পারিত না।

তিনি শৌচাদির জন্য ঐদিকে গিয়াছিলেন এবং আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিত না।

হৃদয় বলিত, 'এই সময়ে একদিন মূর্ত্তিগঠন করিয়া ঠাকুরের শিবপূজা করিতে ইচ্ছা হয়।' আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, বাল্যকালে কামারপুকুরে তিনি কখন কখন ঐরূপ করিতেন। ইচ্ছা হইবামাত্র তিনি

ঠাকুরের গঠিত শিবমূর্ত্তি দর্শনে মথুরের প্রশংসা

গঙ্গাগর্ভ হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিয়া বৃষ, ডমরু ও ত্রিশূল সহিত একটী শিবমূর্ত্তি স্বহস্তে গঠন করিয়া উহার পূজা করিতে লাগিলেন। মথুরবাবু ঐ সময়ে ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে ঐস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনি তন্ময় হইয়া কি পূজা করিতেছেন জানিতে উৎসুক হইয়া নিকটে আসিয়া ঐ মূর্ত্তিটী দেখিতে পাইলেন। বৃহৎ না হইলেও মূর্ত্তিটী সুন্দর হইয়াছিল। মথুর উহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, বাজারে ঐরূপ দেবভাবাঙ্কিত মূর্ত্তি যে পাওয়া যায় না ইহা তিনি দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন। কৌতূহলপরবশ হইয়া তিনি হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মূর্ত্তি কোথায় পাইলে, কে গড়িয়াছে?" হৃদয়ের উত্তরে ঠাকুর দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়িতে এবং ভগ্ন মূর্ত্তি সুন্দরভাবে জুড়িতে জানেন, একথা জানিতে পারিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন এবং পূজান্তে মূর্ত্তিটী তাঁহাকে দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। হৃদয়ও ঐ কথায় স্বীকৃত হইয়া পূজাশেষে ঠাকুরকে বলিয়া মূর্ত্তিটী লইয়া তাঁহাকে দিয়া আসিলেন। মূর্ত্তিটী হস্তে পাইয়া মথুর এখন উহা তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং মুগ্ধ হইয়া রাণীকে উহা দেখাইতে পাঠাইলেন। রাণীও উহা দেখিয়া নির্ম্মাতার বিশেষ প্রশংসা করিলেন এবং ঠাকুর উহা গড়িয়াছেন জানিয়া মথুরের ন্যায় বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। * ঠাকুরকে

* কেহ কেহ বলেন এই ঘটনা ঠাকুরের পূজাকালে হইয়াছিল এবং মথুর

সেবালয়ের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে মথুরের ইতিপূর্ব্বেই ইচ্ছা হইয়াছিল, এখন তাঁহার এই নূতন গুণপণার পরিচয় পাইয়া ঐ ইচ্ছা অধিকতর বলবতী হইল। তাঁহার ঐরূপ অভিপ্রায়ের কথা ঠাকুর ইতিপূর্ব্বে অগ্রজের নিকট শুনিয়াছিলেন; কিন্তু, ভগবান্ ভিন্ন অপর কাহার চাকরি করিব না—এইরূপ একটা ভাব বাল্যকাল হইতে তাঁহার মনে দৃঢ়নিবদ্ধ থাকায় তিনি ঐ কথায় কর্ণপাত করেন নাই।

চাকরি করা সম্বন্ধে ঠাকুর।

চাকরি করা সম্বন্ধে ঠাকুরকে ঐরূপ ভাব প্রকাশ করিতে আমরা অনেক সময় শুনিয়াছি। বিশেষ অভাবে না পড়িয়া কেহ স্বেচ্ছায় চাকরি স্বীকার করিলে ঠাকুর ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা করিতেন না। তাঁহার বালক ভক্তদিগের মধ্যে একজন * একসময়ে চাকরি স্বীকার করিয়াছে জানিয়া আমরা তাঁহাকে বিশেষ ব্যথিত হইয়া বলিতে শুনিয়াছি, "সে মরিয়াছে শুনিলে আমার যত না কষ্ট হইত, সে চাকরি করিতেছে শুনিয়া ততোধিক কষ্ট হইয়াছে!" পরে কিছুকাল অতীত হইলে ঐ ব্যক্তির সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইয়া যখন জানিলেন, সে তাহার অসহায়া বৃদ্ধা মাতার ভরণপোষণ নির্ব্বাহের জন্য চাকরি স্বীকার করিয়াছে, তখন তিনি সস্নেহে তাহার গাত্রে ও মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিয়াছিলেন, "তাতে দোষ নাই, ঐজন্য চাকরি করায় তোকে দোষ স্পর্শ করবে না; কিন্তু মার জন্য না হয়ে, যদি তুই স্বেচ্ছায় চাকরি করতে যেতিস্ তা হলে তোকে আর স্পর্শ করিতে পারতুম্ না। তাইত বলি আমার নিরঞ্জনে এতটুকু অঞ্জন (কাল দাগ) নাই, তার ঐরূপ হীনবুদ্ধি কেন হবে?"

উহা রাণী রাসমণিকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—যেরূপ উপযুক্ত পূজক পাইয়াছি, তাহাতে ৺দেবী শীঘ্র জাগ্রতা হইয়া উঠিবেন।

* স্বামী নিরঞ্জনানন্দ।

নিত্যনিরঞ্জনকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত কথা শুনিয়া অন্যান্য আগন্তুক ব্যক্তিরা সকলেই বিস্মিত হইল। একজন বলিয়াও বসিল, "মহাশয়, আপনি চাকরির নিন্দা করিতেছেন কিন্তু চাকরি না করিলে সংসার পোষণ করিব কিরূপে?" তদুত্তরে ঠাকুর বলিলেন, "যে কর্‌বে, করুক না; আমি ত সকলকে চাকরি করিতে নিষেধ কর্‌ছি না, (নিরঞ্জনকে ও তাঁহার অন্যান্য বালক ভক্তদিগকে দেখাইয়া) এদের ঐ কথা বলচি; এদের কথা আলাদা।" ঠাকুর তাঁহার বালক ভক্তদিগের জীবন অন্য ভাবে গড়িতেছিলেন এবং পূর্ণ আধ্যাত্মিক ভাবের সহিত চাকরি করাটার কখন সামঞ্জস্য হয় না, এইরূপ ধারণা ছিল বলিয়াই যে তিনি ঐ কথা বলিয়াছিলেন ইহা বলা বাহুল্য।

চাকরি করিতে বলিবে বলিয়া ঠাকুরের মথুরের নিকট যাইতে সঙ্কোচ।

অগ্রজের নিকট হইতে মথুরবাবুর ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ঠাকুর তখন হইতে তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর না হইয়া যতটা পারেন তাঁহার চক্ষুর অন্তরালে থাকিবার চেষ্টা করিতেন। কারণ, কায়মনোবাক্যে সত্য ও ধর্ম্ম পালন করিতে তিনি যেমন কখন কাহারও অপেক্ষা রাখিতেন না, তেমনি আবার বিশেষ কারণ না থাকিলে কাহাকেও উপেক্ষা করিয়া বৃথা কষ্ট দিতে চিরকাল কুণ্ঠিত হইতেন। আবার, কোনরূপ প্রত্যাশা মনের ভিতর না রাখিয়া গুণী ব্যক্তির গুণের আদর করা এবং মানী ব্যক্তিকে সরল স্বাভাবিক ভাবে সম্মান দেওয়াটা ঠাকুরের প্রকৃতিগত ছিল। অতএব দেবালয়ে পূজকপদ গ্রহণ করিবেন কিনা, এই প্রশ্নের যাহা হয় একটা মীমাংসায় স্বয়ং উপনীত হইবার পূর্ব্বে মথুরবাবু তাঁহাকে উহা স্বীকার করিতে অনুরোধ করিয়া ধরিয়া বসিলে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া প্রত্যাখান-পূর্ব্বক তাঁহার মনে কষ্ট দিতে হইবে, এই আশঙ্কাই যে, ঠাকুরের

ঐরূপ চেষ্টার মূলে ছিল তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। বিশেষতঃ, তিনি তখন একজন নগণ্য যুবক মাত্র এবং রাণী রাসমণির দক্ষিণ হস্তস্বরূপ মথুর মহামাননীয় ব্যক্তি; এ অবস্থায় মথুরের অনুরোধ প্রত্যাখান করাটা তাঁহার পক্ষে বালসুলভ চপলতা বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু যত দিন যাইতেছে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে অবস্থান করাটা তাঁহার নিকট তত প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইতেছে, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুরের নিকট নিজ মনোগত এই ভাবটীও লুক্কায়িত ছিল না। কোনরূপ গুরুতর কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিতে পাইলে তাঁহার যে এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় আপত্তি ছিল না এবং জন্মভূমি কামারপুকুরে ফিরিবার জন্য তাঁহার মন যে এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় চঞ্চল ছিল না, একথা আমরা অতঃপর ঘটনাবলী হইতে বেশ বুঝিতে পারি।

ঠাকুরের পূজকের পদ গ্রহণ।

ঠাকুর যাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন তাহাই একদিন হইয়া বসিল। মথুরবাবু কালীমন্দিরে দর্শনাদি করিতে আসিয়া কিছু দূরে ঠাকুরকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ঠাকুর তখন হৃদয়ের সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে মথুরবাবুকে দূরে দেখিতে পাইয়া সেখান হইতে সরিয়া অন্যত্র যাইতেছিলেন, এমন সময়ে মথুরের ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "বাবু আপনাকে ডাকিতেছেন।" ঠাকুর মথুরের নিকট যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া হৃদয় কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—"যাইলেই, আমাকে এখানে থাকিতে বলিবে, চাকরি স্বীকার করিতে বলিবে।" হৃদয় বলিল, 'তাহাতে দোষ কি? এমন স্থানে, মহতের আশ্রয়ে কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া ত ভাল বৈ মন্দ নয়, তবে কেন ইতস্ততঃ করিতেছ?"

ঠাকুর।—"আমার চাকরিতে চিরকাল আবদ্ধ হইয়া থাকিতে

ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ এখানে পূজা করিতে স্বীকার করিলে দেবীর অঙ্গে যে সমস্ত অলঙ্কারাদি আছে তাহার জন্য দায়ী থাকিতে হইবে, সে বড় হাঙ্গামার কথা, আমার দ্বারা উহা সম্ভব হইবে না; তবে যদি তুমি ঐ কার্য্যের ভার লইয়া এখানে থাক তাহা হইলে আমার পূজা করিতে আপত্তি নাই।"

হৃদয় এখানে চাকরির অন্বেষণেই আসিয়াছিল। সুতরাং ঠাকুরের ঐ কথায় আনন্দে স্বীকৃত হইল। ঠাকুর তখন মথুর বাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার দ্বারা দেবালয়ে কর্ম্ম স্বীকার করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। শ্রীযুক্ত মথুর তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইয়া ঐ দিন হইতে তাঁহাকে কালীমন্দিরে বেশকারীর পদে এবং হৃদয়কে রামকুমার ও তাঁহাকে সাহায্য করিতে নিযুক্ত করিলেন। মথুর বাবুর অনুরোধে ভ্রাতাকে ঐরূপে কার্য্যে নিযুক্ত হইতে দেখিয়া রামকুমার নিশ্চিন্ত হইলেন।

৺গোবিন্দজীর বিগ্রহ ভগ্ন হওয়া।

দেবালয় প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলি হইয়া গেল। সন ১২৬২ সালের ভাদ্র মাস উপস্থিত। পূর্ব্ব দিনে মন্দিরে জন্মাষ্টমীকৃত্য যথাযথ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আজ নন্দোৎসব। মধ্যাহ্নে ৺রাধা-গোবিন্দজীর বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদি হইয়া গেলে পূজক ক্ষেত্র-নাথ চট্টোপাধ্যায় ৺রাধারাণীকে কক্ষান্তরে শয়ন করাইয়া আসিয়া ৺গোবিন্দজীকে শয়ন করাইতে লইয়া যাইবার সময় সহসা পড়িয়া গেলেন, বিগ্রহের একটী পদ ভাঙ্গিয়া যাইল। নানা পণ্ডিতের মতামত লইবার পরে ঠাকুরের পরামর্শে বিগ্রহের ভগ্নাংশ জুড়িয়া পূজা চলিতে লাগিল।* ভগবৎপ্রেমে ঠাকুরকে ইতিপূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে

---

* এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের জন্য গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—ষষ্ঠ অধ্যায় ২০৫ পৃষ্ঠা দেখ।

ভাবাবিষ্ট হইতে দর্শন এবং কোন কোন বিষয়ে আদেশ প্রাপ্ত হইতে শ্রবণ করিয়াই মথুরবাবু ভগ্নবিগ্রহ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ-গ্রহণে সমুৎসুক হইয়াছিলেন। হৃদয় বলিত ভগ্নবিগ্রহসম্বন্ধে মথুর বাবুর প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং ভাবভঙ্গ হইলে বলিয়াছিলেন, বিগ্রহমূর্ত্তি পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই। ঠাকুর যে ভগ্নবিগ্রহ সুন্দরভাবে জুড়িতে পারেন, একথা মথুর বাবুর অবিদিত ছিল না। সুতরাং তাঁহার অনুরোধে তাঁহাকেই এখন ঐ বিগ্রহ জুড়িয়া দিতে হইয়াছিল। তিনি উহা এমন সুন্দররূপে জুড়িয়াছিলেন যে, বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেও ঐ মূর্ত্তি যে কোনকালে ভগ্ন হইয়াছিল একথা এখনও বুঝিতে পারা যায় না।

৺রাধাগোবিন্দজীর বিগ্রহ ঐরূপে ভগ্ন হইলে অঙ্গহীন বিগ্রহে পূজা সিদ্ধ হয় না বলিয়া অনেকে অনেক কথা তখন বলাবলি করিত। রাণী রাসমণি ও মথুর বাবু কিন্তু ঠাকুরের যুক্তিযুক্ত পরামর্শে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক ঐ সকল কথায় কর্ণপাত করিতেন না। সে যাহা হউক, পূজক ক্ষেত্রনাথ অনবধানতার অপরাধে কর্ম্মচ্যুত হইলেন এবং ৺রাধাগোবিন্দজীর পূজার ভার তদবধি ঠাকুরের উপরে ন্যস্ত হইল। হৃদয়ও এখন হইতে পূজাকালে শ্রীশ্রীকালীমাতার বেশ করিয়া রামকুমারকে সাহায্য করিতে লাগিল।

বিগ্রহ ভঙ্গপ্রসঙ্গে হৃদয় এক সময়ে আমাদিগের নিকট আর একটী কথার উল্লেখ করিয়াছিল। কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে, বরাহনগরে কুটিঘাটার নিকটে নড়ালের প্রসিদ্ধ জমীদার ৺রতন রায়ের ঘাট বিদ্যমান। ঐ ঘাটের নিকটে একটী ঠাকুরবাটী আছে। উহাতে ৺দশমহাবিদ্যা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা। পূর্ব্বে উক্ত ঠাকুরবাটীতে পূজাদির বেশ বন্দোবস্ত থাকিলেও ঠাকুরের সাধনকালে উহা হীনদশাপন্ন

ভগ্নবিগ্রহের পূজাসম্বন্ধে ঠাকুর জয়নারায়ণ বাবুকে যাহা বলেন।

হইযাছিল। মথুর বাবু যখন ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেছেন তখন তিনি এক সময়ে তাঁহার সহিত উক্ত দেবালয় দর্শন করিতে আসেন এবং অভাব দেখিয়া তাঁহাকে বলিয়া ভোগের জন্য দুই মন চাউল ও দুইটী করিয়া টাকার মাসিক বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি এখানে তিনি মধ্যে মধ্যে ৺দশমহাবিদ্যা দর্শন করিতে আসিতেন। একদিন ঐরূপে দর্শন করিয়া ফিরিবার কালে ঠাকুর এখানকার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার জয়নারায়ণ বন্দোপাধ্যায়কে অনেকগুলি লোকের সহিত সুপ্রতিষ্ঠিত ঘাটে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়াছিলেন। পূর্ব্বপরিচয় থাকায় ঠাকুর তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইলেন। জয়নারায়ণ বাবু তাঁহাকে নমস্কার ও সাদরাহ্বানপূর্ব্বক সঙ্গী সকলকে তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। পরে কথাপ্রসঙ্গে রাণী রাসমণির কালীবাটীর কথা তুলিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়! ওখানকার ৺গোবিন্দজী কি ভাঙ্গা?" ঠাকুর তাহাতে বলিয়াছিলেন, "তোমার কি বুদ্ধি গো? অখণ্ডমণ্ডলাকার যিনি, তিনি কি কখন ভাঙ্গা হন?" জয়নারায়ণ বাবুর প্রশ্নে নিরর্থক নানা কথা উঠিবার সম্ভাবনা দেখিয়া ঠাকুর ঐরূপে ঐ প্রসঙ্গ পাল্টাইয়া দেন, এবং প্রসঙ্গান্তরের উত্থাপন করিয়া সকল বস্তুর অসার ভাগ ছাড়িয়া সার ভাগ গ্রহণ করিতে তাঁহাকে বলিলেন। সুবুদ্ধিসম্পন্ন জয়নারায়ণ বাবুও ঠাকুরের ইঙ্গিতে বুঝিয়া তদবধি ঐরূপ প্রশ্ন সকল করিতে নিরস্ত হইযাছিলেন।

ঠাকুরের সঙ্গীতশক্তি।

হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, ঠাকুরের পূজা একটা দেখিবার বিষয় ছিল; যে দেখিত সেই মুগ্ধ হইত। আর, ঠাকুরের সেই প্রাণের উচ্ছ্বাসে মধুর কণ্ঠে গান!—সে গান যে একবার শুনিত সে কখন ভুলিতে পারিত না। তাহাতে ওস্তাদি কালোয়াতি ঢং ঢাং কিছুই ছিল না। ছিল

কেবল, গীতোক্ত বিষয়ের ভাবটী আপনাতে সম্পূর্ণ আরোপ করিয়া মর্ম্মস্পর্শী মধুর স্বরে যথাযথ প্রকাশ এবং তাল লয়ের বিশুদ্ধতা। ভাবই যে সঙ্গীতের প্রাণ একথা, যে তাঁহার গান শুনিয়াছে সেই বুঝিয়াছে। আবার তাল লয় বিশুদ্ধ না হইলে ঐ ভাব যে আত্ম-প্রকাশে বাধা পাইয়া থাকে একথা ঠাকুরের মুখনিঃসৃত সঙ্গীত শুনিয়া এবং অপরের সঙ্গীতের সহিত উহার তুলনা করিলে বেশ বুঝা যাইত। রাণী রাসমণি যখন যখন দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন তখন ঠাকুরকে ডাকাইয়া তাঁহার গান শুনিতেন। নিম্নলিখিত গীতটি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল—

কোন্ হিসাবে হরহৃদে দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে।
সাধ করে জিব্ বাড়ায়েছ, যেন কত ন্যাকা মেয়ে॥
জেনেছি জেনেছি তারা
তারা কি তোর এমনি ধারা
তোর মা কি তোর বাপের বুকে দাঁড়িয়েছিল অমনি করে॥

ঠাকুরের গীত অত মধুর লাগিবার আর একটী কারণ ছিল। গান গাহিবার সময়ে তিনি গীতোক্তভাবে নিজে এত মুগ্ধ হইতেন যে, অপর কাহারও প্রীতির জন্য গান গাহিতেছেন একথা একেবারে ভুলিয়া যাইতেন। গীতোক্তভাবে মুগ্ধ হইয়া ঐরূপে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইতে আমরা জীবনে অপর কাহাকেও দেখি নাই। ভাবুক গায়কেরাও শ্রোতার নিকট হইতে প্রশংসার প্রত্যাশা কিছু না কিছু রাখিয়া থাকেন। ঠাকুরকে কেবল দেখিয়াছি, তাঁহার গীত শুনিয়া কেহ প্রশংসা করিলে, তিনি যথার্থই ভাবিতেন এই ব্যক্তি গীতোক্ত ভাবের প্রশংসা করিতেছে এবং উহার বিন্দুমাত্র তাঁহার প্রাপ্য নহে।

হৃদয় বলিত, এই কালে গীত গাহিতে গাহিতে দুই চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত; এবং যখন পূজা করিতেন, তখন এমন

তন্ময়ভাবে উহা করিতেন যে, পূজাস্থানে কেহ আসিলে বা নিকটে দাঁড়াইয়া কথা কহিলেও তিনি উহা আদৌ শুনিতে পাইতেন না। ঠাকুর বলিতেন, অঙ্গন্যাস করন্যাস প্রভৃতি পূজাঙ্গসকল সম্পন্ন করিবার কালে ঐ সকল মন্ত্রবর্ণ নিজ দেহে উজ্জ্বলবর্ণে সন্নিবেশিত রহিয়াছে বলিয়া তিনি বাস্তবিক দেখিতে পাইতেন। বাস্তবিকই দেখিতেন,—সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনীশক্তি সুষুম্নামার্গ দিয়া সহস্রারে উঠিতেছেন এবং শরীরের যে যে অংশকে ঐ শক্তি ত্যাগ করিতেছেন সেই সেই অংশগুলি এককালে নিস্পন্দ, অসাড় ও মৃতবৎ হইয়া যাইতেছে! আবার পূজাপদ্ধতির বিধানানুসারে যখন "রং ইতি জলধারয়া বহ্নি-প্রাকারং বিচিন্ত্য"—অর্থাৎ, রং এই মন্ত্রবর্ণ উচ্চারণপূর্ব্বক পূজক আপনার চতুর্দ্দিকে জল ছড়াইয়া ভাবিবে যেন অগ্নির প্রাচীর দ্বারা পূজাস্থান বেষ্টিত রহিয়াছে এবং তজ্জন্য কোন প্রকার বিঘ্নবাধা তথায় প্রবেশ করিতে পারিতেছে না—প্রভৃতি কথার উচ্চারণ করিতেন তখন দেখিতে পাইতেন তাঁহার চতুর্দ্দিকে শত জিহ্বা বিস্তার করিয়া অনুল্লঙ্ঘনীয় অগ্নির প্রাচীর সত্য সত্যই বিদ্যমান থাকিয়া পূজাস্থানকে সর্ব্ববিধ বিঘ্নের হস্ত হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছে। হৃদয় বলিত, পূজার সময় ঠাকুরের তেজঃপুঞ্জ শরীর ও তন্মনস্ক ভাব দেখিয়া অপর ব্রাহ্মণগণ বলাবলি করিতেন,—সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব যেন নরশরীর পরিগ্রহ করিয়া পূজা করিতে বসিয়াছেন।

প্রথম পূজাকালে ঠাকুরের দর্শন।

দেবীভক্ত রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া অবধি আত্মীয়গণের ভরণপোষণ সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেও অন্য এক বিষয়ের জন্য মধ্যে মধ্যে বড় চিন্তিত হইতেন। কারণ, দেখিতেন এখানে আসিয়া অবধি কনিষ্ঠের নির্জ্জনপ্রিয়তা ও সংসার সম্বন্ধে কেমন একটা

ঠাকুরকে কার্য্যদক্ষ করিবার জন্য রামকুমারের শিক্ষাদান।

উদাসীন উদাসীন ভাব। সংসারের যাহাতে উন্নতি হইবে এরূপ কোন কাজেই যেন তাঁহার আঁট দেখিতে পাইতেন না। দেখিতেন, বালক সকাল সন্ধ্যা যখন তখন একাকী মন্দির হইতে দূরে গঙ্গাতীরে পদচারণ করিতেছে, পঞ্চবটীমূলে স্থির হইয়া বসিয়া আছে, অথবা পঞ্চবটীর চতুর্দ্দিকে তখন যে জঙ্গলপূর্ণ স্থান ছিল তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বহুক্ষণ পরে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে। রামকুমার প্রথম প্রথম ভাবিতেন, বালক বোধ হয় কামারপুকুরে মাতার নিকট ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, এবং ঐ বিষয় সদা সর্ব্বদা চিন্তা করিতেছে। কিন্তু দিনের পর দিন যাইলেও সে যখন গৃহে ফিরিবার কথা তাঁহাকে মুখ ফুটিয়া বলিল না এবং কখন কখন তাহাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াও তিনি যখন উহা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না তখন তাহাকে বাড়ীতে ফিরিয়া পাঠাইবার কথা ছাড়িয়া দিলেন। ভাবিলেন, তাঁহার বয়স হইয়াছে, শরীরও দিন দিন অপটু হইয়া পড়িতেছে, কবে পরমায়ু ফুরাইবে কে বলিতে পারে?—এ অবস্থায় আর সময় নষ্ট না করিয়া, তাঁহার অবর্ত্তমানে বালক যাহাতে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া দু'পয়সা উপার্জ্জন করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতে পারে এমন ভাবে তাহাকে মানুষ করিয়া দিয়া যাওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। সুতরাং মথুরবাবু যখন বালককে দেবালয়ে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে রামকুমারকে জিজ্ঞাসা করেন তখন তিনি বিশেষ আনন্দিত হয়েন এবং উহার কিছুকাল পরে যখন বালক মথুরবাবুর অনুরোধে প্রথমে বেশকারী ও পরে পূজকের পদে ব্রতী হইল এবং দক্ষতার সহিত ঐ কার্য্যসকল সম্পন্ন করিতে লাগিল তখন তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া এখন হইতে তাহাকে চণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রীকালীকা মাতা এবং অন্যান্য দেবদেবীর পূজা প্রভৃতি শিখাইতে লাগিলেন। ঠাকুর ঐরূপে দশকর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণগণের যাহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য তাহা অচিরে

শিখিয়া লইলেন; এবং শাক্তী দীক্ষা না লইয়া দেবীপূজা প্রশস্ত নহে শুনিয়া শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার সঙ্কল্প স্থির করিলেন।

কেনারাম ভট্টাচার্য্যের নিকট ঠাকুরের শাক্তী-দীক্ষা গ্রহণ।

শ্রীযুক্ত কেনারাম ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক প্রবীণ শক্তিসাধক তখন কলিকাতার বৈঠকখানা বাজারে বাস করিতেন। দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির দেবালয়ে তাঁহার গতায়াত ছিল এবং মথুরবাবু-প্রমুখ সকলের সহিত তাঁহার পরিচয়ও ছিল বলিয়া বোধ হয়। হৃদয়ের মুখে শুনিয়াছি, যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন, অনুরাগী সাধক বলিয়া তাঁহাকে তাঁহারা বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। ঠাকুরের অগ্রজ রামকুমার ভট্টাচার্য্যের সহিত ইনি পূর্ব্ব হইতে পরিচিত ছিলেন। ঠাকুর ইঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন। শুনিয়াছি, দীক্ষা গ্রহণ করিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবেশে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, এবং শ্রীযুক্ত কেনারাম তাঁহার অসাধারণ ভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ইষ্টলাভবিষয়ে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

রামকুমারের মৃত্যু।

রামকুমারের শরীর এখন হইতে অপটু হওয়াতেই হউক, অথবা ঠাকুরকে ঐ কার্য্যে অভ্যস্ত করাইবার জন্যই হউক, তিনি এই সময়ে স্বল্পায়াসসাধ্য ৺রাধাগোবিন্দজীর সেবা স্বয়ং সম্পন্ন করিতে এবং শ্রীশ্রীকালী মাতার পূজাকার্য্যে ঠাকুরকে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। মথুরবাবু ঐকথা শ্রবণ করিয়া এবং ঠাকুর এখন ৺দেবীপূজায় পারদর্শী হইয়াছেন জানিয়া রামকুমারকে এখন হইতে বরাবর বিষ্ণুঘরে পূজা করিতে অনুরোধ করিলেন। অতএব এখন হইতে কালীঘরে ঠাকুর পূজকরূপে নিযুক্ত থাকিলেন। বৃদ্ধ রামকুমারের শরীর অপটু হওয়ায় কালীঘরের গুরুতরকার্য্যভার বহন করা তাঁহার শক্তিতে কুলাইতেছে

না—একথা বুঝিয়াই মথুরবাবু ঐরূপে পূজকের পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। রামকুমারও ঐরূপ বন্দোবস্তে বিশেষ আনন্দিত হইয়া কনিষ্ঠকে ৺দেবীর পূজা ও সেবাকার্য্য যথাযথভাবে সম্পন্ন করিতে শিক্ষাদানপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি মথুর বাবুকে বলিয়া হৃদয়কে ৺রাধাগোবিন্দজীর পূজায় নিযুক্ত করিলেন এবং অবসর লইয়া কিছু দিনের জন্য গৃহে ফিরিবার যোগাড় করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামকুমারকে আর গৃহে ফিরিতে হয় নাই। গৃহে ফিরিবার বন্দোবস্ত করিতে করিতে কলিকাতার উত্তরে অবস্থিত শ্যামনগর-মূলাজোড় নামক স্থানে তাঁহাকে কয়েক দিনের জন্য কার্য্যোপলক্ষে গমন করিতে হয় এবং তথায় সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হন। রামকুমার ভট্টাচার্য্য রাণী রাসমণির দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে এক বৎসরকাল মাত্র জীবিত থাকিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সন ১২৬৩ সালের প্রারম্ভে তাঁহার শরীর ত্যাগ হইয়াছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ব্যাকুলতা ও প্রথম দর্শন।

ঠাকুবেব এই কালের আচবণ।

অতি অল্প বযসেই ঠাকুবেব পিতাব মৃত্যু হয। সুতবাং বাল্যকাল হইতে তিনি জননী চন্দ্রমণি ও অগ্রজ বামকুমাবের স্নেহেই পালিত হইযাছিলেন। ঠাকুবের অপেক্ষা বামকুমাব একত্রিশ বৎসব বড ছিলেন। সুতবাং ঠাকুবেব পিতৃভক্তিব কিযদংশ তিনি পাইযাছিলেন বলিয়া বোধ হয। পিতৃতুল্য অগ্রজেব সহসা মৃত্যু হওযায ঠাকুব নিতান্ত ব্যথিত হইযাছিলেন। কে বলিবে, ঐ ঘটনা তাঁহাব শুদ্ধ মনে সংসাবের অনিত্যতা সম্বন্ধীয ধাবণা দৃঢ কবিযা উহাতে বৈবাগ্যানল কতদূব প্রবুদ্ধ কবিযাছিল? দেখা যায, এই সময হইতে তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতাব পূজায সমধিক মনোনিবেশপূর্ব্বক মানব তাঁহাব দর্শনলাভে বাস্তবিক কৃতার্থ হয কি না তদ্বিষয় জানিবাব জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিযাছিলেন। পূজান্তে মন্দিরমধ্যে শ্রীশ্রীজগন্মাতাব নিকটে বসিযা এই সময়ে তিনি তন্মনস্কভাবে দিন যাপন কবিতেন এবং বামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত-প্রমুখ ভক্তগণবচিত সঙ্গীতসকল ৺দেবীকে শুনাইতে শুনাইতে প্রেমে বিহ্বল ও আত্মহাবা হইয়া পড়িতেন। বৃথা বাক্যালাপ করিয়া তিনি এখন তিলমাত্র সময় অপব্যয কবিতেন না এবং রাত্রে মন্দির-দ্বাব রুদ্ধ হইলে লোকসঙ্গ পবিহাবপূর্ব্বক পঞ্চবটীর পার্শ্বস্থ জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জগন্মাতাব ধ্যানে কালযাপন করিতেন।

ঠাকুরের ঐ প্রকার চেষ্টাসমূহ হৃদয়ের প্রীতিকর হইত না। কিন্তু সে কি করিবে? বাল্যকাল হইতে তিনি যখন যাহা ধরিয়াছেন তখনি তাহা সম্পাদন করিয়াছেন, কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে পারে নাই, একথা তাহার অবিদিত ছিল না। সুতরাং প্রতিবাদ বা বাধা দেওয়া বৃথা। কিন্তু দিন দিন ঠাকুরের ঐ ভাব প্রবল হইতেছে দেখিয়া হৃদয় কখন কখন একটু আধটু না বলিয়াও থাকিতে পারিত না। রাত্রে নিদ্রা না যাইয়া শয্যাত্যাগপূর্ব্বক তিনি পঞ্চবটীতে চলিয়া যান একথা জানিতে পারিয়া হৃদয় এই সময়ে বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়াছিল। কারণ, মন্দিরে ঠাকুরসেবার পরিশ্রম, তাহার উপর তাঁহার পূর্ব্ববৎ আহার ছিল না, এ অবস্থায় রাত্রে নিদ্রা না যাইলে শরীর ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা। হৃদয় স্থির করিল ঐ বিষয়ের সন্ধান এবং যথাসাধ্য প্রতিবিধান করিতে হইবে।

হৃদয়ের তদ্দর্শনে চিন্তা ও সঙ্কল্প।

পঞ্চবটীর পার্শ্বস্থ স্থান তখন এখানকার মত সমতল ছিল না; নীচু জমি খানাখন্দ ও জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। বুনো গাছগাছড়ার মধ্যে একটি ধাত্রী বা আমলকী বৃক্ষ তথায় জন্মিয়াছিল। একে কবরডাঙ্গা, তাহার উপর জঙ্গল, সে জন্য দিবাভাগেও কেহ ঐ স্থানে বড় একটা যাইত না। যাইলেও জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইত না। আর রাত্রে?—ভূতের ভয়ে কেহ ঐ দিক মাড়াইত না! হৃদয়ের মুখে শুনিয়াছি, পূর্ব্বোক্ত আমলকী বৃক্ষটী নীচু জমিতে থাকায় তাহার তলে কেহ বসিয়া থাকিলে জঙ্গলের বাহিরের উচ্চ জমি হইতে কাহারও নয়নগোচর হইত না। ঠাকুর এই সময়ে উহারই তলে বসিয়া রাত্রে ধ্যান ধারণা করিতেন।

ঐ সময়ে পঞ্চবটী-প্রদেশের অবস্থা।

রাত্রে ঠাকুর ঐ স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিলে হৃদয় এক

দিন অলক্ষ্যে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল এবং তাঁহাকে জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিতে পাইল। তিনি বিরক্ত হইবেন ভাবিয়া সে আর অগ্রসর হইল না।

হৃদয়ের প্রশ্ন, 'রাত্রে জঙ্গলে যাইয়া কি কর?'

কিন্তু তাঁহাকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত কিছুক্ষণ পর্যন্ত আশে পাশে ঢিল ছুড়িতে থাকিল। তিনি তাহাতেও ফিরিলেন না দেখিয়া অগত্যা সে স্বয়ং গৃহে ফিরিল। পরদিন অবসরকালে সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "জঙ্গলের ভিতর রাত্রে যাইয়া কি কর বল দেখি?" ঠাকুর বলিলেন, "ঐ স্থানে একটা আমলকী গাছ আছে, তাহার তলায় বসিয়া ধ্যান করি; শাস্ত্রে বলে আমলকী গাছের তলায় যে যাহা কামনা করিয়া ধ্যান করে তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়।"

ঐ ঘটনার পরে কয়েক দিন ঠাকুর পূর্ব্বোক্ত আমলকী বৃক্ষের তলায় ধ্যানধারণা করিতে বসিলেই মধ্যে মধ্যে লোষ্ট্রাদি নিক্ষিপ্ত হওয়া প্রভৃতি নানাবিধ উৎপাত হইতে লাগিল।

ঠাকুরকে হৃদয়ের ভয় দেখাইবার চেষ্টা।

উহা হৃদয়ের কর্ম্ম বুঝিয়াও তিনি তাহাকে কিছুই বলিলেন না। হৃদয় কিন্তু ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না। এক দিন ঠাকুর বৃক্ষতলে যাইবার কিছুক্ষণ পরে নিঃশব্দে জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দূর হইতে দেখিল, তিনি পরিধেয় বস্ত্র ও যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়া সুখাসীন হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। দেখিয়া ভাবিল, 'মামা কি পাগল হইল নাকি? এরূপ ত পাগলেই করে;

হৃদয়কে ঠাকুরের বলা,—'পাশমুক্ত হইয়া ধ্যান করিতে হয়।'

ধ্যান করিবে, কর; কিন্তু এরূপ উলঙ্গ হইয়া কেন?' ঐরূপ ভাবিয়া সে সহসা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "এ কি হচ্চে? পৈতে, কাপড় ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে বসেছ যে?"

কয়েকবার ডাকাডাকির পরে ঠাকুরের চৈতন্য হইল এবং হৃদয়কে নিকটে দাঁড়াইয়া ঐরূপ প্রশ্ন করিতে শুনিয়া বলিলেন, "তুই কি জানিস? এইরূপে পাশমুক্ত হয়ে ধ্যান করতে হয়; জন্মাবধি মানুষ ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল, ভয়, মান, জাতি, ও অভিমান এই অষ্ট পাশে বদ্ধ হয়ে রয়েছে; পৈতেগাছটাও 'আমি ব্রাহ্মণ, সকলের চেয়ে বড়'—এই অভিমানের চিহ্ন এবং একটা পাশ; মাকে ডাকতে হলে, ঐ সব পাশ ফেলে দিয়ে এক মনে ডাকতে হয়, তাই ঐ সব খুলে রেখেছি; ধ্যান করা শেষ হলে ফিরবার সময় আবার পরব।" হৃদয় ঐরূপ কথা পূর্ব্বে আর কখন শুনে নাই, সুতরাং অবাক্ হইয়া রহিল, এবং উত্তরে কিছুই বলিতে না পারিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল। ইতিপূর্ব্বে সে ভাবিয়াছিল, মাতুলকে অনেক কথা মন্দ বুঝাইয়া বলিবে ও তিরস্কার করিবে—তাহার কিছুই বলা হইল না।

শরীর এবং মন উভয়ের দ্বারা ঠাকুরের জাত্যভিমান নাশের, 'সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন' হইবার ও সর্ব্বজীবে শিবজ্ঞান লাভের জন্য অনুষ্ঠান।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনাপ্রসঙ্গে একটী কথা এখানে বলিয়া রাখা ভাল। কারণ, উহা জানা থাকিলে ঠাকুরের জীবনের পরবর্ত্তী অনেকগুলি ঘটনা আমরা সহজে বুঝিতে পারিব। আমরা দেখিলাম, অষ্টপাশের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য কেবলমাত্র মনে মনে ঐ সকলকে ত্যাগ করিয়াই ঠাকুর নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, কিন্তু স্থূলভাবেও ঐ সকলকে যতদূর ত্যাগ করা যাইতে পারে তাহা করিয়াছিলেন। পরজীবনে অন্য সকল বিষয়েও তাঁহাকে ঐরূপ করিতে আমরা দেখিতে পাই। যথা—

অভিমান নাশ করিয়া মনে যথার্থ দীনতা আনয়নের জন্য তিনি, অপরে যে স্থানকে অশুদ্ধ ভাবিয়া সর্ব্বথা পরিহার করে, সে স্থান বহুপ্রযত্নে স্বহস্তে পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন।

'সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন' না হইলে অর্থাৎ ইতরসাধারণের নিকটে

বহুমূল্য বলিয়া পরিগণিত স্বর্ণাদি ধাতু ও প্রস্তরসকলকে উপলখণ্ডের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিতে না পারিলে, মানব-মন শারীরিক ভোগ সুখেচ্ছা হইতে আপনাকে বিসক্ত করিয়া ঈশ্বরাভিমুখে সম্পূর্ণ ধাবিত হয় না এবং যোগারূঢ় হইতে পারে না)—একথা শুনিয়াই ঠাকুর কয়েক খণ্ড মুদ্রা ও লোষ্ট্র হস্তে গ্রহণ করিয়া বারম্বার 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বলিতে বলিতে উহা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

(সর্ব্বজীবে শিবজ্ঞান দৃঢ় করিবার জন্য কালীবাটীতে কাঙ্গালীদের ভোজন সাঙ্গ হইলে, তাহাদের উচ্ছিষ্টান্ন তিনি দেবতার প্রসাদজ্ঞানে গ্রহণ (ভক্ষণ) ও মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। পরে, উচ্ছিষ্ট পত্রাদি মস্তকে বহন করিয়া গঙ্গাতীরে নিক্ষেপপূর্ব্বক স্বহস্তে মার্জ্জনী ধরিয়া ঐ স্থান ধৌত করিয়াছিলেন এবং নিজ নশ্বর শরীরের দ্বারা ঐরূপ দেবসেবা যৎকিঞ্চিৎ সাধিত হইল ভাবিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন।)

ঐরূপ নানা ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সকল স্থলেই দেখা যায়, ঈশ্বরলাভের পথে প্রতিকূল বিষয়-সকলকে কেবলমাত্র মনে মনে ত্যাগ করিয়া তিনি নিশ্চিত থাকিতেন না। কিন্তু, স্থূলভাবে ঐ সকলকে প্রথমে ত্যাগ করিয়া অথবা, নিজ শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গকে ঐ সকল বিষয় হইতে যথাসম্ভব দূরে রাখিয়া তদ্বিপরীত অনুষ্ঠানসকল করিতে তিনি উহাদিগকে বলপূর্ব্বক নিযোজিত করিতেন। দেখা যায়, ঐরূপ অনুষ্ঠানে তাঁহার মনের পূর্ব্ব সংস্কারসকল এককালে উৎসন্ন হইয়া যাইত এবং তদ্বিপরীত নবীন সংস্কারসকলকে উহা এমন দৃঢ়ভাবে ধারণ করিত যে, কখনই সে আর অন্য ভাব আশ্রয় করিয়া কার্য্য করিতে পারিত না। ঐরূপে কোন নবীন ভাব মনের দ্বারা প্রথম গৃহীত হইয়া শরীরেন্দ্রিয়াদিসহায়ে কার্য্যে কিঞ্চিন্মাত্রও যতক্ষণ না

ঠাকুরের ত্যাগের ক্রম।

অনুষ্ঠিত হইত ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ের যথাযথ ধারণা হইয়া উহার বিপরীত ভাবের ত্যাগ হইয়াছে, একথা তিনি স্বীকার করিতেন না।

পূর্ব্ব সংস্কারসমূহ ত্যাগ করিতে নিতান্ত পরাঙ্মুখ আমরা ভাবি, ঠাকুরের ঐরূপ আচরণের কিছুমাত্র আবশ্যকতা ছিল না। তাঁহার ঐরূপ আচরণসকলের আলোচনা করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলিয়া বলিয়াছেন,—অপবিত্র কদর্য্য স্থান পরিষ্কৃত করা, 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বলিয়া মৃত্তিকাসহ মুদ্রা-খণ্ডসকল গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া প্রভৃতি ঘটনাবলী তাঁহার নিজ মনঃকল্পিত সাধনপথ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব উপায়সকল অবলম্বনে তিনি মনের উপর যে কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন তাহা অতি শীঘ্রই তদপেক্ষা সহজ উপায়ে পাওয়া যাইতে পারে।"* উত্তরে বলিতে হয়—উত্তম কথা, কিন্তু ঐরূপ বাহ্য অনুষ্ঠানসকল না করিয়া কেবলমাত্র মনে মনে বিষয়-ত্যাগকল্পরূপ তোমাদের তথাকথিত সহজ উপায়ের অবলম্বনে কয় জন লোক এ পর্য্যন্ত পূর্ণভাবে রূপরসাদি বিষয়সকল হইতে বিমুখ হইয়া ষোল আনা মন ঈশ্বরে অর্পণ করিতে সক্ষম হইয়াছে? উহা কখনই হইবার নহে। মন একরূপ চিন্তা করিয়া একদিকে চলিবে, এবং শরীর ঐ চিন্তা বা ভাবের বিপরীত কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া অন্য পথে চলিবে—এই প্রকারে কোন মহৎ কার্য্যেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না, ঈশ্বরলাভ ত দূরের কথা! কিন্তু রূপরসাদি ভোগলোলুপ মানব ঐকথা বুঝে না! কোন বিষয় ত্যাগ করা ভাল বলিয়া বুঝিয়াও সে পূর্ব্বসংস্কারবশে

ঐরূপ সম্বন্ধে 'মনঃকল্পিত সাধন পথ' বলিয়া আপত্তি ও তাহার মীমাংসা।

* পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত—"Personal reminiscences of Ram Krishna Paramhansa" Vide, Modern Review for November, 1910.

নিজ শরীরেন্দ্রিয়াদির দ্বারা উহা ত্যাগ করিতে অগ্রসর হয় না এবং ভাবিতে থাকে, 'শরীর যেরূপ কার্য্য করুক না কেন, মনে ত আমি অন্যরূপ ভাবিতেছি!' যোগ ও ভোগ একত্রে গ্রহণ করিবে ভাবিয়া সে আপনাকে আপনি ঐরূপে প্রতারিত করিয়া থাকে। কিন্তু আলোকান্ধকারের ন্যায় যোগ ও ভোগরূপ দুই পদার্থ কখনও একত্রে থাকিতে পারে না। কাম-কাঞ্চনময় সংসার ও ঈশ্বরের সেবা যাহাতে একত্রে একই কালে সম্পন্ন করিতে পারা যায় এরূপ সহজ পথের আবিষ্কার, আধ্যাত্মিক জগতে এ পর্য্যন্ত কেহই করিতে পারে নাই।* শাস্ত্র সেজন্য আমাদিগকে ব্যবস্থা দিতেছেন, 'যাহা ত্যাগ করিতে হইবে তাহা কায়মনোবাক্যে ত্যাগ করিতে হইবে এবং যাহা গ্রহণ করিতে হইবে তাহাও ঐরূপ কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করিতে হইবে, তবেই সাধক ঈশ্বরলাভের অধিকারী হইবেন।' ঋষিগণ সে জন্যই বলিয়াছেন, মানসিক ভাবোদ্দীপক শারীরিক চিহ্ন ও অনুষ্ঠানরহিত তপস্যাসহায়ে—"তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ"—মানব কখন আত্মসাক্ষাৎকার-লাভে সমর্থ হয় না। যুক্তিও বলে, স্থূল হইতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতে কারণে মানবমন ক্রমশঃ অগ্রসর হয়—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

আমরা বলিয়াছি, অগ্রজের মৃত্যুর পর ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায় অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দর্শনলাভের জন্য যাহাই অনুকূল বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহাই বিশ্বস্তচিত্তে ব্যগ্র হইয়া সম্পন্ন করিতেছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এই সময়ে যথারীতি পূজা সমাপনান্তে ৺দেবীকে নিত্য রামপ্রসাদ-প্রমুখ সিদ্ধ ভক্তদিগের রচিত সঙ্গীতসমূহ শ্রবণ করান তিনি পূজার অঙ্গবিশেষ

ঠাকুর এই সময়ে যে ভাবে পূজাদি করিতেন।

* Ye cannot serve God and Mammon together (Holy Bible)

বলিয়া গণ্য করিতেন। হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাসপূর্ণ ঐ সকল গীত গাহিতে গাহিতে তাঁহার চিত্ত উৎসাহপূর্ণ হইয়া উঠিত। ভাবিতেন —রামপ্রসাদপ্রমুখ ভক্তেরা মার দর্শন পাইয়াছিলেন, জগজ্জননীর দর্শন তবে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়; আমি কেন তবে তাঁহার দর্শন পাইব না? ব্যাকুলহৃদয়ে বলিতেন—"মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমায় তবে কেন দেখা দিবি না? আমি ধন, জন, ভোগসুখ, কিছুই চাহি না, আমায় দেখা দে।" ঐরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে নয়নধারায় তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত এবং উহাতে হৃদয়ের ভার কিঞ্চিৎ লঘু হইলে বিশ্বাসের মুগ্ধ প্রেরণায় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় গীত গাহিয়া তিনি ৺দেবীকে প্রসন্ন করিতে উদ্যত হইতেন। এইরূপে পূজা, ধ্যান ও ভজনে দিন যাইতে লাগিল এবং ঠাকুরের মনের অনুরাগ ও ব্যাকুলতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকিল।

দেবীর পূজা ও সেবা সম্পন্ন করিবার নির্দ্দিষ্ট কালও এই সময় হইতে তাঁহার দিনদিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। পূজা করিতে বসিয়া তিনি যথাবিধি নিজ মস্তকে একটী পুষ্প দিয়াই হয়ত দুই ঘণ্টা কাল স্থাণুর ন্যায় স্পন্দহীনভাবে ধ্যানস্থ রহিলেন, অন্নাদি নিবেদন করিয়া, মা খাইতেছেন ভাবিতে ভাবিতেই হয়ত বহুক্ষণ কাটাইলেন, প্রত্যুষে স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া ৺দেবীকে সাজাইতে কত সময় ব্যয় করিলেন, অথবা অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ে সন্ধ্যারতিতেই বহুক্ষণ ব্যাপৃত রহিলেন। আবার অপরাহ্নে জগন্মাতাকে যদি গান শুনাইতে আরম্ভ করিলেন তবে এমন তন্ময় ও ভাববিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে, সময় অতীত হইতেছে একথা বারম্বার স্মরণ করাইয়া দিয়াও তাঁহাকে আরাত্রিকাদি কর্ম্ম সম্পাদনে সময়ে নিযুক্ত করিতে পারা গেল না!—এইরূপে কিছুকাল পূজা চলিতে লাগিল।

ঐরূপ নিষ্ঠা, ভক্তি ও ব্যাকুলতা দেখিয়া ঠাকুরবাটীর জনসাধারণের দৃষ্টি যে এখন ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, একথা বেশ বুঝা যায়। সাধারণে সচরাচর যে পথে চলিয়া থাকে তাহা ছাড়িয়া নূতনভাবে কাহাকেও চলিতে বা কিছু করিতে দেখিলে লোকে প্রথম বিদ্রূপ পরিহাসাদি করিয়া থাকে। কিন্তু দিনের পর যত দিন যাইতে থাকে এবং ঐ ব্যক্তি দৃঢ়তাসহকারে নিজ গন্তব্য পথে যত অগ্রসর হয় ততই সাধারণের মনে পূর্ব্বোক্ত ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া উহার স্থল শ্রদ্ধা আসিয়া অধিকার করে। ঠাকুরের এই সময়ের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধেও ঐরূপ হইয়াছিল। কিছুদিন ঐরূপে পূজা করিতে না করিতে তিনি প্রথমে অনেকের বিদ্রূপভাজন হইলেন। কিছুকাল পরে কেহ কেহ আবার তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিল। শুনা যায়, মথুরবাবু এই সময়ে ঠাকুরের পূজাদি দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে রাণী রাসমণিকে বলিয়াছিলেন, "অদ্ভুত পূজক পাওয়া গিয়াছে, ৺দেবী বোধ হয় শীঘ্রই জাগ্রতা হইয়া উঠিবেন।" লোকের ঐরূপ মতামতে ঠাকুর কিন্তু কোন দিন নিজ গন্তব্য পথ হইতে বিচলিত হন নাই। সাগরগামিনী নদীর ন্যায় তাঁহার মন এখন হইতে অবিরাম এক-ভাবেই শ্রীশ্রীজগন্মাতার শ্রীপাদোদ্দেশে ধাবিত হইয়াছিল।

ঠাকুরের এইকালে পূজাদি কার্য্য সম্বন্ধে মথুরপ্রমুখ সকলে যাহা ভাবিত।

দিনের পর যত দিন যাইতে লাগিল ঠাকুরের মনে অনুরাগ, ব্যাকুলতাও, তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং মনের ঐ প্রকার অবিরাম একদিকে গতি তাঁহার শরীরে নানাপ্রকার বাহ্য লক্ষণে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ঠাকুরের আহার এবং নিদ্রা কমিয়া গেল। শরীরের রক্তপ্রবাহ বক্ষে ও মস্তিষ্কে নিরন্তর দ্রুত প্রধাবিত হওয়ায়, বক্ষঃ-স্থল সর্ব্বদা আরক্তিম হইয়া রহিল, চক্ষু মধ্যে মধ্যে সহসা জলভারাক্রান্ত

ঈশ্বরানুরাগের বৃদ্ধিতে ঠাকুরের শরীরে যে সকল বিকার উপস্থিত হয়।

হইতে লাগিল, এবং ভগবদ্দর্শনের জন্য একান্ত ব্যাকুলতাবশতঃ 'কি করিব, কেমনে পাইব' এইরূপ একটা চিন্তা নিরন্তর পোষণ করায় ধ্যানপূজাদির কাল ভিন্ন অন্য সময়ে তাঁহার শরীরে একটা অশান্তি ও চাঞ্চল্যের ভাব লক্ষিত হইতে লাগিল।

তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এই সময়ে এক দিন তিনি জগদম্বাকে গান শুনাইতেছিলেন এবং তাঁহার দর্শনলাভের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন, "মা, এত যে ডাক্‌চি তার কিছুই তুই কি শুন্‌চিস না? রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমাকে কি দেখা দিবি না?" তিনি বলিতেন--

শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রথম দর্শনলাভের বিবরণ। ঠাকুরের ঐ সময়ের ব্যাকুলতা।

মার দেখা পাইলাম না বলিয়া তখন হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা, জলশূন্য করিবার জন্য লোক যেমন সজোরে গামছা নিঙড়াইয়া থাকে, মনে হইল হৃদয়টাকে ধরিয়া কে যেন তদ্রূপ করিতেছে। মার দেখা বোধ হয় কোন কালেই পাইব না ভাবিয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম। অস্থির হইয়া ভাবিলাম, তবে আর এ জীবনে আবশ্যক নাই। মার ঘরে যে অসি ছিল, দৃষ্টি সহসা তাহার উপর পড়িল। এই দণ্ডেই জীবনের অবসান করিব ভাবিয়া উন্মত্তপ্রায় ছুটিয়া উহা ধরিতেছি, এমন সময়ে সহসা মার অদ্ভুত দর্শন পাইলাম ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম! তাহার পর বাহিরে কি যে হইয়াছে, কোন্ দিক দিয়া সেদিন ও তৎপরদিন যে গিয়াছে তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই। অন্তরে কিন্তু একটা অননুভূতপূর্ব্ব জমাট-বাঁধা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত ছিল এবং মার সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলাম।"

পূর্ব্বোক্ত অদ্ভুত দর্শনের কথা ঠাকুর অন্য একদিন আমাদিগকে এইরূপে বিবৃত করিয়া বলেন, "ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন

কোথায় লুপ্ত হইল—কোথাও যেন আর কিছুই নাই!—আর দেখিতেছি, কি, এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃ-সমুদ্র!—যে দিকে যতদূর দেখি, চারিদিক হইতে তার উজ্জ্বল ঊর্ম্মিমালা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে! দেখিতে দেখিতে উহারা আমার উপরে নিপতিত হইল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলাইয়া দিল! হাঁপাইয়া, হাবুডুবু খাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম।” ঐরূপে প্রথম দর্শনকালে তিনি, চেতন জ্যোতিঃ-সমুদ্রের দর্শনলাভের কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্য-ঘন জগদম্বার বরাভয়করা মূর্ত্তি?—ঠাকুর কি এখন তাহারও দর্শন এই জ্যোতিঃ-সমুদ্রের মধ্যে পাইয়াছিলেন? পাইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, কারণ শুনিয়াছি, প্রথম দর্শনের সময়ে তাঁহার কিছুমাত্র সংজ্ঞা যখন হইয়াছিল তখন তিনি কাতরকণ্ঠে ‘মা’, ‘মা’ শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত দর্শনের বিরাম হইলে শ্রীশ্রীজগদম্বার চিন্ময়ী মূর্ত্তির অবাধ অবিরাম দর্শনলাভের জন্য ঠাকুরের প্রাণে একটা অবিশ্রান্ত আকুল ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল। ক্রন্দনাদি বাহ্যলক্ষণে সকল সময়ে প্রকাশিত না হইলেও উহা অন্তরে সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকিত, এবং কখন কখন এত বৃদ্ধি পাইত যে, আর চাপিতে না পারিয়া ভূমিতে লুটাইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে ‘মা আমায় কৃপা কর্, দেখা দে’—বলিয়া এমন ক্রন্দন করিতেন যে, চারি পার্শ্বে লোক দাঁড়াইয়া যাইত।—ঐরূপ অস্থির চেষ্টায় লোকে কি বলিবে, এ কথার বিন্দুমাত্রও তখন তাঁহার মনে আসিত না। বলিতেন, “চারি দিকে লোক দাঁড়াইয়া থাকিলেও তাহাদিগকে ছায়া বা ছবিতে আঁকা মূর্ত্তির ন্যায় অবাস্তব মনে হইত এবং তজ্জন্য মনে কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচের উদয় হইত না! ঐরূপ অসহ্য যন্ত্রণায়

সময়ে সময়ে বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতাম এবং ঐরূপ হইবার পরেই দেখিতাম "মার বরাভয়করা চিন্ময়ী মূর্ত্তি!—দেখিতাম ঐ মূর্ত্তি হাসিতেছে, কথা কহিতেছে, অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিতেছে!"

পঞ্চবটী।

সপ্তম অধ্যায়।

সাধনা ও দিব্যোন্মত্ততা।

প্রথম দর্শনের পরের অবস্থা।

শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রথম দর্শনলাভের আনন্দে ঠাকুর কয়েক দিনের জন্য একেবারে কাজের বাহির হইয়া পড়িলেন। পূজাদি মন্দিরের কার্য্য সকল নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। হৃদয় উহা অন্য এক ব্রাহ্মণের সহায়ে কোনরূপে সম্পাদন করিতে লাগিল এবং মাতুল বায়ুরোগগ্রস্ত হইয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার চিকিৎসায় মনোনিবেশ করিল। ভূকৈলাসের রাজবাটীতে নিযুক্ত এক সুযোগ্য বৈদ্যের সহিত ইতিপূর্ব্বে কোনও সূত্রে তাহার পরিচয় হইয়াছিল, হৃদয় এখন তাঁহারই দ্বারা ঠাকুরের চিকিৎসা করাইতে লাগিল এবং রোগের শীঘ্র উপশমের সম্ভাবনা না দেখিয়া কামারপুকুরে সংবাদ পাঠাইল।

ঠাকুরের ঐ সময়ের শারীরিক ও মানসিক প্রত্যক্ষ এবং দর্শনাদি

ভগবদ্দর্শনের জন্য উদ্দাম ব্যাকুলতায় ঠাকুর যেদিন একেবারে অস্থির বা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া না পড়িতেন, সেদিন পূর্ব্বের ন্যায় পূজা করিতে অগ্রসর হইতেন। পূজা ও ধ্যানাদি করিবার কালে ঐ সময়ে তাঁহার যেরূপ চিন্তা ও অনুভব উপস্থিত হইত তদ্বিষয়ে তিনি আমাদিগকে নিম্নলিখিতভাবে কখন কখন কিছু কিছু বলিয়াছিলেন। "মার নাটমন্দিরের ছাদের আলিশায় যে ধ্যানস্থ ভৈরব মূর্ত্তি আছে, ধ্যান করিতে যাইবার সময় তাহাকে দেখাইয়া মনকে বলিতাম, 'ঐরূপ স্থির নিস্পন্দভাবে বসিয়া মার পাদ-

পদ্ম চিন্তা করিতে হইবে।' ধ্যান করিতে বসিবামাত্র শুনিতে পাইতাম শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গ্রন্থিসকলে, পায়ের দিক হইতে ঊর্দ্ধে, খট্ খট্ করিয়া শব্দ হইতেছে এবং একটার পর একটা করিয়া গ্রন্থিগুলি আবদ্ধ হইয়া যাইতেছে, কে যেন ভিতর ঐ সকল স্থান তালাবদ্ধ করিয়া দিতেছে। যতক্ষণ ধ্যান করিতাম ততক্ষণ শরীর যে একটুও নাড়িয়া চাড়িয়া আসন পরিবর্ত্তন করিয়া লইব, অথবা ইচ্ছামাত্রেই ধ্যান ছাড়িয়া অন্যত্র গমন বা অন্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইব তাহার সামর্থ্য থাকিত না। পূর্ব্ববৎ খট্ খট্ শব্দ করিয়া—এবার উপরের দিক হইতে পা পর্য্যন্ত—ঐ সকল গ্রন্থি পুনরায় যতক্ষণ না খুলিয়া যাইত ততক্ষণ কে যেন একভাবে জোর করিয়া বসাইয়া রাখিত। ধ্যান করিতে বসিয়া প্রথম প্রথম খদ্যোৎপুঞ্জের ন্যায় জ্যোতির্বিন্দুসমূহ দেখিতে পাইতাম; কখন বা কুয়াসার ন্যায় পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতিতে চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত দেখিতাম; আবার কখন বা গলিত রূপার ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতিঃতরঙ্গে সমুদয় পদার্থ পরিব্যাপ্ত দেখিতাম। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঐরূপ দেখিতাম; আবার অনেক সময় চক্ষু চাহিয়াও ঐরূপ দেখিতে পাইতাম। কি দেখিতেছি তাহা বুঝিতাম না, ঐরূপ দর্শন হওয়া ভাল কি মন্দ তাহাও জানিতাম না। সুতরাং মা'র (৺জগন্মাতার) নিকট ব্যাকুলহৃদয়ে প্রার্থনা করিতাম—'মা, আমার কি হচ্চে, কিছুই বুঝি না; তোকে ডাকিবার মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানি না; যাহা করিলে তোকে পাওয়া যায়, তুইই তাহা আমাকে শিখাইয়া দে। তুই না শিখালে কে আর আমাকে শিখাবে মা; তুই ছাড়া আমার গতি ও সহায় আর কেহই যে নাই!' এক মনে ঐরূপে প্রার্থনা করিতাম এবং প্রাণের ব্যাকুলতায় ক্রন্দন করিতাম!"

প্রথম দর্শনলাভে ঠাকুরের প্রত্যক্ষ চেষ্টা ও ভাব কিরূপ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়।

ঠাকুরের পূজা ধ্যানাদি এই সময়ে এক অভিনব আকার ধারণ করিয়াছিল। সেই অদ্ভুত তন্ময়ভাব, শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে আশ্রয় করিয়া সেই বালকের ন্যায় সরল বিশ্বাস ও নির্ভরের মাধুর্য্য অপরকে বুঝান কঠিন! প্রবীণের গাম্ভীর্য্য, পুরুষকার অবলম্বনে দেশকালপাত্রভেদে বিধি নিষেধ মানিয়া চলা, অথবা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সকল দিক বজায় রাখিয়া ব্যবহার করা ইত্যাদির কিছুই উহাতে লক্ষিত হইত না! দেখিলে মনে হইত, 'মা তোর শরণাগত বালককে যাহা কিছু বলিতে ও করিতে হইবে তাহা তুইই বলা ও করা'—সর্ব্বান্তঃকরণে ঐরূপ ভাব আশ্রয়পূর্ব্বক ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছার ভিতর আপনার ক্ষুদ্র ইচ্ছা ও অভিমানকে ডুবাইয়া দিয়া এককালে যন্ত্রস্বরূপ হইয়াই যেন তিনি যত কিছু কার্য্য এখন করিতেছেন। উহাতে মানব সাধারণের বিশ্বাস ও কার্য্যকলাপের সহিত তাঁহার ব্যবহার-চেষ্টাদির বিশেষ বিরোধ উপস্থিত হইয়া, নানা লোকে নানা কথা, প্রথম অস্ফুট জল্পনায়, পরে উচ্চ স্বরে বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু ঐরূপ হইলে কি হইবে? জগদম্বার বালক এখন তাঁহারই অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে যাহা করিবার করিতেছিল, ক্ষুব্ধ সংসারের বৃথা কোলাহল তাহার কর্ণে এখন কিছুমাত্র প্রবিষ্ট হইতেছিল না! সে এখন সংসারে থাকিয়াও সংসারে ছিল না! বহির্জ্জগৎ এখন তাহার নিকট স্বপ্নরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল; চেষ্টা করিয়াও উহাতে সে আর পূর্ব্বের ন্যায় বাস্তবতা আনিতে পারিতেছিল না এবং শ্রীশ্রীজগদম্বার চিন্ময়ী আনন্দঘনমূর্ত্তিই এখন তাহার নিকটে একমাত্র সার পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল।

পূজা ধ্যানাদি করিতে বসিয়া ঠাকুর ইতিপূর্ব্বে কোনদিন দেখিতেন

মা'র হাতখানি, বা কোমলোজ্জ্বল পা খানি, বা 'সৌম্যাৎ-সৌম্য' হাস্যদীপ্ত স্নিগ্ধ চন্দ্র মুখখানি—এখন, পূজাধ্যানকাল ভিন্ন অন্য সময়েও দেখিতে পাইতেন, সর্ব্বাবয়সম্পন্না জ্যোতির্ম্ময়ী মা, হাসিতেছেন, কথা কহিতেছেন, 'এটা কর, ওটা করিস না,' বলিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন!

ঠাকুরের ইতিপূর্ব্বের পূজা ও দর্শনাদির সহিত এই সময়ের ঐ সকলের প্রভেদ।

পূর্ব্বে মাকে অন্নাদি নিবেদন করিয়া দেখিতেন, মা'র "নয়ন হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃরশ্মি 'লক লক' করিয়া নির্গত হইয়া নিবেদিত আহার্য্য-সমুদায় স্পর্শ ও তাহার সারভাগ সংগ্রহ করিয়া পুনরায় নয়নে সংহৃত হইতেছে!"—এখন দেখিতে পাইতেন, ভোগ নিবেদন করিয়া দিবামাত্র এবং কখন কখন দিবার পূর্ব্বেই মা শ্রীঅঙ্গের প্রভায় মন্দির আলো করিয়া সাক্ষাৎ খাইতে বসিয়াছেন! হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, পূজাকালে একদিন সে সহসা উপস্থিত হইয়া দেখে, ঠাকুর জগদম্বার পাদপদ্মে জবাবিল্বার্ঘ্য দিবেন বলিয়া উহা হস্তে লইয়া তন্ময় হইয়া চিন্তা করিতে করিতে সহসা—'রোস্, রোস্, আগে মন্ত্রটা বলি তার পর খাস'—বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এবং পূজা সম্পূর্ণ না করিয়া অগ্রেই নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া দিলেন।

পূর্ব্বে ধ্যান পূজাদিকালে দেখিতেন, সম্মুখস্থ পাষাণমূর্ত্তিতে এক জীবন্ত জাগ্রৎ অধিষ্ঠান আবির্ভূত হইয়াছে—এখন মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া পাষাণময়ীকে আর দেখিতেই পাইতেন না। দেখিতেন যাঁহার চৈতন্যে সমগ্র জগৎ সচেতন হইয়া রহিয়াছে তিনিই চিদ্ঘন মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক বরাভয়কর-সুশোভিতা হইয়া তথায় সর্ব্বদা বিরাজিতা। ঠাকুর বলিতেন, "নাসিকায় হাত দিয়া দেখিয়াছি, মা সত্য সত্যই নিশ্বাস ফেলিতেছেন। তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াও রাত্রিকালে দীপালোকে মন্দিরদেউলে মা'র দিব্যাঙ্গের ছায়া কখন পতিত হইতে দেখি

নাই। আপন কক্ষে বসিয়া শুনিয়াছি, মা পাঁইজোর পরিয়া বালিকার মত আনন্দিতা হইয়া ঝম্ ঝম্ শব্দ করিতে করিতে মন্দিরের উপর তলায় উঠিতেছেন! দ্রুতপদে কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিয়াছি, সত্য সত্যই মা মন্দিরের দ্বিতলের বারান্দায় আলুলায়িত কেশে দাঁড়াইয়া কখন কলিকাতা, এবং কখন গঙ্গা দর্শন করিতেছেন!”

ঠাকুরের এই সময়ের পূজাদি সম্বন্ধে হৃদয়ের কথা।

হৃদয় বলিত, “ঠাকুর যখন শ্রীমন্দিরে থাকিতেন তখন ত কথাই নাই, অন্য সময়েও এখন কালীঘরে প্রবিষ্ট হইলে এক অনির্ব্বচনীয় দিব্যাবেশ অনুভূত হইয়া গা 'ছম্ ছম্' করিত। পূজাকালে ঠাকুর কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা দেখিবার প্রলোভন ছাড়িতে পারিতাম না। অনেক সময়ে সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিতাম তাহাতে বিস্ময় ভক্তিতে অন্তর পূর্ণ হইত। বাহিরে আসিয়া কিন্তু মনে সন্দেহ হইত। ভাবিতাম, মামা কি সত্য সত্যই পাগল হইলেন?—নতুবা পূজাকালে এরূপ ব্যবহার করেন কেন? রাণীমাতা ও মথুরবাবু এইরূপ পূজার কথা জানিতে পারিলে কি মনে করিবেন, ভাবিয়া বিষম ভয়ও হইত। মামার কিন্তু ঐরূপ কথা একবারও মনে আসিত না, এবং বলিলেও তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না! অধিক কথাও তাঁহাকে এখন বলিতে পারিতাম না; একটা অব্যক্ত ভয় ও সঙ্কোচ আসিয়া মুখ চাপিয়া ধরিত এবং তাঁহার ও আমার মধ্যে একটা অনির্ব্বচনীয় দূরত্বের ব্যবধান অনুভব করিতাম। অগত্যা নীরবে তাঁহার যথাসাধ্য সেবা করিতাম। মনে কিন্তু হইত, মামা ঐরূপে কোন দিন একটা কাণ্ড না বাধাইয়া বসেন।”

পূজাকালে মন্দির-মধ্যে সহসা উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের যে সকল চেষ্টা দেখিয়া হৃদয়ের বিস্ময়, ভয় ও ভক্তি যুগপৎ উপস্থিত হইত তৎসম্বন্ধে সে আমাদিগকে এইরূপে বলিয়াছিল—

"দেখিতাম, জবাবিল্বার্ঘ্য সাজাইযা মামা, প্রথমতঃ উহা দ্বাবা নিজ মস্তক, বক্ষ, সর্ব্বাঙ্গ, এমন কি নিজ পদ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিযা পরে উহা জগদম্বাব পাদপদ্মে অর্পণ কবিলেন।

"দেখিতাম; মাতালেব ন্যায় তাঁহাব বক্ষ ও চক্ষু আরক্তিম হইযা উঠিয়াছে এবং তদবস্থায টলিতে টলিতে পূজাসন ত্যাগ কবিযা সিংহাসনেব উপর উঠিযা সস্নেহে জগদম্বাব চিবুক ধবিয়া আদব, গান, পরিহাস বা কথোপকথন কবিতে লাগিলেন, অথবা শ্রীমূর্ত্তিব হাত ধরিয়া নৃত্য করিতেই আরম্ভ করিলেন!

"দেখিতাম, শ্রীশ্রীজগদম্বাকে অন্নাদি ভোগ নিবেদন কবিতে করিতে তিনি সহসা উঠিযা পড়িলেন এবং থাল হইতে এক গ্রাস অন্নব্যঞ্জন লইযা দ্রুতপদে সিংহাসনে উঠিযা মা'ব মুখে স্পর্শ কবাইয়া বলিতে লাগিলেন—'খা মা খা, বেশ ক'বে খা!' পরে হযত বলিলেন, 'আমি খাব? আচ্ছা খাচ্চি!'—এই বলিয়া উহাব কিযদংশ নিজে গ্রহণ কবিযা অবশিষ্টাংশ পুনবায মা'ব মুখে দিয়া বলিতে লাগিলেন—'আমি ত খেযেছি, এইবাব তুই খা!'

"একদিন দেখি, ভোগ নিবেদন কবিবাব সময একটা বিড়ালকে কালীঘবে ঢুকিযা ম্যাও ম্যাও কবিযা ডাকিতে দেখিযা মামা, 'খাবি মা, খাবি মা' বলিযা ভোগেব অন্ন তাহাকেই খাওযাইতে লাগিলেন!

"দেখিতাম, বাত্রে এক এক দিন জগন্মাতাকে শযন দিযা মামা, 'আমাকে কাছে শুতে বল্‌চিস,—আচ্ছা, শুচ্চি, বলিযা জগন্মাতাব বৌপ্যনির্ম্মিত খট্টাস কিছুক্ষণ শুইয়া বহিলেন।

"আবার দেখিতাম, পূজা কবিতে বসিযা তিনি এমন তন্মযভাবে ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন যে বহুক্ষণ তাঁহাব বাহ্যজ্ঞানেব লেশমাত্র বহিল না!

"প্রত্যুষে উঠিযা মা কালীর মালা গাঁথিবাব নিমিত্ত মামা নিত্য পুষ্প চয়ন করিতেন। দেখিতাম, তখনও তিনি যেন কাহার সহিত

কথা কহিতেছেন, হাসিতেছেন, আদর আব্দার, রঙ্গ পরিহাসাদি করিতেছেন।

"আর দেখিতাম, রাত্রিকালে মামার আদৌ নিদ্রা নাই। যখনি জাগিয়াছি তখনই দেখিয়াছি তিনি ঐরূপে ভাবের ঘোরে কথা কহিতেছেন, গান করিতেছেন বা পঞ্চবটীতে যাইয়া ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন।"

ঠাকুরের রাগাত্মিকা পূজা দেখিয়া কালী-বাটীর খাজাঞ্চী প্রমুখ কর্ম্মচারীদিগের জল্পনা ও মথুরবাবুর নিকট সংবাদ প্রেরণ।

হৃদয় বলিত, ঠাকুরকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া মনে আশঙ্কা হইলেও উহা অপরের নিকট প্রকাশ করিয়া কি করা কর্ত্তব্য তদবিষয়ে পরামর্শ লইবার তাহার উপায় ছিল না। কারণ, পাছে সে উহা ঠাকুর-বাটীর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের নিকট প্রকাশ করে, এবং তাহারা শুনিয়া, ঐ কথা বাবুদের কাণে তুলিয়া তাহার মাতুলের অনিষ্ট সাধন করে। কিন্তু প্রতিদিন, যখন ঐরূপ হইতে লাগিল তখন ঐ কথা আর কেমনে চাপা যাইবে? অন্য কেহ কেহ তাহার ন্যায় পূজাকালে কালীঘরে আসিয়া ঠাকুরের ঐরূপ আচরণ স্বচক্ষে দেখিয়া যাইয়া খাজাঞ্চীপ্রমুখ কর্ম্মচারীদিগের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিল। তাহারা ঐকথা শুনিয়া কালীঘরে আসিয়া স্বচক্ষে উহা প্রত্যক্ষ করিল; কিন্তু ঠাকুরের দেবতাবিষ্টের ন্যায় আকার, অসঙ্কোচ ব্যবহার ও নির্ভীক উন্মনাভাব দেখিয়া একটা অনির্দ্দিষ্ট ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া সহসা তাঁহাকে কিছু বলিতে বা নিষেধ করিতে পারিল না। দপ্তরখানায় ফিরিয়া আসিয়া সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল,—হয় ভট্টাচার্য্য পাগল হইয়াছেন, না হয়ত তাঁহাতে উপদেবতার আবেশ হইয়াছে। নতুবা পূজাকালে কেহ কখন ঐরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ স্বেচ্ছাচার করিতে পারে না; যাহাই হউক ৺দেবীর পূজা

ভোগরাগাদি কিছুই হইতেছে না; তিনি সকল নষ্ট করিয়াছেন; বাবুদের এ বিষয়ে সংবাদ প্রেরণ কর্ত্তব্য।

মথুর বাবুর নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল। উত্তরে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি শীঘ্রই স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয়ে যথাবিধান করিবেন; যদবধি তাহা না করিতেছেন তদবধি ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে ভাবে পূজাদি করিতেছেন সেই ভাবেই করুন, তদ্বিষয়ে কেহ বাধা দিবে না। মথুরবাবুর ঐরূপ পত্র পাইয়া সকলে তাঁহার আগমনের অপেক্ষায় উদ্গ্রীব হইয়া রহিল এবং "এইবারেই ভট্টাচার্য্য পদচ্যুত হইল, বাবু আসিয়াই তাহাকে দূর করিবেন—দেবতার নিকট অপরাধ, দেবতা কতদিন সহিবে বল?"—ইত্যাদি নানা জল্পনা তাহাদের মধ্যে চলিতে লাগিল।

ঠাকুরের পূজা দেখিয়া মথুর বাবুর আনন্দ ও আজ্ঞাপ্রদান।

মথুর বাবু কাহাকেও কিছু না জানাইয়া একদিন অকস্মাৎ সহসা আসিয়া কালীঘরে প্রবেশ করিলেন এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া ঠাকুরের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলেন। ভাবাবিষ্ট ঠাকুর একবারও তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না। পূজাকালে ঠাকুর এব-ং তিনি নিত্য তন্ময় হইয়া থাকিতেন, মন্দিরে কে আসিতেছে যাইতেছে সে বিষয়ে তাঁহার আদৌ জ্ঞান থাকিত না। মথুর আসিয়াই ঐ বিষয়টী বুঝিতে পারিলেন। পরে শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট তাঁহার বালকের ন্যায় আবদার অনুযোগ প্রভৃতি দেখিয়া উহা যে ঐকান্তিক প্রেমভক্তিপ্রসূত তাহাও বুঝিলেন। তাঁহার মনে হইল,—ঐরূপ অকপট ভক্তিবিশ্বাসে যদি মাকে না পাওয়া যায় ত কিসে তাঁহার দর্শন লাভ হইবে? পূজা করিতে করিতে ভট্টাচার্য্যের কখন গদ্গদপ্রেমধারা, কখন অকপট উদ্দাম উল্লাস এবং কখন বা জড়ের ন্যায় সংজ্ঞাশূন্যতা, অবিচলতা ও বাহ্যবিষয়ে

সম্পূর্ণ লক্ষ্যরাহিত্য দেখিয়া তাঁহার চিত্ত একটা অপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ হইল। তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন, শ্রীমন্দির দেবপ্রকাশে যথার্থই জম্ জম্ করিতেছে। তাঁহার স্থির বিশ্বাস হইল ভট্টাচার্য্য জগন্মাতার কৃপালাভে ধন্য হইয়াছেন। অনন্তর ভক্তিপূতচিত্তে সজল-নয়নে শ্রীশ্রীজগন্মাতা ও তাঁহার অপূর্ব্ব পূজককে দূর হইতে বারম্বার প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "এতদিনের পর ৺দেবী প্রতিষ্ঠা সার্থক হইল, এতদিনের পরে শ্রীশ্রীজগন্মাতা সত্যসত্যই এখানে আবির্ভূতা হইলেন, এতদিনে মা'র পূজা ঠিক ঠিক সম্পন্ন হইল।" কর্ম্মচারীদিগের কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি সে দিন বাটীতে ফিরিলেন। পর দিন মন্দিরের প্রধান কর্ম্মচারীর উপর তাঁহার নিয়োগ আসিল, 'ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে ভাবেই পূজা করুন না কেন, তাঁহাকে বাধা দিবে না।' *

প্রবল অনুরাগে ঠাকুরের রাগানুগা ভক্তিলাভ—ঐ ভক্তির ফল।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনাবলী শ্রবণ করিয়া পাঠক একথা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, বৈধী ভক্তির বিধিবদ্ধ সীমা অতিক্রম করিয়া ঠাকুরের মন এখন অহেতুক প্রেমভক্তির উচ্চ-মার্গে দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়াছিল। এমন সকল স্বাভাবিকভাবে ঐ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল যে, ঐ সকল কথা দূরে থাকুক তিনি নিজেও ঐ কথা তখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। কেবল বুঝিয়াছিলেন যে, জগন্মাতার প্রতি ভালবাসার প্রবল প্রেরণায় তিনি ঐরূপ চেষ্টাদি না করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না—কে যেন তাঁহাকে জোর করিয়া ঐরূপ করাইতেছে। ঐ জন্য দেখিতে পাওয়া যায়, মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে হইতেছে, 'আমার এ কি প্রকার অবস্থা

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—ষষ্ঠ অধ্যায়।

হইতেছে? আমি ঠিক পথে চলিতেছি ত?' ঐজন্য দেখা যায়, তিনি ব্যাকুলহৃদয়ে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে জানাইতেছেন—'মা আমার এইরূপ অবস্থা কেন হইতেছে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, তুই আমাকে যাহা করিবার করাইয়া ও যাহা শিখাইবার শিখাইয়া দেখা দে! সর্ব্বদা আমার হাত ধরিয়া থাক!' কাম কাঞ্চন, মান যশ, পৃথিবীর সমস্ত ভোগৈশ্বর্য্য হইতে মন ফিরাইয়া অন্তরের অন্তর হইতে তিনি জগন্মাতাকে ঐ কথা নিবেদন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতাও তাহাতে তাঁহার হস্ত ধরিয়া সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সাধক-জীবনের পরিপুষ্টি ও পূর্ণতার জন্য যখনি যাহা কিছু ও যেরূপ লোকের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল, তখনি ঐ সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে অযাচিতভাবে তাঁহার নিকটে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তির চরম সীমায় স্বাভাবিক সহজভাবে আরূঢ় করাইয়াছিলেন! গীতামুখে শ্রীভগবান্ ভক্তের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—

> অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
> তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥
>
> গীতা—৯ম—২২।

—যে সকল ব্যক্তি অনন্যচিত্তে উপাসনা করিয়া আমার সহিত নিত্য-যুক্ত হইয়া থাকে—শরীরধারণোপযোগী আহার-বিহারাদি বিষয়ের জন্যও চিন্তা না করিয়া সম্পূর্ণ মন আমাতে অর্পণ করে—প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ই আমি (অযাচিত হইয়াও) তাহাদিগের নিকট আনয়ন করিয়া থাকি। গীতার ঐ প্রতিজ্ঞা ঠাকুরের জীবনে কিরূপ বর্ণে বর্ণে সাফল্য লাভ করিয়াছিল তাহা আমরা ঠাকুরের এই সময়ের জীবন যত আলোচনা করিব তত সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইব। কামকাঞ্চনৈকলক্ষ্য স্বার্থপর বর্ত্তমান যুগে

শ্রীভগবানের ঐ প্রতিজ্ঞার সত্যতা সুস্পষ্টরূপে পুনঃপ্রমাণিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। যুগে যুগে সাধকেরা, "সব্ ছোড়ে সব্ পাওয়ে"—শ্রীভগবানের নিমিত্ত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিলে প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ের জন্য সাধককে অভাবগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পাইতে হয় না—একথা মানবকে উপদেশ দিয়া আসিলেও দুর্ব্বলহৃদয় বিষয়াবদ্ধ মানব তাহা বর্ত্তমান যুগে আবার পূর্ণভাবে না দেখিয়া বিশ্বাসী হইতে পারিতেছিল না। সেজন্য সম্পূর্ণরূপে অনন্যচিত্ত ঠাকুরকে লইয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার শাস্ত্রীয় ঐ বাক্যের সফলতা মানবকে দেখাইবার এই অদ্ভুত লীলাভিনয়। হে মানব, পূতচিত্তে একথা শ্রবণ করিয়া ত্যাগের পথে যথাসাধ্য অগ্রসর হও।

ঠাকুরের কথা—রাগাত্মিকা বা রাগানুগা ভক্তির পূর্ণ প্রভাব, কেবল অবতার পুরুষদিগের শরীরমন ধারণ করিতে সমর্থ।

ঠাকুর বলিতেন, ঈশ্বরীয় ভাবের প্রবল বন্যা যখন অতর্কিতভাবে মানবজীবনে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন তাহাকে চাপিবার সহস্র চেষ্টা করিলেও সফল হওয়া যায় না। মানব সাধারণের জড় দেহ, উহার প্রবল বেগ ধারণ করিতে সক্ষম না হইয়া এককালে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়। ঐরূপে অনেক সাধক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। পূর্ণজ্ঞান বা পূর্ণা ভক্তির উদ্দাম বেগ ধারণ করিবার উপযোগী শরীরের প্রয়োজন। অবতারপ্রথিত মহাপুরুষদিগের শরীরসকলকেই কেবলমাত্র উহার পূর্ণ বেগ সর্ব্বক্ষণ ধারণ করিয়া সংসারে জীবিত থাকিতে এপর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। ভক্তিশাস্ত্র সেজন্য তাঁহাদিগকে শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহবান্ বলিয়া বারম্বার নির্দ্দেশ করিয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বগুণরূপ উপাদানে গঠিত শরীর ধারণ করিয়া সংসারে আগমন করেন বলিয়াই তাঁহারা আধ্যাত্মিক ভাবসমূহের পূর্ণবেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন। ঐরূপ শরীর ধারণ করিয়াও তাঁহাদিগকে উহাদিগের প্রবল বেগে অনেক সময় মুহ্যমান হইতে দেখা গিয়া থাকে,

বিশেষতঃ ভক্তিমার্গ সঞ্চরণশীল অবতারপুরুষদিগকে। ভাব-ভক্তির প্রাবল্যে ঈশা ও শ্রীচৈতন্যের শরীরের অঙ্গগ্রন্থিসকল শিথিল হওয়া, ঘর্ম্মের ন্যায় শরীরের প্রতি রোমকূপ দিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া শোণিত নির্গত হওয়া প্রভৃতি শাস্ত্রনিবদ্ধ কথাতেই উহা বুঝিতে পারা যায়। ঐ সকল শারীরিক বিকার ক্লেশকর বলিয়া উপলব্ধ হইলেও উহাদের সহায়েই তাঁহাদিগের শরীর ভক্তিপ্রসূত অসাধারণ মানসিক বেগ ধারণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া আসে। পরে, ঐ বেগ ধারণে উহা ক্রমে যত অভ্যস্ত হয়, ঐ বিকৃতি সকলও তখন আর উহাতে পূর্ব্বের ন্যায় পরিলক্ষিত হয় না।

ঐ ভক্তিপ্রভাবে ঠাকুরের শারীরিক বিকার ও তজ্জনিত কষ্ট, যথা গাত্রদাহ। প্রথম গাত্রদাহ পাপপুরুষ দগ্ধ হইবার কালে; দ্বিতীয় প্রথম দর্শনলাভের পর ঈশ্বরবিরহে; তৃতীয় মধুরভাব সাধনকালে।

ভাব-ভক্তির প্রবল প্রেরণায় ঠাকুরের শরীরে এখন হইতে নানা প্রকারের অদ্ভুত বিকার সকল উপস্থিত হইয়াছিল। সাধনার প্রারম্ভ হইতে তাঁহার গাত্রদাহের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। উহা বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাকে অনেক সময় বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। ঠাকুর স্বয়ং আমাদের নিকটে অনেক সময় উহার কারণ এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন— "সন্ধ্যা-পূজাদি করিবার সময় শাস্ত্রবিধানানুসারে যখন ভিতরের পাপপুরুষ দগ্ধ হইয়া গেল এইরূপ চিন্তা করিতাম তখন কে জানিত, শরীরে সত্য সত্যই পাপপুরুষ আছে এবং উহাকে বাস্তবিক দগ্ধ ও নিষ্ট করা যায়। সাধনার প্রারম্ভ হইতে গাত্রদাহ উপস্থিত হইল, ভাবিলাম, এ আবার কি রোগ হইল। ক্রমে উহা খুব বাড়িয়া অসহ্য হইয়া উঠিল। নানা কবিরাজী তেল মাখা গেল; কিন্তু কিছুতেই উহা কমিল না। পরে একদিন পঞ্চবটীতে বসিয়া আছি; সহসা দেখছি কি—মিস কালো রঙ, আরক্তলোচন, ভীষণাকার একটা পুরুষ যেন মদ খাইয়া টলিতে

টলিতে (নিজ শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে বেড়াইতে লাগিল। পরক্ষণে দেখি কি—আর একজন সৌম্য-মূর্ত্তি পুরুষ গৈরিক ও ত্রিশূল ধারণ করিয়া ঐরূপে (শরীরের) ভিতর হইতে বাহির হইয়া পূর্ব্বোক্ত ভীষণাকার পুরুষকে সবলে আক্রমণ পূর্ব্বক নিহত করিল এবং ঐদিন হইতে গাত্রদাহ কমিয়া গেল। ঐ ঘটনার পূর্ব্বে ছয় মাস কাল গাত্রদাহে বিষম কষ্ট পাইয়াছিলাম।"

ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, পাপপুরুষ বিনষ্ট হইবার পরে গাত্রদাহ নিবারিত হইলেও অল্পকাল পরেই উহা আবার আরম্ভ হইয়াছিল। তখন বৈধী ভক্তির সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া তিনি রাগমার্গে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজাদিতে নিযুক্ত। ক্রমে উহা এত বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, ভিজা গামছা মাথায় দিয়া তিন চারি ঘণ্টাকাল গঙ্গাগর্ভে শরীর ডুবাইয়া রাখিয়াও তিনি শান্তিলাভ করিতে পারিতেন না। পরে ব্রাহ্মণী আসিয়া ঐ গাত্রদাহ, শ্রীভগবানের পূর্ণ দর্শনলাভের জন্য উৎকণ্ঠা ও বিরহবেদনাপ্রসূত বলিয়া নির্দেশ করিয়া যেরূপ সহজ উপায়ে উহা নিবারণ করেন, সে সকল কথা আমরা অন্যত্র বিবৃত করিয়াছি।* উহার পরে ঠাকুর মধুরভাব সাধন করিবার কাল হইতে আবার গাত্রদাহে পীড়িত হইয়াছিলেন। হৃদয় বলিত, "বুকের ভিতর এক মালসা আগুন রাখিলে যেরূপ উত্তাপ ও যন্ত্রণা হয়, ঠাকুর ঐকালে সেইরূপ অনুভব করিয়া অস্থির হইয়া পড়িতেন। মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া উহা তাঁহাকে বহুকাল পর্য্যন্ত কষ্ট দিয়াছিল। অনন্তর সাধনকালের কয়েক বৎসর পরে তিনি বারাসাতনিবাসী মোক্তার শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষালের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। ইনি উন্নত শক্তিসাধক ছিলেন এবং তাঁহার ঐরূপ দাহের কথা শুনিয়া তাঁহাকে ইষ্টকবচ অঙ্গে

* গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ—১ম অধ্যায়।

ধারণ করিতে পরামর্শ দিযাছিলেন। কবচধারণের পরে তিনি ঐরূপ দাহে আর কখন কষ্ট পান নাই।

পূজা করিতে করিতে বিষয়কর্ম্মের চিন্তার জন্য রাণী রাসমণিকে ঠাকুরের দণ্ড প্রদান।

ঠাকুরের ঐরূপ অদ্ভুত পূজা দেখিয়া জানবাজারে ফিরিয়া মথুরামোহন রাণী মাতাকে শুনাইলেন। ভক্তিমতী রাণী উহা শুনিয়া বিশেষ পুলকিতা হইলেন। ভট্টাচার্য্যের মুখনিঃসৃত ভক্তিমাখা সঙ্গীত শ্রবণে তিনি তাঁহার প্রতি ইতিপূর্ব্বেই স্নেহপরায়ণা ছিলেন এবং শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহ-ভগ্নকালে তাঁহার ভাবাবেশ ও ভক্তিপূত বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।* অতএব শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপালাভ যে, ঠাকুরের ন্যায় পবিত্র হৃদয়ের সম্ভবপর একথা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। ইহার অল্পকাল পরে কিন্তু এমন একটি ঘটনা উপস্থিত হইল যাহাতে রাণী ও মথুরবাবুর ঐ বিশ্বাস বিচলিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা হইয়াছিল। রাণী একদিন মন্দিরে শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শন ও পূজাদি করিবার কালে তদ্বিষয়ে তন্ময় না হইয়া বিষয়কর্ম্মসম্পর্কীয় একটি মামলার ফলাফল সাগ্রহে চিন্তা করিতেছিলেন। ঠাকুর তখন ঐস্থানে বসিয়া তাঁহাকে সঙ্গীত শুনাইতেছিলেন। ভাবাবিষ্ট ঠাকুর তাঁহার মনের কথা জানিতে পারিয়া, 'এখানেও ঐ চিন্তা'—বলিয়া তাঁহার কোমলাঙ্গে আঘাত পূর্ব্বক ঐ চিন্তা হইতে নিরস্তা হইতে শিক্ষাপ্রদান করেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতার কৃপাপাত্রী সাধিকা রাণী উহাতে নিজ মনের দুর্ব্বলতা ধরিতে পারিয়া অনুতপ্তা হইয়াছিলেন এবং ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভক্তি ঐ ঘটনায় বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐ সকল কথা আমরা অন্যত্র সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছি।*

---

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৫ম অধ্যায়।

শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে লইয়া ঠাকুরের ভাবাবেশ ও আনন্দোল্লাস উহার অল্পদিন পরে এত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল যে, দেবীসেবার নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যকলাপ কোনরূপে নির্ব্বাহ করাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতিতে বৈধী কর্ম্মের ত্যাগ কিরূপ স্বাভাবিক-ভাবে হইয়া থাকে তদ্বিষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপে ঠাকুর

ভক্তির পরিণতিতে ঠাকুরের বাহ্য পূজা ত্যাগ। এই কালে তাঁহার অবস্থা।

বলিতেন, 'যেমন গৃহস্থের বধূর যে পর্য্যন্ত গর্ভ না হয় ততদিন তাহার শ্বশ্রূ তাহাকে সকল জিনিষ খাইতে ও সকল কাজ করিতে দেয়; গর্ভ হইলেই ঐ সকল বিষয়ে একটু আধটু বাচবিচার আরম্ভ হয়; পরে গর্ভ যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই তাহার কাজ কমাইয়া দেওয়া হয়; ক্রমে যখন সে আসন্নপ্রসবা হয়, গর্ভস্থ শিশুর অনিষ্টাশঙ্কায় তখন তাহাকে আর কোন কার্য্যই করিতে দেওয়া হয় না; পরে যখন তাহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তখন ঐ সন্তানকে নাড়াচাড়া করিয়াই তাহার দিন কাটিতে থাকে।' শ্রীশ্রীজগদম্বার বাহ্যপূজা ও সেবাদি ত্যাগও ঠাকুরের ঠিক ঐরূপ স্বাভাবিকভাবে হইয়া আসিয়াছিল। পূজা ও সেবার কালাকাল বিচার তাঁহার এখন লোপ হইয়াছিল। ভাবাবেশে সর্ব্বদা বিভোর থাকিয়া তিনি এখন শ্রীশ্রীজগন্মাতার যখন যেরূপে সেবা করিবার ইচ্ছা হইত তখন সেইরূপই করিতেন। যথা—পূজা না করিয়াই হয়ত ভোগ নিবেদন করিয়া দিলেন! অথবা, ধ্যানে তন্ময় হইয়া আপনার পৃথগস্তিত্ব এককালে ভুলিয়া গিয়া দেবীপূজার নিমিত্ত আনীত পুষ্পচন্দনাদিতে নিজাঙ্গ ভূষিত করিয়া বসিলেন! ভিতরে বাহিরে নিরন্তর জগদম্বার দর্শনেই যে ঠাকুরের এই কালের কার্য্যকলাপ ঐরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, একথা আমরা তাঁহার নিকটে অনেক বার শ্রবণ করিয়াছি। আর শুনিয়াছি যে, ঐ তন্ময়তার অল্পমাত্র হ্রাস হইয়া যদি এই সময়ে

কয়েক দণ্ডের নিমিত্তও তিনি মাতৃদর্শনে বাধা প্রাপ্ত হইতেন ত এমন ব্যাকুলতা আসিয়া তাঁহাকে অধিকার করিয়া বসিত যে, আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িয়া মুখ ঘর্ষণ করিতে করিতে ব্যাকুল ক্রন্দনে দিক পূর্ণ করিতেন। শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া প্রাণ ছট্‌ফট্ করিত। আছাড় খাইয়া পড়িয়া সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরলিপ্ত হইয়া যাইতেছে, সে বিষয় লক্ষ্য হইত না। জলে পড়িলেন বা অগ্নিতে পড়িলেন, কখন কখন তাহারও জ্ঞান থাকিত না। পরক্ষণেই আবার শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শন পাইয়া ঐ ভাব কাটিয়া যাইত এবং তাঁহার মুখমণ্ডল অদ্ভুত জ্যোতিঃ ও উল্লাসে পূর্ণ হইত—তিনি যেন সম্পূর্ণ আর একব্যক্তি হইয়া যাইতেন।

পূজা ত্যাগের ও হৃদয়ের কথা এবং ঠাকুরের বর্ত্তমান অবস্থা-সম্বন্ধে মথুরের সন্দেহ।

ঠাকুরের ঐরূপ অবস্থালাভের পর পর্যন্ত মথুর বাবু তাঁহার দ্বারা পূজাকার্য্য কোনরূপে চালাইয়া লইতেছিলেন। এখন আর তদ্রূপ করা অসম্ভব বুঝিয়া পূজাকার্য্যের অন্যরূপ বন্দোবস্ত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। হৃদয় বলিত, "মথুর বাবুর ঐরূপ সঙ্কল্পের একটি কারণও উপস্থিত হইয়াছিল। পূজাসন হইতে সহসা উঠিয়া ভাবাবিষ্ট ঠাকুর একদিন মথুরবাবু ও আমাকে মন্দির-মধ্যে দেখিলেন, এবং আমার হাত ধরিয়া পূজাসনে বসাইয়া মথুর বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আজ হইতে হৃদয় পূজা করিবে; মা বলিতেছেন, আমার পূজার ন্যায় হৃদয়ের পূজা তিনি সমভাবে গ্রহণ করিবেন।' বিশ্বাসী মথুর ঠাকুরের ঐ কথা দেববাণী বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়াছিলেন।" হৃদয়ের ঐ কথা কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না; তবে বর্ত্তমান অবস্থায় ঠাকুরের নিত্য পূজাদি করা যে অসম্ভব, একথা মথুরের বুঝিতে বাকি ছিল না।

গঙ্গাপ্রসাদ সেন কবিরাজের চিকিৎসা।

প্রথমদর্শনকাল হইতে মথুর বাবুর মন ঠাকুরের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল, একথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। সেদিন হইতে তিনি সকল প্রকার অসুবিধা দূর করিয়া তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীতে রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। পরে ক্রমশঃ তাঁহাতে অদ্ভুত গুণরাশির যত পরিচয় পাইতেছিলেন ততই মুগ্ধ হইয়া তিনি আবশ্যকমত তাঁহার সেবা এবং অপরের অযথা অত্যাচার হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। যেমন,—ঠাকুরের দাহপ্রবল ধাতু জানিয়া মথুর নিত্য মিছরির সরবৎ পানের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন; রাগানুগা ভক্তিপ্রভাবে সাধারণ অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রণালীতে পূজায় প্রবৃত্ত হইলে বাধা পাইবার সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, ঐরূপ আরও অনেকগুলি কথার আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি।* কিন্তু রাণী রাসমণির অঙ্গে আঘাত করিয়া ঠাকুর যে দিন তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে মথুর সন্দিগ্ধ হইয়া তাঁহার বায়ুরোগ হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, একথা আমাদিগের সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। বোধ হয়, ঐ ঘটনায় তিনি তাঁহাতে আধ্যাত্মিকতার সহিত উন্মত্ততার সংযোগ অনুমান করিয়াছিলেন। কারণ, এই সময়ে তিনি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেনের দ্বারা তাঁহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

ঐরূপে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াই মথুর ক্ষান্ত হন নাই। কিন্তু নিজ মনকে সুসংযত রাখিয়া যাহাতে ঠাকুর সাধনায় অগ্রসর হন, তদনুকূলসহায়ে তাঁহাকে তদ্বিষয় বুঝাইতে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। লাল-জবাফুলের গাছে শ্বেত-জবা প্রস্ফুটিত হইতে দেখিয়া কিরূপে তিনি এখন পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৬ষ্ঠ অধ্যায়।

ঠাকুরের বশীভূত হইয়াছিলেন, সে সকল কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।*

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, মন্দিরের নিত্য নিয়মিত ৺দেবীসেবা ঠাকুরের দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া মথুরবাবু এখন অন্য বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ঠাকুরের খুল্লতাতপুত্র শ্রীযুক্ত রামতারক চট্টোপাধ্যায় এই সময়ে কর্ম্মান্বেষণে ঠাকুরবাটীতে উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাকেই তিনি, ঠাকুর আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত ৺দেবীপূজায় নিযুক্ত করিলেন। সন ১২৬৫ সালে, ইংরাজী ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ঐ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল।

হলধারীর আগমন।

রামতারককে ঠাকুর হলধারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। ইঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা তাঁহার নিকটে শুনিয়াছি। হলধারী সুপণ্ডিত ও নিষ্ঠাচারী সাধক ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত, অধ্যাত্ম রামায়ণাদি গ্রন্থসকল তিনি নিত্য পাঠ করিতেন। ৺বিষ্ণুপূজায় তাঁহার অধিক প্রীতি থাকিলেও ৺শক্তির উপর তাঁহার দ্বেষ ছিল না। সেজন্য বিষ্ণুভক্ত হইয়াও তিনি মথুরবাবুর অনুরোধে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। মথুর বাবুকে বলিয়া তিনি সিধা লইয়া নিত্য স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাইবার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। মথুরবাবু তাহাতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কেন, তোমার ভ্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভাগিনেয় হৃদয় ত ঠাকুর-বাড়ীতে প্রসাদ পাইতেছে ?" বুদ্ধিমান হলধারী তাহাতে বলেন, "আমার ভ্রাতার আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থা ; তাহার কিছুতেই দোষ নাই ; আমার ঐরূপ অবস্থা হয় নাই, সুতরাং নিষ্ঠাভঙ্গে দোষ হইবে।" মথুর বাবু তাঁহার ঐরূপ বাক্যে সন্তুষ্ট হন, এবং তদবধি হলধারী সিধা লইয়া পঞ্চবটীতলে নিত্য স্বপাকে ভোজন করিতেন।

শাক্তদ্বেষী না হইলেও হলধারীর ৺দেবীকে পশুবলি প্রদানে প্রবৃত্তি

---

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৬ষ্ঠ অধ্যায়।

হইত না। পূর্ব্বকালে ৺জগদম্বাকে পশুবলি প্রদান করা বিধি ঠাকুর-বাটীতে প্রচলিত থাকায় ঐ সকল দিবসে তিনি আনন্দে পূজা করিতে পারিতেন না। কথিত আছে, প্রায় এক মাস ঐরূপে ক্ষুণ্ণমনে পূজা করিবার পরে, হলধারী এক দিবস সন্ধ্যা করিতে বসিয়াছেন এমন সময় দেখিলেন, ৺দেবী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "আমার পূজা তোকে করিতে হইবে না; করিলে, সেবাপরাধে তোর সন্তানের মৃত্যু হইবে।" শুনা যায়, মাথার খেয়াল মনে করিয়া তিনি ঐ আদেশ প্রথমে গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু কিছু কাল পরে তাঁহার পুত্রের মৃত্যুসংবাদ যখন সত্য সত্য উপস্থিত হইল তখন ঠাকুরের নিকট ঐ বিষয় আদ্যোপান্ত বলিয়া তিনি ৺দেবীপূজায় বিরত হইয়াছিলেন। সেজন্য এখন হইতে তিনি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পূজা এবং হৃদয় ৺দেবীপূজা করিতে থাকেন। ঘটনাটি আমরা হৃদয়ের ভ্রাতা শ্রীযুত রাজারামের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলাম।

অষ্টম অধ্যায়।

প্রথম চারি বৎসরের শেষ কথা।

ঠাকুরের সাধনকালের আলোচনা করিতে হইলে, তিনি আমাদিগকে ঐ কালসম্বন্ধে নিজমুখে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই ঐ কালের ঘটনাবলীর যথাযথ সময় নির্দ্দেশ করা অসম্ভব হইবে না। পাঠককে আমরা বলিয়াছি, আমরা তাঁহার নিকট শুনিয়াছি, তিনি দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল নিরন্তর নানা মতের সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। রাণী রাসমণির মন্দির-সংক্রান্ত দেবোত্তর দানপত্র দর্শনে সাব্যস্ত হয়, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী সন ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৩১ মে তারিখে বৃহস্পতিবারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ ঘটনার কয়েক মাস পরে সন ১২৬২ সালেই ঠাকুর পূজকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব সন ১২৬২ হইতে সন ১২৭৩ সাল পর্য্যন্তই যে তাঁহার সাধনকাল, একথা সুনিশ্চিত। উক্ত দ্বাদশ বৎসর ঠাকুরের সাধনকাল বলিয়া বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট হইলেও উহার পরে তীর্থদর্শনে গমন করিয়া ঐ সকল স্থলে এবং তথা হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া তিনি কখন কখন কিছুকালের জন্য সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, আমরা দেখিতে পাইব।

সাধনকালের সময় নিরূপণ।

পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ বৎসরকে তিনভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক অংশের আলোচনা করিতে আমরা অগ্রসর হইয়াছি। প্রথম ১২৬২ হইতে ১২৬৫, চারি বৎসর—ঐ কালের প্রধান প্রধান কথার আমরা

ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। দ্বিতীয়, ১২৬৬ হইতে ১২৬৯ পর্য্যন্ত, চারি বৎসর—যে কালে ঠাকুর, ব্রাহ্মণীর নির্দ্দেশে গোকুলব্রত হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গদেশে প্রচলিত চৌসট্টিখানা প্রধান তন্ত্রনির্দ্দিষ্ট সাধন-সকল যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৃতীয় ১২৭০ হইতে ১২৭৩ পর্য্যন্ত, চারি বৎসর—যে কালে তিনি 'জটাধারী' নামক রামাইত সাধুর নিকট হইতে রামমন্ত্রে উপদিষ্ট হন ও শ্রীশ্রীরামলালাবিগ্রহ লাভ করেন, বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত মধুরভাবে সিদ্ধিলাভের জন্য ছয়মাস কাল স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া থাকেন, আচার্য্য শ্রীতোতাপুরীর নিকট হইতে সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক সমাধির নির্ব্বিকল্প ভূমিতে আরোহণ করেন এবং পরিশেষে শ্রীযুক্ত গোবিন্দের নিকট হইতে ইসলামী ধর্ম্মে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত দ্বাদশ বৎসরের ভিতরেই তিনি বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত সখ্যভাবের এবং কর্ত্তাভজা, নবরসিক প্রভৃতি বৈষ্ণব মতের অবান্তর সম্প্রদায়সকলের সাধন-মার্গের সহিতও পরিচিত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ের মতের সহিতই তিনি যে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন, একথা বৈষ্ণব-চরণ গোস্বামী প্রমুখ ঐ সকল পথের সাধকবর্গের তাঁহার নিকট আধ্যাত্মিক সহায়তা লাভের জন্য আগমনে স্পষ্ট বুঝা যায়। ঠাকুরের সাধনকালকে পূর্ব্বোক্তরূপে তিনভাগে ভাগ করিয়া অনুধাবন করিয়া দেখিলে ঐ তিন ভাগের প্রত্যেকটিতে অনুষ্ঠিত তাঁহার সাধন-সকলের মধ্যে একটা শ্রেণীগত বিভিন্নতা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ঐ কালের তিনটি প্রধান বিভাগ।

আমরা দেখিয়াছি—সাধনকালের প্রথমভাগে ঠাকুর বহিরের সহায়ের মধ্যে কেবল শ্রীযুক্ত কেনারাম ভট্টের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরলাভের জন্য অন্তরের ব্যাকুলতাই ঐকালে

তাঁহার একমাত্র সহায় হইয়াছিল। উহাই প্রবল হইয়া অচিরকাল মধ্যে তাঁহার শরীরমনে অশেষ পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়াছিল। উপাস্যের প্রতি অসীম ভালবাসা আনয়নপূর্ব্বক উহাই তাঁহাকে বৈধী ভক্তির নিয়মাবলী উল্লঙ্ঘন করাইয়া ক্রমে রাগানুগা ভক্তিপথে অগ্রসর করিয়াছিল এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার প্রত্যক্ষ দর্শনে ধনী করিয়া যোগ-বিভূতিসম্পন্নও করিয়া তুলিয়াছিল।

সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুরের অবস্থা ও দর্শনাদির পুনরাবৃত্তি।

পাঠক হয়ত বলিবেন—'তবে আর বাকি রহিল কি?—ঐকালেই ত ঠাকুর যোগসিদ্ধি ও ঈশ্বরলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন; তবে পরে আবার সাধন কেন?' উত্তরে বলিতে হয়—একভাবে ঐ কথা যথার্থ হইলেও পরবর্ত্তীকালে সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার তাঁহার অন্য প্রয়োজন ছিল। ঠাকুর বলিতেন—'বৃক্ষ ও লতা সকলের সাধারণ নিয়মে আগে ফুল পরে ফল হইয়া থাকে; উহাদের কোন কোনটি কিন্তু এমন আছে যাহাদিগের আগেই ফল দেখা দিয়া পরে ফুল দেখা দেয়!' সাধনক্ষেত্রে ঠাকুরের মনের বিকাশও ঠিক ঐরূপভাবে হইয়াছিল। এজন্য পাঠকের পূর্ব্বোক্ত কথাটা আমরা এক ভাবে সত্য বলিতেছি। কিন্তু সাধনকালের প্রথম ভাগে তাঁহার অদ্ভুত প্রত্যক্ষ ও জগদম্বার দর্শনাদি উপস্থিত হইলেও ঐ সকলকে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ সাধককুলের উপলব্ধির সহিত যতক্ষণ না মিলাইতে পারিতেছিলেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ সকলের সত্যতা এবং উহাদিগের চরম সীমা সম্বন্ধে তিনি দৃঢ়নিশ্চয় হইতে পারিতেছিলেন না। কেবলমাত্র অন্তরের ব্যাকুলতাসহায়ে যাহা তিনি ইতিপূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহাই আবার পূর্ব্বোক্ত কারণে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ ও

ঐকালে শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শনলাভ হইবার পর ঠাকুরকে আবার সাধন কেন করিতে হইয়াছিল। গুরূপদেশ শাস্ত্রবাক্য ও নিজ কৃত প্রত্যক্ষের একতাদর্শনে শান্তিলাভ।

প্রণালী অবলম্বনে প্রত্যক্ষ করিবার তাঁহার প্রয়োজন হইয়াছিল। শাস্ত্র বলেন, গুরুমুখে শ্রুত অনুভব ও শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের সাধককুলের অনুভবের সহিত সাধক আপন ধর্ম্মজীবনের দিব্যদর্শন ও অলৌকিক অনুভবসকল যতক্ষণ না মিলাইয়া সমসমান বলিয়া দেখিতে পায় ততক্ষণ সে এককালে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। ঐ তিনটি বিষয়কে মিলাইয়া এক বলিয়া দেখিতে পাইবামাত্র সে সর্ব্বতোভাবে ছিন্নসংশয় হইয়া পূর্ণ শান্তির অধিকারী হয়।

ব্যাসপুত্র শুকদেব গোস্বামীর ঐরূপ হইবার কথা।

পূর্ব্বোক্ত কথার দৃষ্টান্ত-স্বরূপে আমরা পাঠককে ব্যাসপুত্র পরম-হংসাগ্রণী শ্রীযুক্ত শুকদেব গোস্বামীর জীবন ঘটনা নির্দ্দেশ করিতে পারি। মায়ারহিত শুকের জীবনে জন্মাবধি নানাপ্রকার দিব্য দর্শন ও অনুভব উপস্থিত হইত। কিন্তু পূর্ণজ্ঞানলাভে কৃতার্থ হইয়াছেন বলিয়াই যে তাঁহার ঐরূপ হয় তাহা তিনি ধারণা করিতে পারিতেন না। মহামতি ব্যাসের নিকট বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া শুক একদিন পিতাকে বলিলেন, শাস্ত্রে যে সকল অবস্থার কথা লিপিবদ্ধ আছে তাহা আমি আজন্ম অনুভব করিতেছি; তথাপি আধ্যাত্মিক রাজ্যের চরম সত্য উপলব্ধি করিয়াছি কিনা তদ্বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইতে পারিতেছি না; অতএব ঐ বিষয়ে আপনি যাহা জ্ঞাত আছেন তাহা আমাকে বলুন। ব্যাস ভাবিলেন, শুককে আমি আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও চরম সত্যসম্বন্ধে সতত উপদেশ দিয়াছি তথাপি তাহার মন হইতে সন্দেহ দূর হয় নাই; সে মনে করিতেছে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিলে সে সংসার ত্যাগ করিবে ভাবিয়া স্নেহের বশ-বর্ত্তী হইয়া অথবা অন্য কোন কারণে আমি তাহাকে সকল কথা বলি নাই, সুতরাং অন্য কোন মনীষী ব্যক্তির নিকটে তাহার ঐ বিষয় শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ঐরূপ চিন্তাপূর্ব্বক ব্যাস বলিলেন, আমি

তোমার ঐ সন্দেহ নিরসনে অসমর্থ; মিথিলার বিদেহরাজ জনকের যথার্থ জ্ঞানী বলিয়া প্রতিপত্তির কথা তোমার অবিদিত নাই; তাঁহার নিকটে গমন করিয়া তুমি সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লও। শুক পিতার ঐ কথা শুনিয়া অবিলম্বে মিথিলা গমন করিয়াছিলেন এবং রাজর্ষি জনকের নিকট ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের যেরূপ অনুভূতি উপস্থিত হয় শুনিয়া, গুরূপদেশ, শাস্ত্রবাক্য ও নিজ জীবনানুভবের ঐক্য দেখিয়া শান্তিলাভ করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের সাধনার অন্য কারণ স্বার্থ নহে—পরার্থ।

পূর্ব্বোক্ত কারণ ভিন্ন, ঠাকুরের বার বার সাধনার অন্য গভীর কারণসমূহও ছিল। ঐ সকলের উল্লেখমাত্রই আমরা এখানে করিতে পারিব। শান্তিলাভ করিয়া স্বয়ং কৃতার্থ হইবেন কেবলমাত্র ইহাই ঠাকুরের সাধনার উদ্দেশ্য ছিল না। শ্রীশ্রীজগন্মাতা তাঁহাকে জগতের কল্যাণের জন্য শরীর-পরিগ্রহ করাইয়াছিলেন। সেজন্যই পরস্পর বিবদমান ধর্ম্মমত সকলের অনুষ্ঠান করিয়া সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের অদ্ভুত প্রয়াস তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। সুতরাং সমগ্র আধ্যাত্মিক জগতের আচার্য্য-পদবী গ্রহণের জন্য তাঁহাকে সকল প্রধান ধর্ম্মমতের সাধনার ও তাহাদিগের চরমোদ্দেশ্যের সহিত পরিচিত হইতে হইয়াছিল একথা বলা যাইতে পারে। শুদ্ধ তাহাই নহে, কেবলমাত্র অনুষ্ঠান-সহায়ে তাঁহার ন্যায় নিরক্ষর পুরুষের জীবনে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ অবস্থা-সকলের উদয় করিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বা ঠাকুরের দ্বারা বর্ত্তমান যুগে বেদ, বাইবেল, পুরাণ, কোরাণাদি সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের সত্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেজন্যও স্বয়ং শান্তিলাভ করিবার পরে তাঁহার সাধনার বিরাম হয় নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মমতের সিদ্ধপুরুষ ও পণ্ডিতসকলকে যথাকালে দক্ষিণেশ্বরে আনয়নপূর্ব্বক বাধতীয়

ধর্ম্মমতের সাধনানুষ্ঠানের শাস্ত্রসকল শ্রবণ করিবার অধিকার যে, জগন্মাতা ঠাকুরকে পূর্ব্বোক্ত প্রয়োজনবিশেষ সাধনের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন একথা আমরা তাঁহার অদ্ভুত জীবনালোচনায় যত অগ্রসর হইব ততই স্পষ্ট বুঝিতে পারিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঈশ্বরদর্শনের জন্য অন্তরের ব্যাকুল আগ্রহই ঠাকুরের প্রধান অবলম্বনীয় হইয়াছিল। এমন কোন লোক ঐ সময়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হন নাই যিনি তাঁহাকে সকল বিষয়ে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধিবদ্ধ পথে সঞ্চালিত করিয়া সাধনায় উন্নতির দিকে অগ্রসর করাইবেন। সুতরাং সকল সাধনপ্রণালীর অন্তর্গত তীব্র আগ্রহরূপ সাধারণ বিধিই তখন তাঁহার একমাত্র অবলম্বনীয় হইয়াছিল। কেবলমাত্র উহার সহায়ে ঠাকুরের ৺জগদম্বার দর্শনলাভ হওয়ায় ইহাও প্রমাণিত হয় যে, বাহ্য কোন বিষয়ের সহায়তা না পাইলেও একমাত্র ব্যাকুলতা থাকিলেই সাধকের ঈশ্বরলাভ হইতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র উহার সহায়ে সিদ্ধকাম হইতে হইলে ঐ ব্যাকুলাগ্রহের পরিমাণ যে কত অধিক হওয়া আবশ্যক তাহা আমরা অনেক সময় অনুধাবন করিতে ভুলিয়া যাই। ঠাকুরের এই সময়ের জীবনালোচনা করিলে ঐ কথা আমাদিগের স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। আমরা দেখিয়াছি, তীব্র ব্যাকুলতার প্রেরণায় তাঁহার আহার, নিদ্রা, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়-বদ্ধ সংস্কার ও অভ্যাস সকল যেন কোথায় লুপ্ত হইয়াছিল; এবং শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষা দূরে থাকুক, জীবনরক্ষার দিকেও কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না। ঠাকুর বলিতেন, "শরীরসংস্কারের দিকে মন আদৌ না থাকায় ঐ কালে মস্তকের কেশ বড় হইয়া ধুলা মাটি লাগিয়া আপনা

...থা ; ব্যাকুলতার উদয়ে সাধকের ঈশ্বরলাভ। ঠাকুরের জীবনে ঐ ব্যাকুলতা কতদূর উপস্থিত হইয়াছিল।

আপনি জটা পাকাইয়া গিয়াছিল। ধ্যান করিতে বসিলে মনের একাগ্রতায় শরীরটা এমন স্থাণুবৎ স্থির হইয়া থাকিত যে পক্ষিসকল জড়পদার্থজ্ঞানে নিঃসঙ্কোচে মাথার উপর আসিয়া বসিয়া থাকিত এবং কেশমধ্যগত ধূলিরাশি চঞ্চুদ্বারা নাড়িয়া চাড়িয়া তন্মধ্যে তণ্ডুলকণার অন্বেষণ করিত! আবার সময়ে সময়ে ভগবদ্বিরহে অধীর হইয়া ভূমিতে এমন মুখঘর্ষণ করিতাম যে কাটিয়া যাইয়া স্থানে স্থানে রক্ত বাহির হইত। ঐরূপে ধ্যান, ভজন, প্রার্থনা, আত্মনিবেদনাদিতে সমস্ত দিন যে কোথা দিয়া এসময়ে চলিয়া যাইত তাহার হুঁসই থাকিত না। পরে সন্ধ্যাসমাগমে যখন চারিদিকে শঙ্খঘণ্টারধ্বনি হইতে থাকিত তখন মনে পড়িত—দিবা অবসান হইল, আর একটা দিন বৃথা চলিয়া গেল, মার দেখা পাইলাম না। তখন তীব্র আক্ষেপ আসিয়া প্রাণ এমন ব্যাকুল করিয়া তুলিত যে, আর স্থির থাকিতে পারিতাম না; আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িয়া 'মা, এখনও দেখা দিলি না' বলিয়া চীৎকার ক্রন্দনে দিক পূর্ণ করিতাম ও যন্ত্রণায় ছটফট করিতাম। লোকে বলিত, 'পেটে শূলব্যথা ধরিয়াছে তাই অত কাঁদিতেছে'।"

আমরা যখন ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছি তখন সময়ে সময়ে তিনি আমাদিগকে ঈশ্বরের জন্য প্রাণে তীব্র ব্যাকুলতার প্রয়োজন বুঝাইতে সাধনকালের পূর্ব্বোক্ত কথাসকল শুনাইয়া আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "লোকে পত্নীপুত্রাদির মৃত্যুতে বা বিষয়সম্পত্তি হারাইয়া ঘটী ঘটী চোখের জল ফেলে; কিন্তু ঈশ্বর লাভ হইল না বলিয়া কে আর ঐরূপ করে বল? অথচ বলে, 'তাঁহাকে এত ডাকিলাম, তত্রাচ তিনি দর্শন দিলেন না।' ঈশ্বরের জন্য ঐরূপ ব্যাকুলভাবে একবার ক্রন্দন করুক দেখি, কেমন না তিনি দর্শন দেন!" কথাগুলি আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত করিত; শুনিলেই বুঝা যাইত, তিনি নিজ জীবনে ঐ কথা সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়াই অত নিঃসংশয়ে উহা বলিতে পারিতেছেন।

সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুর ৺জগদম্বার দর্শন মাত্র করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। ভাবমুখে শ্রীশ্রীজগন্মাতার দর্শন লাভের পর নিজ কুলদেবতা ৺রঘুবীরের দিকে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। হনুমানের ন্যায় অনন্য-ভক্তিতেই শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনলাভ সম্ভবপর বুঝিয়া দাস্য ভক্তিতে সিদ্ধ হইবার জন্য তিনি এখন আপনাতে মহাবীরের ভাবারোপ করিয়া কিছু দিনের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নিরন্তর মহাবীরের চিন্তা করিতে করিতে এই সময়ে তিনি ঐ আদর্শে এতদূর তন্ময় হইয়াছিলেন যে, আপনার পৃথক্ অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বের কথা কিছুকালের জন্য একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "ঐ সময়ে আহারবিহারাদি সকল কার্য্য হনুমানের ন্যায় করিতে হইত—ইচ্ছা করিয়া যে করিতাম তাহা নহে, আপনা আপনিই হইয়া পড়িত। পরিবার কাপড়খানাকে লেজের মত করিয়া কোমরে জড়াইয়া বাঁধিতাম, উল্লম্ফনে চলিতাম, ফলমূলাদি ভিন্ন অপর কিছুই খাইতাম না—তাহাও আবার খোসা ফেলিয়া খাইতে প্রবৃত্তি হইত না, বৃক্ষের উপরেই অনেক সময় অতিবাহিত করিতাম, এবং নিরন্তর 'রঘুবীর, রঘুবীর,' বলিয়া গম্ভীর স্বরে চীৎকার করিতাম। চক্ষুদ্বয় তখন সর্ব্বদা চঞ্চল ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, মেরুদণ্ডের শেষ ভাগটা ঐ সময়ে প্রায় এক ইঞ্চি বাড়িয়া গিয়াছিল।"* শেষোক্ত কথাটি শুনিয়া, আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মহাশয়, আপনার শরীরের ঐ অংশ কি এখনও ঐরূপ আছে?" উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "না; মনের উপর হইতে ঐ ভাবের প্রভুত্ব চলিয়া যাইবার পরে কালে উহা ধীরে ধীরে পূর্ব্বের ন্যায় স্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে।"

মহাবীরের পদানুগ হইয়া ঠাকুরের দাস্য ভক্তি সাধনা।

* Enlargement of the Coccyx.

দাস্যভক্তি সাধনকালে ঠাকুরের জীবনে এক অদ্ভুতপূর্ব্ব দর্শন ও অনুভব আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ দর্শন ও অনুভব, তাঁহার ইতিপূর্ব্বের দর্শনপ্রত্যক্ষাদি হইতে এত নূতন ধরণের ছিল যে, উহা তাঁহার মনে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া স্মৃতিতে সর্ব্বক্ষণ জাগরূক ছিল। তিনি বলিতেন, "এইকালে পঞ্চবটীতলে একদিন বসিয়া আছি—ধ্যানচিন্তা কিছু যে করিতেছিলাম তাহা নহে, অমনি বসিয়া ছিলাম—এমন সময়ে নিরুপমা জ্যোতির্ম্ময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি অদূরে আবির্ভূতা হইয়া স্থানটিকে আলোকিত করিয়া তুলিল। ঐ মূর্ত্তিটিকেই তখন যে কেবল দেখিতে পাইতেছিলাম তাহা নহে, পঞ্চবটীর গাছ, পালা, গঙ্গা ইত্যাদি সকল পদার্থই দেখিতে পাইতেছিলাম। দেখিলাম, মূর্ত্তিটি মানবীর, কারণ উহা দেবীদিগের ন্যায় ত্রিনয়নসম্পন্না নহে। কিন্তু প্রেম-দুঃখ-করুণা-সহিষ্ণুতাপূর্ণ সেই মুখের ন্যায় অপূর্ব্ব ওজস্বী গম্ভীর-ভাব দেবীমূর্ত্তিসকলেও সচরাচর দেখা যায় না! প্রসন্নদৃষ্টিপাতে মোহিত করিয়া ঐ দেবী-মানবী ধীর মন্থর পদে উত্তর দিক হইতে দক্ষিণে, আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন! স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেছি, 'কে ইনি?'—এমন সময়ে একটা হনুমান কোথা হইতে সহসা উপ্ উপ্ শব্দ করিয়া আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল এবং ভিতর হইতে মন বলিয়া উঠিল 'সীতা, জনম-দুঃখিনী সীতা, জনকরাজ-নন্দিনী সীতা, রামময়জীবিতা সীতা!' তখন 'মা' 'মা' বলিয়া অধীর হইয়া পদে নিপতিত হইতে যাইতেছি এমন সময় তিনি চকিতের ন্যায় আসিয়া (নিজ শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর প্রবিষ্ট হইলেন!—আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া গেলাম। ধ্যানচিন্তাদি কিছু না করিয়া এমনভাবে কোন দর্শন ইতিপূর্ব্বে আর হয় নাই। জনম-দুঃখিনী সীতাকে

দাস্যভক্তি সাধনকালে শ্রীশ্রীসীতাদেবীর দর্শন লাভ বিবরণ।

সর্ব্বাগ্রে দেখিয়াছিলাম বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার ন্যায় আজন্ম দুঃখ ভোগ করিতেছি।"

তপস্যার উপযুক্ত পবিত্র ভূমির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া ঠাকুর এই সময়ে হৃদয়ের নিকট নূতন একটি পঞ্চবটীর* স্থাপনের বাসনা প্রকাশ করেন। হৃদয় বলিত, "পঞ্চবটীর নিকটবর্ত্তী হাঁসপুকুর নামক ক্ষুদ্র পুষ্করিণীটি তখন ঝালান হইয়াছে এবং পুরাতন পঞ্চবটীর নিকটস্থ নিম্ন জমিগুলি ঐ মাটিতে ভরাট করিয়া সমতল করান হওয়ায় ঠাকুর ইতিপূর্ব্বে যে আমলকী বৃক্ষের নিম্নে ধ্যান করিতেন তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" অনন্তর এখন যেখানে সাধন-কুটীর আছে তাহার পশ্চিমে ঠাকুর স্বহস্তে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করিয়া হৃদয়কে দিয়া বট অশোক বেল ও আমলকী বৃক্ষের চারা রোপণ করাইলেন এবং তুলসী ও অপরাজিতার অনেকগুলি চারা পুতিয়া সমগ্র স্থানটিকে বেষ্টন করাইয়া লইলেন। গরু ছাগলের হস্ত হইতে ঐ সকল চারা গাছগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য যে অদ্ভুত উপায়ে তিনি 'ভর্ত্তাভারী' নামক ঠাকুরবাটীর উদ্যানের জনৈক মালীর সাহায্যে ঐ স্থানে বেড়া লাগাইয়া লইয়াছিলেন তাহা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি।† ঠাকুরের যত্ন এবং নিয়মিত জলসিঞ্চনে তুলসী ও

ঠাকুরের স্বহস্তে পঞ্চবটী রোপণ।

* অশ্বত্থবিল্ববৃক্ষঞ্চ বটধাত্রী অশোককম্।
বটীপঞ্চকমিত্যুক্তং স্থাপয়েৎ পঞ্চদিক্ষু চ॥
অশ্বত্থং স্থাপয়েৎ প্রাচি বিল্বঞ্চ উত্তরভাগতঃ।
বটং পশ্চিমভাগে তু ধাত্রীং দক্ষিণতস্তথা॥
অশোকং বহ্নিদিক্‌স্থাপ্যং তপস্যার্থং সুরেশ্বরী।
মধ্যে বেদীং চতুর্হস্তাং সুন্দরীং সুমনোহরাম্॥
ইতি—স্কন্দপুরাণ।

† গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়।

অপরাজিতা গাছগুলি অতি শীঘ্রই এত বড় ও নিবিড় হইয়া উঠে যে, উহার ভিতরে বসিয়া যখন তিনি ধ্যান করিতেন, তখন ঐ স্থানের বাহিরের ব্যক্তিরা তাঁহাকে কিছুমাত্র দেখিতে পাইত না।

কালীবাটি প্রতিষ্ঠার কথা জানাজানি হইবার পরে গঙ্গাসাগর ও ৺জগন্নাথ দর্শনপ্রয়াসী পথিক সাধুকুল, ঐ তীর্থদ্বয়ে যাইবার কালে, কয়েকদিনের জন্য শ্রদ্ধাসম্পন্না রাণীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীতে বিশ্রাম করিয়া যাইতে আরম্ভ করেন। * ঠাকুর বলিতেন, ঐরূপে অনেক সাধক ও সিদ্ধপুরুষেরা এখানে পদার্পণ করিয়াছেন। ইঁহাদিগের কাহারও নিকট হইতে উপদিষ্ট হইয়া ঠাকুর এইকালে প্রাণায়ামাদি হঠযোগের ক্রিয়াসকল অভ্যাস করিতেন বলিয়া বোধ হয়। হলধারী-সম্পর্কীয় নিম্নলিখিত ঘটনাটি বলিতে বলিতে একদিন তিনি আমাদিগকে ঐ বিষয় ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। হঠযোগোক্ত ক্রিয়াসকল স্বয়ং অভ্যাসপূর্ব্বক উহাদিগের ফলাফল প্রত্যক্ষ করিয়াই তিনি পরজীবনে আমাদিগকে ঐ সকল অভ্যাস করিতে নিষেধ করিতেন। আমাদিগের জানা আছে, ঐ বিষয়ে উপদেশ লাভের জন্য কেহ কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া উত্তর পাইয়াছেন—"ও সকল সাধন একালের পক্ষে নয়। কলিতে জীব অল্পায়ু ও অন্নগতপ্রাণ ; এখন হঠযোগ অভ্যাসপূর্ব্বক শরীর দৃঢ় করিয়া লইয়া রাজযোগ সহায়ে ঈশ্বরকে ডাকিবে, তাহার সময় কোথায়? হঠযোগের ক্রিয়াসকল অভ্যাস করিতে হইলে সিদ্ধ গুরুর সঙ্গে নিরন্তর থাকিতে হয় এবং আহারবিহারাদি সকল বিষয়ে তাঁহার উপদেশ লইয়া কঠোর নিয়মসকল রক্ষা করিতে হয়। নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রমে শরীরে ব্যাধি উপস্থিত এবং অনেক সময়ে সাধকের মৃত্যুও

ঠাকুরের হঠযোগ অভ্যাস।

* গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়।

হইয়া থাকে। সেজন্য ঐসকল করিবার আবশ্যকতা নাই। মন নিরোধের জন্যই ত প্রাণায়াম ও কুম্ভকাদি করিয়া বায়ু নিরোধ করা? ঈশ্বরের ভক্তিসংযুক্ত ধ্যানে মন ও বায়ু উভয়ই স্বতঃনিরুদ্ধ হইয়া আসিবে। কলিতে জীব অল্পায়ু ও অল্পশক্তি বলিয়া ভগবান্ কৃপা করিয়া তাহার জন্য ঈশ্বরলাভের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। স্ত্রী পুত্রের বিয়োগে প্রাণে যেরূপ ব্যাকুলতা ও অভাববোধ আসে, ঈশ্বরের জন্য সেইরূপ ব্যাকুলতা চব্বিশ ঘণ্টা মাত্র কাহারও প্রাণে স্থায়ী হইলে তিনি তাঁহাকে একালে দেখা দিবেনই দিবেন।"

হলধারীর অভিশাপ।

লীলাপ্রসঙ্গের অন্যত্র এক স্থলে আমরা পাঠককে বলিয়াছি, ভারতের বর্ত্তমানকালে স্মৃতানুসারী সাধক ভক্তেরা প্রায়ই অনুষ্ঠানে তন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত ঐরূপ ব্যক্তিরা প্রায়ই পরকীয়া প্রেমসাধনরূপ পথে ধাবিত হন।* বৈষ্ণব মতে প্রীতিসম্পন্ন হলধারীও ৺রাধাগোবিন্দজীর পূজায় নিযুক্ত হইবার কিছুকাল পরে গোপনে পূর্ব্বোক্ত-সাধনপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। লোকে ঐ কথা জানিতে পারিয়া কাণাকাণি করিতে থাকে; কিন্তু হলধারী বাক্‌সিদ্ধ অর্থাৎ যাহাকে যাহা বলিবে তাহাই হইবে, এইরূপ একটা প্রসিদ্ধি থাকায় কোপে পড়িবার আশঙ্কায় তাঁহার সম্মুখে ঐ কথা আলোচনা বা হাস্য-পরিহাসাদি করিতে সহসা কেহ সাহসী হইত না। অগ্রজের সম্বন্ধে ঐকথা ক্রমে ঠাকুর জানিতে পারিলেন এবং ভিতরে ভিতরে জল্পনা করিয়া লোকে তাঁহার নিন্দাবাদ করিতেছে দেখিয়া তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। হলধারী তাহাতে তাঁহার ঐরূপ ব্যবহারের বিপরীত অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক সাতিশয় রুষ্ট হইয়া বলিলেন—"কনিষ্ঠ হইয়া তুই আমাকে অবজ্ঞা করিলি? তোর

* গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ, প্রথম অধ্যায়।

মুখ দিয়া রক্ত উঠিবে।" ঠাকুর তাঁহাকে নানারূপে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিলেও তিনি সে সময়ে কোন কথা শ্রবণ করিলেন না।

উক্ত অভিশাপ কিরূপে সফল হইয়াছিল।

ঐ ঘটনার কিছুকাল পরে এক দিন রাত্রি চারিটা আন্দাজ সময়ে ঠাকুরের তালুদেশ সহসা সাতিশয় সড়্ সড়্ করিয়া মুখ দিয়া সত্য সত্যই রক্ত বাহির হইতে লাগিল। ঠাকুর বলিতেন—"সিম পাতার রসের মত তার মিস্ কাল রং—এত গাঢ় যে কতক বাহিরে পড়িতে লাগিল এবং কতক মুখের ভিতরে জমিয়া গিয়া সম্মুখের দাঁতের অগ্রভাগ হইতে বটের জটের মত ঝুলিতে লাগিল। মুখের ভিতর কাপড় দিয়া চাপিয়া ধরিয়া রক্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তথাপি থামিল না দেখিয়া বড় ভয় হইল। সংবাদ পাইয়া সকলে ছুটিয়া আসিল। হলধারী তখন মন্দিরে সেবার কাজ সারিতেছিল; ঐ সংবাদে সেও শশব্যস্তে আসিয়া পড়িল। তাকে বলিলাম, 'দাদা, শাপ দিয়া তুমি আমার এ কি অবস্থা করলে, দেখ দেখি?' আমার কাতরতা দেখিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

"ঠাকুরবাড়ীতে সে দিন একজন প্রাচীন বিজ্ঞ সাধু আসিয়াছিলেন গোলমাল শুনিয়া তিনিও আমাকে দেখিতে আসিলেন এবং রক্তের রং ও মুখের ভিতরের যে স্থানটা হইতে উহা নির্গত হইতেছে তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—'ভয় নাই, রক্ত বাহির হইয়া বড় ভালই হইয়াছে। দেখিতেছি, তুমি যোগসাধনা করিতে। হঠযোগের চরমে জড়সমাধি হয়, তোমারও তদ্রূপ হইতেছিল—সুষুম্নাদ্বার খুলিয়া যাইয়া শরীরের রক্ত মাথায় উঠিতেছিল। মাথায় না উঠিয়া উহা যে এইরূপে মুখের ভিতর একটা নির্গত হইবার পথ আপনা আপনি করিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল ইহাতে বড়ই ভাল হইল। কারণ, জড়সমাধি হইলে উহা কিছুতেই ভাঙ্গিত না।

তোমার শরীরটার দ্বারা ৺জগন্মাতার বিশেষ কোন কার্য্য আছে; তাই তিনি তোমাকে এইরূপে রক্ষা করিলেন। সাধুর ঐ কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম।" ঠাকুরের সম্বন্ধে হলধারীর শাপ ঐরূপে কাকতালীয়ের ন্যায়ে সফলতা দেখাইয়া বরে পরিণত হইয়াছিল।

ঠাকুরের সম্বন্ধে হলধারীর ধারণার পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তনের কথা।

হলধারীর সহিত ঠাকুরের আচরণে বেশ একটা মধুর রহস্যের ভাব ছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি হলধারী ঠাকুরের খুল্লতাত-পুত্র ও বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। আন্দাজ ১২৬৫ সালে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া তিনি ৺রাধাগোবিন্দ-জীর পূজাকার্য্যে ব্রতী হন, এবং ১২৭২ সালের কিছুকাল পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য সম্পন্ন করেন। অতএব ঠাকুরের সাধনকালের দ্বিতীয় চারিবৎসর এবং তাহার পরেও দুই বৎসরের অধিক কাল দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া তিনি ঠাকুরকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তত্রাচ তিনি ঠাকুরের সম্বন্ধে একটা স্থির ধারণা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি স্বয়ং বিশেষ নিষ্ঠাচারসম্পন্ন ছিলেন, সুতরাং ভাবাবেশে ঠাকুরের পরিধানের কাপড়, পৈতা প্রভৃতি ফেলিয়া দেওয়াটা তাঁহার ভাল লাগিত না। ভাবিতেন, কনিষ্ঠ যথেচ্ছাচারী অথবা পাগল হইয়াছে। হৃদয় বলিত— "তিনি কখন কখন আমাকে বলিতেন, 'হৃদু, উনি কাপড় ফেলিয়া দেন, পৈতা ফেলিয়া দেন, এটা বড় দোষের কথা; কত জন্মের পুণ্যে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম হয়, উনি কি না সেই ব্রাহ্মণত্বকে সামান্য জ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মণাভিমান ত্যাগ করিতে চান? এমন কি উচ্চাবস্থা হইয়াছে যাহাতে উনি ঐরূপ করিতে পারেন? হৃদু, উনি তোমারই কথা একটু শুনেন, তোমার উচিৎ যাহাতে উনি ঐরূপ না করিতে পারেন তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা; এমন কি বাঁধিয়া রাখিয়াও উঁহাকে যদি তুমি ঐরূপ কার্য্য হইতে নিরস্ত করিতে পার, তাহাও করা উচিত'।"

আবার, পূজা করিতে করিতে ঠাকুরের নয়নে প্রেমধারা, ভগবদ্-নামগুণশ্রবণে অদ্ভুত উল্লাস ও ঈশ্বরলাভের জন্য অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাকুলতা প্রভৃতি দেখিয়া তিনি মোহিত হইয়া ভাবিতেন, নিশ্চয়ই কনিষ্ঠের ঐ সকল অবস্থা ঐশ্বরিক আবেশে হইয়া থাকে, নতুবা সাধারণ মানুষের কখন ত ঐরূপ হইতে দেখা যায় না! ভাবিয়া, হলধারী আবার কখন কখন হৃদয়কে বলিতেন, "হৃদয়, তুমি নিশ্চয় উঁহার ভিতরে কোনরূপ আশ্চর্য্য দর্শন পাইয়াছ, নতুবা এত করিয়া উঁহার কখন সেবা করিতে না।"

ঐরূপে হলধারীর মন সর্ব্বদা সন্দেহে দোলায়মান থাকিয়া ঠাকুরের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে একটা স্থির মীমাংসায় কিছুতেই উপনীত হইতে পারিত না। ঠাকুর বলিতেন, তাঁহার পূজা দেখিয়া মোহিত হইয়া হলধারী তাঁহাকে কত-দিন বলিয়াছে, 'রামকৃষ্ণ, এইবার আমি তোকে চিনিয়াছি।' "তাতে কখন কখন আমি রহস্য করিয়া বলিতাম, 'দেখো আবার যেন গোলমাল হয়ে যায় না।' সে বলিত, 'এবার আর তোর ফাঁকি দিবার যো নাই; তোতে নিশ্চয়ই ঈশ্বরীয় আবেশ আছে; এবার একেবারে ঠিক ঠাক বুঝিয়াছি।' শুনিয়া বলিতাম, 'আচ্ছা দেখা যাবে।' অনন্তর মন্দিরের দেবসেবা সম্পূর্ণ করিয়া এক টিপ নস্য লইয়া হলধারী যখন শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা বা অধ্যাত্ম রামায়ণাদি শাস্ত্র বিচার করিতে বসিত তখন অভিমানে ফুলিয়া উঠিয়া একেবারে অন্য লোক হইয়া যাইত। আমি তখন সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিতাম, 'তুমি শাস্ত্রে যা যা পড়িতেছ সে সব অবস্থা আমার উপলব্ধি হয়েছে, আমি ওসব কথা বুঝ্‌তে পারি।' শুনিয়াই সে বলিয়া উঠিত, 'হাঁ; তুই গণ্ডমূর্খ, তুই আবার এ সব কথা বুঝ্‌বি।' আমি বলিতাম,

নস্য লইয়া শাস্ত্রবিচার করিতে বসিয়াই হলধারীর উচ্চ ধারণার লোপ।

(নিজের শরীর দেখাইয়া) 'সত্য বলছি, এর ভিতরে যে আছে সে সকল কথা বুঝিয়ে দেয়। এই যে তুমি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বোল্‌লে ইহার ভিতর ঈশ্বরীয় আবেশ আছে—সেই-ই সকল কথা বুঝিয়ে দেয়।' হলধারী ঐ কথা শুনিয়া গরম হইয়া বলিত—'যাঃ যাঃ মূর্খ কোথাকার, কলিতে কল্কি ছাড়া আর ঈশ্বরের অবতার হবার কথা কোন্ শাস্ত্রে আছে? তুই উন্মাদ হইয়াছিস্ তাই ঐরূপ ভাবিস্।' হাসিয়া বলিতাম—'এই যে বলেছিলে আর গোল হবে না';—কিন্তু সে কথা তখন শোনে কে? এইরূপ এক আধ দিন নয় অনেক দিন হইয়াছিল। পরে একদিন সে দেখিতে পাইল, ভাবাবিষ্ট হইয়া বস্ত্র ত্যাগপূর্ব্বক বৃক্ষের উপরে বসিয়া আছি এবং বালকের ন্যায় তদবস্থায় মূত্র ত্যাগ করিতেছি—সেই দিন হইতে সে একেবারে পাকা করিল (স্থির নিশ্চয় করিল) আমাকে ব্রহ্মদৈত্যে পাইয়াছে।"

হলধারীর শিশুপুত্রের মৃত্যুর কথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ঐ দিন হইতে তিনি ৺কালীমূর্ত্তিকে তমোগুণময়ী বা তামসী বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। একদিন ঠাকুরকে ঐ কথা বলিয়াও ফেলেন, "তামসী মূর্ত্তির উপাসনায় কখন আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে কি? তুমি ঐ দেবীর আরাধনা কর কেন?"

৺কালীকে তমোগুণময়ী বলায় ঠাকুরের হলধারীকে শিক্ষাদান।

ঠাকুর ঐ কথা শুনিয়া তখন তাহাকে কিছু বলিলেন না, কিন্তু ইষ্টনিন্দাশ্রবণে তাঁহার অন্তর ব্যথিত হইল। অনন্তর কালীমন্দিরে যাইয়া সজলনয়নে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, হলধারী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত—সে তোকে তমোগুণময়ী বলে; তুই কি সত্যই ঐরূপ?" অনন্তর ৺জগদম্বার মুখে ঐ বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব জানিতে পারিয়া ঠাকুর উল্লাসে উৎসাহিত হইয়া হলধারীর নিকট ছুটিয়া যাইলেন এবং একেবারে তাহার স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়া উত্তেজিত

স্বরে বারম্বার বলিতে লাগিলেন—'তুই মাকে তামসী বলিস্? মা কি তামসী? মা যে সব—ত্রিগুণময়ী, আবার শুদ্ধ সত্ত্বগুণময়ী!' ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐরূপ কথায় ও স্পর্শে হলধারীর তখন যেন অন্তরের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল। তিনি তখন পূজার আসনে বসিয়াছিলেন—ঠাকুরের ঐ কথা অন্তরের সহিত স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার ভিতর সাক্ষাৎ জগদম্বার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া সম্মুখস্থ ফুলচন্দনাদি লইয়া তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তিভরে অঞ্জলি প্রদান করিলেন! উহার কিছুক্ষণ পরে হৃদয় আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মামা, এই তুমি বল, রামকৃষ্ণকে ভূতে পাইয়াছে, তবে আবার তাঁহাকে ঐরূপে পূজা করিলে যে?" হলধারী বলিলেন, "কি জানি হৃদু, কালীঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে আমাকে, কি যে একরকম করিয়া দিল, আমি সব ভুলিয়া তার ভিতর সাক্ষাৎ ঈশ্বর প্রকাশ দেখিতে পাইলাম। কালীমন্দিরে যখনই আমি রামকৃষ্ণের কাছে যাই তখনই আমাকে ঐরূপ করিয়া দেয়। এ এক চমৎকার ব্যাপার—কিছু বুঝিতে পারি না।"

ঐরূপে হলধারী, ঠাকুরের ভিতর বারম্বার দৈব প্রকাশ দেখিতে পাইলেও নস্ত লইয়া শাস্ত্রবিচার করিতে বসিলেই পাণ্ডিত্যাভিমানে মত্ত হইয়া 'পুনর্মূষিকত্ব' প্রাপ্ত হইতেন। কামকাঞ্চনে আসক্তি দূর না হইলে বাহ্যশৌচ, সদাচার এবং শাস্ত্রজ্ঞান যে বিশেষ কাজে লাগে না এবং মানবকে সত্য তত্ত্বের ধারণা করাইতে পারে না, হলধারীর পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার হইতে একথা স্পষ্ট বুঝা যায়।

কাঙ্গালীদিগের পাত্রাবশেষ ভোজন করিতে দেখিয়া হলধারীর ঠাকুরকে ভর্ৎসনা ও ঠাকুরের উত্তর।

ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ পাইতে সমাগত কাঙ্গালীদিগকে নারায়ণজ্ঞান করিয়া ঠাকুর এক সময়ে তাহাদের ভোজনাবশেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন—একথা আমরা পূর্ব্বেই

বলিয়াছি। হলধারী উহা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'তোর ছেলে মেয়ের কেমন করিয়া বিবাহ হয় তাহা দেখিব।' জ্ঞানাভিমানী হলধারীর মুখে ঐরূপ কথা শুনিয়া ঠাকুর উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "তবে রে শালা, শাস্ত্রব্যাখ্যা করবার সময় তুই না বলিস্, জগৎ মিথ্যা ও সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি করতে হয়? তুই বুঝি ভাবিস্ আমি তোর মত জগৎ মিথ্যা বল্‌বো অথচ ছেলে মেয়ের বাপ হব। ধিক্ তোর শাস্ত্রজ্ঞানে।"

হলধারীর পাণ্ডিত্যে ঠাকুরের মনে সন্দেহের উদয় ও শ্রীশ্রীজগদম্বার পুনর্দর্শন ও প্রত্যাদেশ লাভ—'ভাবমুখে থাক্।'

বালকস্বভাব ঠাকুর আবার, কখন কখন হলধারীর পাণ্ডিত্যে ভুলিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে শ্রীশ্রীজগন্মাতার মতামত গ্রহণ করিতে ছুটিতেন। আমরা শুনিয়াছি, ভাবসহায়ে ঈশ্বরিক স্বরূপ সম্বন্ধে যে সকল অনুভূতি হয় সে সকলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া এবং ঈশ্বরকে ভাবাভাবের অতীত বলিয়া শাস্ত্রসহায়ে নির্দ্দেশ করিয়া হলধারী ঠাকুরের মনে একদিন বিষম সন্দেহের উদয় করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "ভাবিলাম, তবে তো ভাবাবেশে যত কিছু ঈশ্বরীয় রূপ দেখিয়াছি, আদেশ পাইয়াছি সে সমস্ত ভুল; মা তো তবে আমায় ফাঁকি দিয়াছে! মন বড়ই ব্যাকুল হইল এবং অভিমানে কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে বলিতে লাগিলাম—মা নিরক্ষর মুখ্খু বলে আমাকে কি এমনি করে ফাঁকি দিতে হয়—সে কান্নার তোড় (বেগ) আর থামে না! কুঠির ঘরে বসিয়া কাঁদিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি কি, সহসা মেজে হইতে কুয়াসার মত ধোঁয়া উঠিয়া সামনের কতকটা স্থান পূর্ণ হইয়া গেল! তার পর দেখি, তাহার ভিতরে আবক্ষলম্বিতশ্মশ্রু একখানি গৌরবর্ণ জীবন্ত সৌম্য মুখ! ঐ মূর্ত্তি আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'ওরে, তুই ভাবমুখে থাক্, ভাবমুখে

থাক্, ভাবমুখে থাক্!'—তিনবার মাত্র ঐকথাগুলি বলিয়াই ঐমূর্ত্তি ধীরে ধীরে আবার ঐ কুয়াসায় গলিয়া গেল এবং ঐ কুয়াসার মত ধূমও কোথায় অন্তর্হিত হইল! ঐরূপ দেখিয়া সেবার শান্ত হইলাম।” ঘটনাটি ঠাকুর একদিন স্বামী প্রেমানন্দকে সম্মুখে বলিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, হলধারীর কথায় ঐরূপ সন্দেহ আর একবার মনে উঠিয়াছিল; “সেবার পূজা করিতে করিতে মাকে ঐ বিষয়ের মীমাংসার জন্য কাঁদিয়া ধরিয়াছিলাম; মা ঐ সময়ে ‘রতির মা’ নাম্নী একটি স্ত্রীলোকের বেশে ঘটের পার্শ্বে আবির্ভূতা হইয়া বলিয়াছিলেন, ‘তুই ভাবমুখে থাক্।’ আবার পরিব্রাজকাচার্য্য তোতাপুরী গোস্বামী বেদান্তজ্ঞান উপদেশ করিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে চলিয়া যাইবার পর ঠাকুর যখন ছয় মাস কাল ধরিয়া নিরন্তর নির্ব্বিকল্প ভূমিতে বাস করিয়াছিলেন তখনও ঐকালের অন্তে শ্রীশ্রীজগদম্বার অশরীরী বাণী প্রাণে প্রাণে শুনিতে পাইয়াছিলেন—‘তুই ভাবমুখে থাক্!’

হলধারী কালীবাটীতে কতকাল ছিলেন।

দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীতে হলধারী প্রায় সাত বৎসর বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং পিশাচবৎ আচারবান পূর্ণজ্ঞানী সাধুর, ব্রাহ্মণীর, জটাধারী নামক রামায়েৎ সাধুর ও শ্রীমৎ তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে পর পর আগমন তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনা গিয়াছে, হলধারী শ্রীমৎ তোতাপুরীর সহিত একত্রে কখন কখন অধ্যাত্ম-রামায়ণাদি শাস্ত্র পাঠ করিতেন। অতএব হলধারী-সংক্রান্ত ঘটনাগুলি পূর্ব্বোক্ত সাত বৎসরের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপস্থিত হইয়াছিল। বলিবার সুবিধার জন্য আমরা ঐসকল পাঠককে একত্রে বলিয়া লইলাম।

ঠাকুরের সাধক-জীবনের কথা আমরা যতদূর আলোচনা করিলাম

তাহাতে একথা নিঃসংশয় বুঝা যায়, কালীবাটীর জনসাধারণের নয়নে তিনি এখন উন্মত্ত বলিয়া পরিগণিত হইলেও মস্তিষ্কের বিকার বা ব্যাধিপ্রসূত সাধারণ উন্মাদাবস্থা তাঁহার উপস্থিত হয় নাই। ঈশ্বর দর্শনের জন্য তাঁহার অন্তরে তীব্র ব্যাকুলতার উদয় হইয়াছিল এবং উহার প্রভাবে তিনি ঐকালে আত্মসম্বরণ করিতে পারিতেছিলেন না। অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বালাময়ী ঐরূপ ব্যাকুলতা হৃদয়ে নিরন্তর ধারণপূর্ব্বক সাধারণ বিষয়সকলে সাধারণের ন্যায় যোগদানে সক্ষম হইতেছিলেন না বলিয়াই লোকে বলিতেছিল, তিনি উন্মাদ হইয়াছেন। কেই বা ঐরূপ করিতে পারে? হৃদয়ের তীব্র বেদনা মানবের স্বাভাবিক সহ্যগুণকে যখন অতিক্রম করে, কেহই তখন মুখে একপ্রকার এবং ভিতরে অন্যপ্রকার ভাব রাখিয়া সংসারে সকলের সহিত একযোগে চলিতে পারে না। বলিতে পার, সহ্যগুণের সীমা কিন্তু সকলের পক্ষে এক নহে, কেহ অল্প সুখদুঃখেই বিচলিত হইয়া পড়ে, আবার কেহ বা তদুভয়ের গভীর বেগ হৃদয়ে ধরিয়াও সমুদ্রবৎ অচল অটল থাকে; অতএব ঠাকুরের সহ্যগুণের সীমার পরিমাণটা বুঝিব কিরূপে? উত্তরে বলিতে পারা যায়, তাঁহার জীবনের অন্যান্য ঘটনাবলীর অনুধাবন করিলেই উহা যে অসাধারণ ছিল একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে; দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল অর্দ্ধাশন, অনশন ও অনিদ্রায় থাকিয়া যিনি স্থির থাকিতে পারেন, অতুল সম্পত্তি বারম্বার পদে আসিয়া পড়িলে ঈশ্বরলাভের পথে অন্তরায় বলিয়া যিনি উহা ততোধিকবার প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন—ঐরূপ কত কথাই না বলিতে পারা যায়—তাঁহার শরীর ও মনের অসাধারণ ধৈর্য্যের কথা কি আবার বলিতে হইবে?

ঠাকুরের দিব্যোন্মাদাবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা।

এই কালের ঘটনাবলীর অনুধাবনে দেখিতে পাওয়া যায়, কাম-

কাঞ্চনোন্মত্ত বদ্ধ জীবের চক্ষেই তাঁহার পূর্ব্বোক্ত অবস্থা ব্যাধিজনিত বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। দেখা যায়, মথুরানাথকে ছাড়িয়া দিলে, কল্পনা-যুক্তিসহায়ে তাঁহার মানসিক অবস্থার বিষয় আংশিকভাবেও নির্দ্ধারণ করিতে পারে এমন কোন লোক ঐ কালে দক্ষিণেশ্বর কালী-বাটীতে উপস্থিত ছিল না। শ্রীযুত কেনারাম ভট্ট ঠাকুরকে দীক্ষা দিয়াই কোথায় যে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, বলিতে পারি না; কারণ ঐ ঘটনার পরে তাঁহার কথা হৃদয় বা অন্য কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ঠাকুরবাটীর মূর্খ লুব্ধ কর্ম্মচারীগণ ঠাকুরের এইকালের ক্রিয়াকলাপ ও মানসিক অবস্থার বিষয়ে যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে তাহা প্রমাণের মধ্যেই গণ্য হইতে পারে না। অতএব কালীবাটীতে সমাগত সিদ্ধ ও সাধকগণ তাঁহার অবস্থা সম্বন্ধে এই কালে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাই ঐ বিষয়ে একমাত্র বিশ্বস্ত প্রমাণ। ঠাকুরের নিজের ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকটে ঐ বিষয়ে যাহা শুনা গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, তাঁহারা তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্ত স্থির করা দূরে থাকুক, তাঁহার সম্বন্ধে সর্ব্বদা অতি উচ্চ ধারণা করিয়াছিলেন।

অজ্ঞ ব্যক্তিরাই ঐ অবস্থাকে ব্যাধিজনিত ভাবিয়াছিল, সাধকেরা নহে।

পরবর্ত্তী কালের কথাসকলের আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা দেখিতে পাইব ঈশ্বরলাভের প্রবল ব্যাকুলতায় ঠাকুর যতক্ষণ না একক‍ালে দেহবোধরহিত হইয়া পড়িতেন, ততক্ষণ শারীরিক কল্যাণের জন্য তাঁহাকে যে যাহা করিতে বলিত তাহা তৎক্ষণাৎ অনুষ্ঠান করিতেন। পাঁচজনে বলিল, তাঁহার চিকিৎসা করান হউক, তাহাতে সম্মত হইলেন; কামারপুকুরে তাঁহার মাতার

এই কালের কার্য্যকলাপ দেখিয়া ঠাকুরকে ব্যাধিগ্রস্ত বলা চলে না।

নিকট লইয়া যাওয়া হউক, তাহাতে সম্মত হইলেন; বিবাহ দেওয়া হউক, তাহাতেও অমত করিলেন না।—এরূপাবস্থায় উন্মত্তের কার্য্যকলাপের সহিত তাঁহার আচরণাদির কেমন করিয়া তুলনা করা যাইতে পারে?

আবার দেখিতে পাওয়া যায়, দিব্যোন্মাদ অবস্থালাভের কাল হইতে ঠাকুর বিষয়ী লোক ও বিষয়সংক্রান্ত ব্যাপার সকল হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিতে যত্নবান্ হইলেও বহুলোক একত্র হইয়া যেখানে কোনভাবে ঈশ্বরের পূজাকীর্ত্তনাদি করিতেছে সেখানে যাইতে ও তাহাদিগের সহিত যোগদান করিতে কোনরূপ আপত্তি করা দূরে থাকুক, বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। বরাহনগরে ৺দশমহাবিদ্যা দর্শন, কালীঘাটে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে দেখিতে গমন এবং এখন হইতে প্রায় প্রতি বৎসর পানিহাটির মহোৎসবে যোগদান হইতে তাঁহার সম্বন্ধে ঐ কথা বেশ বুঝা যায়। ঐ সকল স্থানেও শাস্ত্রজ্ঞ সাধকদিগের সহিত তাঁহার কখন কখন দর্শন সম্ভাষণাদি হইয়াছিল। তদ্বিষয়ে আমরা অল্প অল্প যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি, ঐ সকল সাধকেরাও তাঁহাকে উচ্চাসন প্রদান করিয়াছিলেন।

ঐ বিষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা ঠাকুরের সন ১২৬৫ সালে, ইংরাজী ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে, পানিহাটি মহোৎসব-দর্শনে গমন করিবার কথা উল্লেখ করিতে পারি। উৎসবানন্দ গোস্বামীর পুত্র বৈষ্ণবচরণকে তিনি ঐদিন প্রথম দেখিয়াছিলেন। হৃদয়ের নিকটে এবং ঠাকুরের নিজ মুখেও আমাদের কেহ কেহ শুনিয়াছেন, ঐ দিবস পানিহাটিতে গমন করিয়া তিনি শ্রীযুত মণিমোহন সেনের ঠাকুরবাটীতে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে বৈষ্ণবচরণ তথায় উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে দেখিয়াই আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থাসম্পন্ন অদ্বিতীয়

১২৬৫ সালে পানিহাটির মহোৎসবে বৈষ্ণবচরণের ঠাকুরকে প্রথম দর্শন ও ধারণা।

মহাপুরুষ বলিয়া স্থিরনিশ্চয় করেন। বৈষ্ণবচরণ সেদিন অধিকাংশ কাল উৎসবক্ষেত্রে তাঁহার সঙ্গে অতিবাহিত করেন এবং নিজ ব্যয়ে চিঁড়া, মুড়্‌কি, আম ইত্যাদি ক্রয় করিয়া 'মালসা ভোগের' বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করিয়াছিলেন। আবার, উৎসবান্তে কলিকাতা ফিরিবার কালে তিনি পুনরায় দর্শনলাভের জন্য রাণী রাসমণির কালীবাটীতে নামিয়া ঠাকুরের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, এবং তিনি তখনও উৎসবক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করেন নাই জানিতে পারিয়া ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া আসিয়াছিলেন। ঐ ঘটনার তিন চারি বৎসর পরে বৈষ্ণবচরণ কিরূপে পুনরায় ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন, সে সকল কথা আমরা অন্যত্র সবিস্তার উল্লেখ করিয়াছি।*

ঠাকুরের এই কালের অন্যান্য সাধন—'টাকা মাটি,' 'মাটি টাকা', অশুচিস্থান পরিষ্কার, চন্দনবিষ্ঠায় সমজ্ঞান।

এই চারি বৎসরের ভিতরেই আবার ঠাকুর, মন হইতে কাঞ্চনাসক্তি এককালে দূর করিবার জন্য কয়েক খণ্ড মুদ্রা মৃত্তিকার সহিত একত্রে হস্তে গ্রহণ করিয়া সদসদ্বিচারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সচ্চিদানন্দস্বরূপ ঈশ্বরকে লাভ করা যে ব্যক্তি জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছে সে মৃত্তিকার ন্যায় কাঞ্চন হইতেও ঐ বিষয়ে কোন সহায়তা লাভ করে না। সুতরাং তাঁহার নিকটে মৃত্তিকা ও কাঞ্চন, উভয়ের সমান মূল্য। ঐ কথা দৃঢ় ধারণার জন্য তিনি বারম্বার 'টাকা মাটি,' 'মাটি টাকা' বলিতে বলিতে কাঞ্চন লাভ করিবার বাসনার সহিত হস্তস্থিত মৃত্তিকা ও মুদ্রাসকল গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন করিয়াছিলেন। ঐরূপে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত বস্তু ও ব্যক্তিসকলকে শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রকাশ ও অংশরূপে ধারণার জন্য কাঙ্গালীদের ভোজনাবশিষ্ট গ্রহণপূর্ব্বক ভোজন-স্থান

* গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ—১ম অধ্যায়।

পরিষ্কার করা—সকলের ঘৃণার পাত্র মেথর অপেক্ষাও তিনি কোন অংশে বড় নহেন, একথা ধারণাপূর্ব্বক মন হইতে অভিমান অহঙ্কার পরিহারের জন্য অশুচিস্থান ধৌত করা—চন্দন হইতে বিষ্ঠা পর্য্যন্ত সকল পদার্থ পঞ্চভূতের বিকারপ্রসূত জানিয়া হেয়োপাদেয় জ্ঞান দূর করিবার জন্য জিহ্বার দ্বারা অপরের বিষ্ঠা নির্ব্বিকারচিত্তে স্পর্শ করা প্রভৃতি যে সকল অশ্রুতপূর্ব্ব সাধনকথা ঠাকুরের সম্বন্ধে শুনিতে পাওয়া যায় তাহাও এই কালে সাধিত হইয়াছিল। প্রথম চারি বৎসরের ঐ সকল সাধন ও দর্শনের কথা অনুধাবন করিলে ঈশ্বর-লাভের জন্য তাঁহার মনে কি অসাধারণ আগ্রহ ঐকালে আধিপত্য করিয়াছিল এবং কি অলৌকিক বিশ্বাসের সহিত তিনি সাধনরাজ্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ঐ সঙ্গে একথাও নিশ্চয় ধারণা হয় যে, অপর কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে সাহায্য না পাইয়া একমাত্র ব্যাকুলতা সহায়ে তিনি ঐ কালের ভিতরে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূর্ণ দর্শন লাভপূর্ব্বক সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন এবং সাধনার চরম ফল করগত করিয়া গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যের সহিত নিজ অপূর্ব্ব প্রত্যক্ষসকল মিলাইতেই পরবর্ত্তী কালে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

পরিশেষে নিজ মনই সাধকের গুরু হইয়া দাঁড়ায়। ঠাকুরের মনের এই কালে গুরুবৎ আচরণের দৃষ্টান্ত, (১) সূক্ষ্ম দেহে কীর্ত্তনানন্দ।

নিরন্তর ত্যাগ ও সংযম অভ্যাসপূর্ব্বক সাধক যখন নিজ মনকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া পবিত্র হয়, ঠাকুর বলিতেন, ঐ মনই তখন তাহার গুরু হইয়া থাকে। ঐরূপ শুদ্ধ মনে যে সকল ভাবতরঙ্গ উঠিতে থাকে সে সকল, বিপথগামী করা দূরে থাকুক, তাহাকে গন্তব্য লক্ষ্যে আশু পৌঁছাইয়া দেয়। অতএব বুঝা যাইতেছে, ঠাকুরের আজন্ম পবিশুদ্ধ মন গুরুর ন্যায় পথ প্রদর্শন করিয়া সাধনার প্রথম চারি বৎসরেই তাঁহাকে ঈশ্বরলাভ বিষয়ে সিদ্ধকাম করিয়াছিল। তাঁহার নিকটে

শুনিয়াছি, উহা তাঁহাকে ঐকালে কোন্ কার্য্য করিতে হইবে এবং কোন্‌টি হইতে বিরত থাকিতে হইবে তাহা শিক্ষা দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল না কিন্তু সময়ে সময়ে মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক পৃথক্ এক ব্যক্তির ন্যায় দেহমধ্য হইতে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সাধনপথে উৎসাহিত করিত, ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাইতে বলিত, অনুষ্ঠানবিশেষ কেন করিতে হইবে তাহা বুঝাইয়া দিত এবং কৃতকার্য্যের ফলাফল জানাইয়া দিত। ঐ কালে ধ্যান করিতে বসিয়া তিনি দেখিতেন, শাণিতত্রিশূলধারী জনৈক সন্ন্যাসী দেহমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "অন্য চিন্তা সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক ইষ্টচিন্তা যদি না করিবি ত এই ত্রিশূল তোর বুকে বসাইয়া দিব।' অন্য এক সময়ে দেখিয়াছিলেন—ভোগবাসনাময় পাপপুরুষ শরীরমধ্য হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলে, ঐ সন্ন্যাসী যুবকও সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া ঐ পুরুষকে নিহত করিলেন!—দূরস্থ দেবদেবীর মূর্ত্তি দর্শনে অথবা কীর্ত্তনাদি শ্রবণে অভিলাষী হইয়া ঐ সন্ন্যাসী যুবক কখন কখন ঐরূপে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় পথে ঐ সকল স্থানে গমন করিতেন এবং কিয়ৎকাল আনন্দ উপভোগপূর্ব্বক পুনরায় পূর্ব্বোক্ত জ্যোতির্ম্ময় বর্ত্ম অবলম্বনে আসিয়া তাঁহার শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেন!—ঐরূপ নানা দর্শনের কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি।

(২) নিজ শরীরের ভিতর যুবক সন্ন্যাসীর দর্শন ও উপদেশ লাভ।

সাধনকালের প্রায় প্রারম্ভ হইতে ঠাকুর, দর্পণে দৃষ্ট প্রতিবিম্বের ন্যায় তাঁহারই অনুরূপ আকারবিশিষ্ট শরীরমধ্যগত ঐ যুবক সন্ন্যাসীর দর্শন পাইয়াছিলেন এবং ক্রমে সকল কার্য্যের মীমাংসাস্থলে তাঁহার পরামর্শ মত চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। সাধকজীবনের অপূর্ব্ব অনুভব ও প্রত্যক্ষাদির প্রসঙ্গ করিতে করিতে তিনি একদিন

ঐবিষয় আমাদিগকে নিম্নলিখিত ভাবে বলিয়াছিলেন,—"আমারই ন্যায় দেখিতে এক যুবক সন্ন্যাসীমূর্ত্তি ভিতর হইতে যখন তখন বাহিব হইযা আমাকে সকল বিষযে উপদেশ দিত। সে ঐরূপে বাহিবে আসিলে কখন সামান্য বাহ্যজ্ঞান থাকিত এবং কখন বা উহা এককালে হাবাইয়া জড়বৎ পড়িয়া থাকিয়া কেবল তাহাবই চেষ্টা ও কথা দেখিতে ও শুনিতে পাইতাম। তাহাব মুখ হইতে যাহা শুনিযাছিলাম সেই সকল তত্ত্বকথাই ব্রাহ্মণী, ন্যাঙ্গটা (শ্রীমৎ তোতাপুবী) প্রভৃতি আসিযা পুনবায় উপদেশ দিযাছিলেন। যাহা জানিতাম, তাহাই তাঁহাবা জানাইযা দিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয শাস্ত্রবিধিব মান্য বক্ষা কবাইবাব জন্যই তাঁহারা গুরু-রূপে জীবনে উপস্থিত হইযাছিলেন। নতুবা ন্যাঙ্গটা প্রভৃতিকে গুরু-রূপে গ্রহণ কবিবাব প্রযোজন খুঁজিযা পাওযা যায় না।"

(৩) সিহড় যাইবার পথে ঠাকুরের দর্শন। উক্ত দর্শন সম্বন্ধে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর মীমাংসা।

সাধনাব প্রথম চাবি বৎসবেব শেষভাগে ঠাকুব যখন কামাবপুকুবে অবস্থান কবিতেছিলেন তখন ঐ বিষযক, আব একটি অপূর্ব্ব দর্শন তাঁহাব জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল। শিবিকাবোহণে কামাবপুকুব হইতে সিহড় গ্রামে হৃদযেব বাটীতে যাইবাব কালে তাঁহার ঐ দর্শন উপস্থিত হয। উহাবই কথা এখন পাঠককে বলিব—সুনীল অম্বরতলে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, শ্যামল ধান্যক্ষেত্র, বিহগকূজিত শীতল ছাযামষ অশ্বত্থবট বৃক্ষবাজি এবং মধুগন্ধ-কুসুম-ভূষিততরুলতা প্রভৃতি অবলোকনপূর্ব্বক প্রফুল্লমনে যাইতে যাইতে ঠাকুর দেখিলেন, তাঁহাব দেহমধ্য হইতে দুইটি কিশোরবয়স্ক সুন্দব বালক সহসা বহির্গত হইযা বনপুষ্পাদিব অন্বেষণে কখন প্রান্তরমধ্যে বহুদূরে গমন, আবার কখন বা শিবিকার সন্নিকটে আগমনপূর্ব্বক হাস্য, পবিহাস, কথোপকথনাদি নানা চেষ্টা করিতে

করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঐরূপে আনন্দে বিহার করিয়া তাহারা পুনরায় তাঁহার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ঐ দর্শনের প্রায় দেড় বৎসর পরে ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন। কথাপ্রসঙ্গে এক দিবস ঠাকুরের নিকটে ঐ দর্শনের বিবরণ শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—'বাবা, তুমি ঠিক দেখিয়াছ; এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্য এবার একসঙ্গে একাধারে আসিয়া তোমার ভিতরে রহিয়াছেন।' সেই জন্যই তোমার ঐরূপ দর্শন হইয়াছিল। হৃদয় বলিত, ঐকথা বলিয়া ব্রাহ্মণী চৈতন্য ভাগবৎ হইতে নিম্নের শ্লোক দুইটী আবৃত্তি করিয়াছিলেন—

> অদ্বৈতের গলা ধরি কহেন বার বার।
> পুনঃ যে করিব লীলা মোর চমৎকার।
> কীর্ত্তনে আনন্দরূপ হইবে আমার॥
> অদ্যাবধি গৌরলীলা করেন গৌররায়।
> কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

উক্ত দর্শন হইতে যাহা বুঝিতে পারা যায়।

আমরা এক দিবস তাঁহাকে ঐ দর্শনের কথা জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'ঐরূপ দেখিয়াছিলাম সত্য। ব্রাহ্মণী তাহা শুনিয়া ঐরূপ বলিয়াছিল, একথাও সত্য। কিন্তু উহার যথার্থ অর্থ যে কি, তাহা কেমন করিয়া বলি বল?' যাহা হউক, ঐ সকল দর্শনের কথা শুনিয়া মনে হয়, তিনি এই সময় হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন, বহু প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবীতে সুপরিচিত কোন আত্মা তাঁহার শরীরমনে আমিত্বাভিমান লইয়া প্রয়োজনবিশেষ সিদ্ধির জন্য অবস্থান করিতেছেন! ঐরূপে নিজ ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে যে অলৌকিক আভাস তিনি এখন পাইতেছিলেন, তাহাই কালে

সুস্পষ্ট হইয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল—যিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য অযোধ্যা ও শ্রীবৃন্দাবনে জানকীবল্লভ শ্রীরাম-চন্দ্র ও রাধাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই এখন পুনরায় ভারত ও জগৎকে নবীন ধর্ম্মাদর্শদানের জন্য নূতন শরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে বারম্বার বলিতে শুনিয়াছি, "যে রাম, যে কৃষ্ণ হইয়াছিল সেই ইদানীং (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই খোলটার ভিতরে আসিয়াছে—রাজা যেমন কখন কখন ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণে বহির্গত হয় সেইরূপ গুপ্তভাবে সে এইবার পৃথিবীতে আগমন করিয়াছে।"

ঠাকুরের দর্শনসমূহ কখন মিথ্যা হয় নাই।

পূর্ব্বোক্ত দর্শনটির সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে হইলে অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকটে ঠাকুর ঐরূপে নিজ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাস ভিন্ন অপর কোন উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ দর্শনটির কথা ছাড়িয়া দিলে তাঁহার এই কালের অপর দর্শনসমূহের সত্যতাসম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত ধারণা করিতে পারি। কারণ, ঐরূপ দর্শনাদি আমাদের সময়ে ঠাকুরের জীবনে নিত্য উপস্থিত হইত এবং তাঁহার ইংরাজীশিক্ষিত সন্দেহশীল শিষ্যবর্গ ঐ সকল পরীক্ষা করিতে যাইয়া প্রতিদিন পরাজিত ও স্তম্ভিত হইত। ঐ বিষয়ক কয়েকটি উদাহরণ * লীলাপ্রসঙ্গের অন্যত্র থাকিলেও পাঠকের তৃপ্তির জন্য আর একটি দৃষ্টান্ত এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি—

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ, আশ্বিন মাস, ৬শারদীয়া পূজা মহোৎ-সবে কলিকাতা নগরীর আবালবৃদ্ধবনিতা প্রতি বৎসর যেমন মাতিয়া

---

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—৪র্থ অধ্যায়।

উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত—১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্রের বাটীতে দুর্গাপূজা-কালে ঠাকুরের দর্শন-বিবরণ।

থাকে, সেইরূপ মাতিয়াছে। ঠাকুরের ভক্তদিগের প্রাণে ঐ আনন্দপ্রবাহ আঘাত করিলেও উহা বাহিরে প্রকাশ করিবার বিশেষ বাধা উপস্থিত। কারণ, যাঁহাকে লইয়া তাহাদের আনন্দোচ্ছ্বাস তাঁহার শরীর এখন অসুস্থ—ঠাকুর গলরোগে আক্রান্ত। কলিকাতার শ্যামপুকুর পল্লীস্থ একটি দ্বিতল বাটী ভাড়া * করিয়া প্রায় মাসাবধি হইল ভক্তেরা তাঁহাকে আনিয়া রাখিয়াছে এবং সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে রোগমুক্ত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ব্যাধির উপশম এপর্য্যন্ত কিছুমাত্র হয় নাই, উত্তরোত্তর উহা বৃদ্ধিই হইতেছে। গৃহস্থ ভক্তেরা সকাল সন্ধ্যা ঐ বাটীতে আগমনপূর্ব্বক সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান ও বন্দোবস্ত করিতেছে, এবং বালক ছাত্র ভক্তদলের ভিতর অনেকে নিজ নিজ বাটীতে আহারাদি করিতে যাওয়া ভিন্ন অন্য সময়ে ঠাকুরের সেবায় লাগিয়া পড়িয়াছে, আবশ্যক বুঝিয়া কেহ কেহ তাহাও করিতে না যাইয়া চব্বিশ ঘণ্টা এখানেই কাটাইতেছে।

অধিক কথা কহিলে এবং বারম্বার সমাধিস্থ হইলে, শরীরের রক্তপ্রবাহ ঊর্দ্ধে প্রবাহিত হইয়া ক্ষত স্থানটিকে নিরন্তর আঘাতপূর্ব্বক রোগের-উপশম হইতে দিবে না, চিকিৎসক ঐজন্য, ঠাকুরকে ঐ উভয় বিষয় হইতে সংযত থাকিতে বলিয়া গিয়াছেন। ঐ ব্যবস্থামত চলিবার চেষ্টা করিলেও ক্রমক্রমে তিনি বারম্বার উহার বিপরীত কার্য্য করিয়া বসিতেছেন। কারণ, 'হাড় মাসের খাঁচা' বলিয়া চিরকাল অবজ্ঞা করিয়া যে শরীর হইতে মন উঠাইয়া লইয়াছেন,

* গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাটী।

সাধারণ মানবের ন্যায় তাহাকে পুনরায় বহুমূল্য জ্ঞান করিতে তিনি কিছুতেই সমর্থ হইতেছেন না।—ভগবৎপ্রসঙ্গ উঠিলেই শরীর ও শরীররক্ষার কথা ভুলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় উহাতে যোগদানপূর্ব্বক বারম্বার সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেছেন! ইতিপূর্ব্বে তাঁহার দর্শন পায় নাই এইরূপ অনেক ব্যক্তিও উপস্থিত হইতেছে; তাহাদিগের হৃদয়ের ব্যাকুলতা দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিতেছেন না, মৃদুস্বরে তাহাদিগকে সাধন পথ সকল নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। ঐ কার্য্যে তাঁহার নিরন্তর উৎসাহ-আনন্দ দেখিয়া ভক্তদিগের অনেকে ঠাকুরের ব্যাধিটাকে সামান্য ও সহজসাধ্য জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছেন; কেহ কেহ আবার, নবাগত ব্যক্তি সকলকে কৃপা করিবার এবং বহুজনমধ্যে ধর্ম্মভাব প্রচারের নিমিত্ত ঠাকুর স্বেচ্ছায় শারীরিক ব্যাধিরূপ উপায় কিছুকালের জন্য অবলম্বন করিয়াছেন—এইরূপ মত প্রকাশপূর্ব্বক সকলকে নিঃশঙ্ক করিতে চেষ্টা পাইতেছেন।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল কোন দিন সকালে এবং কোন দিন অপরাহ্ণে প্রায় নিত্য আসিতেছেন এবং রোগের হ্রাসবৃদ্ধি পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থাদি করিবার পর ঠাকুরের মুখ হইতে ভগবল্লীলা শুনিতে শুনিতে এতই মগ্ন হইয়া যাইতেছেন যে তন্মায় হইয়া দুই তিন ঘণ্টাকাল অতীত হইলেও বিদায় গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না! আবার, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া ঐ সকলের অদ্ভুত সমাধান শ্রবণ করিতে করিতে বহুক্ষণ অতীত হইলে কখন কখন তিনি অনুতপ্ত হইয়া বলিতেছেন, 'আজ তোমাকে বহুক্ষণ বকাইয়াছি, অন্যায় হইয়াছে; তা হউক, সমস্ত দিন আর কাহারও সহিত কোনও কথা কহিও না, তাহা হইলেই আর কোন অপকার হইবে না; তোমার কথায় একপ আকর্ষণ যে এই দেখ না, তোমার কাছে আসিলেই সমস্ত কাজকর্ম্ম ফেলিয়া দুই তিন ঘণ্টা না বসিয়া আর উঠিতে পারি না; জানিতেই পারি না কোন্ দিক

ঙ্গিয়া সময় চলিয়া গেল। সে যাহা হউক, আর কাহারও সহিত এরূপে এতক্ষণ ধরিয়া কথা কহিও না; কেবল আমি আসিলে এইরূপে কথা কহিবে, তাহাতে দোষ হইবে না।' (ডাক্তারের ও সকল ভক্তদিগের হাস্য)।

ঠাকুরের পরম ভক্ত, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র—যাহাকে তিনি কখন কখন 'সুরেশ মিত্র' বলিতেন—তাঁহার সিমলার ভবনে এ বৎসর পূজা আনিয়াছেন। পূর্ব্বে তাঁহাদিগের বাটীতে প্রতি বৎসর পূজা হইত, কিন্তু একবার বিশেষ বিঘ্ন হওয়ায় অনেক দিন বন্ধ ছিল। বাটীর কেহই আর এপর্য্যন্ত পূজা আনিতে সাহসী হন নাই, অথবা কেহ ঐ বিষয়ে উদ্যোগী হইলে অপর সকলে তাঁহাকে ঐ সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিয়াছিলেন। ঠাকুরের বলে বলীয়ান সুরেন্দ্রনাথ দৈবনিগ্রহের ভয় রাখিতেন না এবং একবার কোন বিষয় করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিলে কাহারও কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য করিতেন না। বাটীর সকলে নানা চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে এবৎসর পূজার সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিতে পারেন নাই। তিনি ঠাকুরকে জানাইয়া সমস্ত ব্যয়ভার নিজস্কন্ধে বহন করিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকে বাটীতে আনয়ন করিয়াছেন। শরীরের অসুস্থতাবশতঃ ঠাকুর আসিতে পারিবেন না বলিয়াই কেবল সুরেন্দ্রের আনন্দে নিরানন্দ। আবার পূজার অল্পদিন পূর্ব্বে গৃহে এক জন পীড়িত হইয়া পড়ায় তিনিই ঐ জন্য দোষী সাব্যস্ত হইয়া বাটীর সকলের বিরক্তিভাজন হইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও বিচলিত না হইয়া সুরেন্দ্রনাথ ভক্তির সহিত শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন এবং সকল গুরুভ্রাতৃগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

সপ্তমী পূজা হইয়া গিয়াছে, আজ মহাষ্টমী। শ্যামপুকুরের বাসায় ঠাকুরের নিকট অনেকগুলি ভক্ত একত্র হইয়া ভগবদালাপ ও ভজনাদি করিয়া আনন্দ করিতেছেন। ডাক্তার বাবু অপরাহ্নে চার ঘটিকার সময়ে

উপস্থিত হইবার কিছুক্ষণ পরেই নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) ভজন আরম্ভ করিলেন। সেই দিব্য স্বরলহরী শুনিতে শুনিতে সকলে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর সমীপে উপবিষ্ট ডাক্তারকে সঙ্গীতের ভাবার্থ মৃদুস্বরে বুঝাইয়া দিতে এবং কখন বা অল্পক্ষণের জন্য সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন। ভক্তগণের মধ্যেও কেহ কেহ ভাবাবেশে বাহ্যচৈতন্য হারাইলেন।

ঐরূপে প্রবল আনন্দপ্রবাহে সব ক্ষণ জ্ঞম করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাত্রি সাড়ে সাতটা বাজিয়া গেল। ডাক্তারের এত ক্ষণে চৈতন্য হইল। তিনি বামিজীকে পুত্রের ন্যায় স্নেহে আলিঙ্গন করিলেন এবং ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইবামাত্র ঠাকুরও হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহসা গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন। ভক্তেরা কাণাকাণি বলিতে লাগিলেন, 'এই সময় সন্ধিপূজা কিনা, সেই জন্য ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন! সন্ধিক্ষণের কথা না জানিয়া সহসা এই সময়ে দিব্যাবেশে সমাধিমগ্ন হওয়া অল্প বিচিত্র নহে।' প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল এবং ডাক্তারও বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর এইবার ভক্তগণকে সমাধিকালে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা এইরূপে বলিতে লাগিলেন—"এখান হইতে সুরেন্দ্রের বাড়ী পর্য্যন্ত একটা জ্যোতির রাস্তা খুলিয়া গেল। দেখিলাম তাহার ভক্তিতে প্রতিমায় মা'র আবেশ হইয়াছে! তৃতীয় নয়ন দিয়া জ্যোতিরশ্মি নির্গত হইতেছে! দালানের ভিতরে দেবীর সম্মুখে দীপমালা জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর উঠানে বসিয়া সুরেন্দ্র ব্যাকুলহৃদয়ে মা মা বলিয়া রোদন করিতেছে। তোমরা সকলে তাহার বাটীতে এখনই যাও। তোমাদের দেখিলে তাহার প্রাণ শীতল হইবে।"

অনন্তর ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সকলে

সুরেন্দ্রনাথের বাটীতে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন, বাস্তবিকই দালানে ঠাকুর যে স্থানে বলিয়াছিলেন, দীপমালা জ্বালা হইয়াছিল এবং তাঁহার যখন সমাধি হয় তখন সুরেন্দ্রনাথ প্রতিমার সম্মুখে উঠানে বসিয়া প্রাণের আবেগে 'মা', 'মা', বলিয়া প্রায় একঘণ্টা কাল বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন! ঠাকুরের সমাধিকালের দর্শন ঐরূপে বাহ্য ঘটনার সহিত মিলাইয়া পাইয়া ভক্তগণ বিস্ময়ে আনন্দে হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন!

রাণী রাসমণি ও মথুর বাবু ভ্রমধারণাবশতঃ ঠাকুরকে যে ভাবে পরীক্ষা করেন।

সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরের কোন সময়ে রাণী রাসমণি ও তাঁহার জামাতা মথুরামোহন ভাবিয়াছিলেন, অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যপালনের জন্য ঠাকুরের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতারূপে প্রকাশিত হইতেছে। ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ হইলে পুনরায় শারীরিক স্বাস্থ্য লাভের সম্ভাবনা আছে ভাবিয়া তাঁহারা লছ্‌মীবাই প্রমুখ হাবভাবসম্পন্না সুন্দরী বারনারীগণের সহায়ে তাঁহাকে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে এবং পরে কলিকাতার মেছুয়াবাজার পল্লীস্থ এক ভবনে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, ঐ সকল নারীর মধ্যে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে দেখিতে পাইয়া তিনি ঐকালে 'মা', 'মা' বলিতে বলিতে বাহ্যচৈতন্য হারাইয়াছিলেন এবং তাঁহার ইন্দ্রিয় সঙ্কুচিত হইয়া কূর্ম্মাঙ্গের ন্যায় শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া এবং তাঁহার বালকের ন্যায় ব্যবহারে মুগ্ধা হইয়া ঐ সকল নারীর হৃদয়ে বাৎসল্যের সঞ্চার হইয়াছিল। অনন্তর তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্যভঙ্গে প্রলোভিত করিতে যাইয়া অপরাধিনী হইয়াছে ভাবিয়া সজলনয়নে তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাঁহাকে বারম্বার প্রণামপূর্ব্বক তাহারা সশঙ্কচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল।

নবম অধ্যায়।

বিবাহ ও পুনরাগমন।

ঠাকুরের কামারপুকুরে আগমন।

এদিকে ঠাকুর পূজাকার্য্য ছাড়িয়া দিয়াছেন এই সংবাদ কামারপুকুরে তাঁহার মাতা ও ভ্রাতার কর্ণে পৌঁছিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ চিন্তান্বিত করিয়া তুলিল। রামকুমারের মৃত্যুর পর দুই বৎসর কাল যাইতে না যাইতে ঠাকুরকে বায়ুরোগাক্রান্ত হইতে শুনিয়া জননী চন্দ্রমণি দেবী এবং শ্রীযুত রামেশ্বর বিশেষ চিন্তিত হইলেন। লোকে বলে, মানবের অদৃষ্টে যখন দুঃখ আসে তখন একটিমাত্র দুর্ঘটনায় উহার পরিসমাপ্তি হয় না, কিন্তু নানাপ্রকারের দুঃখ চারিদিক হইতে উপর্য্যুপরি আসিয়া তাহার জীবনাকাশ এককালে আচ্ছন্ন করে— ইঁহাদিগের জীবনে এখন ঐরূপ হইল। গদাধর চন্দ্রাদেবীর পরিণত বয়সে প্রাপ্ত আদরের কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন। সুতরাং শোকে দুঃখে অধীরা হইয়া তিনি পুত্রকে বাটীতে ফিরাইয়া আনিলেন, এবং তাঁহার উদাসীন, চঞ্চল ভাব ও 'মা' 'মা' রবে কাতর ক্রন্দনে নিতান্ত ব্যাকুলা হইয়া প্রতীকারের নানারূপ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ঔষধাদি ব্যবহারের সহিত শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, ঝাড়ফুঁক্ প্রভৃতি নানা দৈব প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। তখন সন ১২৬৫ সালের আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাস হইবে।

বাটীতে ফিরিয়া ঠাকুর সময়ে সময়ে পূর্ব্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ থাকিলেও মধ্যে মধ্যে 'মা', 'মা' রবে ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতেন এবং কখন কখন ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন। তাঁহার চালচলন ব্যবহারাদি কখন সাধারণ মানবের ন্যায় এবং কখনও উহার

সম্পূর্ণ বিপরীত হইত। ঐ কারণে এখন তাঁহাতে সত্য, সরলতা, দেব ও মাতৃভক্তি এবং বয়স্যপ্রেমের একদিকে যেমন প্রকাশ দেখা যাইত, অপর দিকে তেমনি সাংসারিক সকল বিষয়ে উদাসীনতা, সাধারণের অপরিচিত বিষয়বিশেষ লাভের জন্য ব্যাকুলতা এবং লজ্জা ঘৃণা ও ভয়শূন্য হৃদয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিবার উদ্দাম চেষ্টা সতত লক্ষিত হইত। লোকের মনে উহাতে তাঁহার সম্বন্ধে এক অদ্ভুত বিশ্বাসের উদয় হইয়াছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল তিনি উপদেবতাবিষ্ট হইয়াছেন।

ঠাকুর উপদেবতাবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া আত্মীয়দিগের ধারণা।

ঠাকুরের মাতা, সরলহৃদয়া চন্দ্রাদেবীর প্রাণে সন্দেহের কথা ইতিপূর্ব্বে কখন কখন উদিত হইয়াছিল। এখন লোকের ঐরূপ আলোচনা কাণে উঠাতে তিনি পুত্রের কল্যাণের জন্য ওঝা আনাইতে মনোনীত করিলেন। ঠাকুর বলিতেন—"একদিন একজন ওঝা আসিয়া একটা মন্ত্রপূত সলিতা পুড়াইয়া শুঁকিতে দিল, বলিল, যদি ভূত হয় ত পলাইয়া যাইবে, কিন্তু কিছুই হইল না। পরে কয়েকজন প্রধান ওঝা পূজাদি করিয়া একদিন রাত্রিকালে চণ্ড নামাইল। চণ্ড পূজা ও বলি গ্রহণপূর্ব্বক প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে বলিল, 'উহাকে ভূতে পায় নাই বা উহার কোন ব্যাধি হয় নাই।'—পরে সকলের সমক্ষে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—'গদাই, তুমি সাধু হইতে চাও, তবে অত সুপারী খাও কেন? অধিক সুপারী খাইলে কাম বৃদ্ধি হয়।' ইতিপূর্ব্বে সত্যই আমি সুপারী খাইতে বড় ভালবাসিতাম এবং যখন তখন খাইতাম; চণ্ডের কথাতে উহা তদবধি ত্যাগ করিলাম।" ঠাকুরের বয়স তখন ত্রয়োবিংশতি বর্ষ পূর্ণ হইতে চলিয়াছে।

ওঝা আনাইয়া চণ্ড নামান।

কামারপুকুরে কয়েক মাস থাকিবার পরে তিনি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার অদ্ভুত দর্শনাদি লাভ করিয়াই তিনি এখন শান্ত হইতে পারিয়াছিলেন। এই সময়ের অনেক কথা আমরা তাঁহার আত্মীয়বর্গের নিকট শুনিয়াছি। তাহাতেই আমাদিগের মনে ঐরূপ ধারণা হইয়াছে। অতঃপর ঐ সকল কথা আমরা পাঠককে বলিব।

ঠাকুরের প্রকৃতিস্থ হইবার কারণসম্বন্ধে তাঁহার আত্মীয়বর্গের কথা।

কামারপুকুরের পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তদ্বয়ে অবস্থিত 'ভূতির খাল' এবং 'বুধুই মোড়ল' নামক শ্মশানদ্বয়ে দিবা ও রাত্রির অনেক ভাগ তিনি একাকী অতিবাহিত করিতেন। তাঁহাতে অদৃষ্টপূর্ব্ব শক্তিপ্রকাশের কথাও তাঁহার আত্মীয়েরা এইকালে জানিতে পারিয়াছিলেন। ইহাদিগের নিকটে শুনিয়াছি, পূর্ব্বোক্ত শ্মশানদ্বয়ে অবস্থিত শিবা এবং উপদেবতাদিগকে তিনি এই সময়ে মধ্যে মধ্যে বলি প্রদান করিতেন। নূতন হাঁড়িতে মিষ্টান্নাদি খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহপূর্ব্বক ঐ স্থানদ্বয়ে গমন করিয়া বলি নিবেদন করিবামাত্র শিবাসমূহ দলে দলে চারিদিক হইতে আসিয়া উহা খাইয়া ফেলিত এবং উপদেবতাদিগকে নিবেদিত খাদ্যপূর্ণ হাঁড়ি সকল বায়ুভরে ঊর্দ্ধে উঠিয়া শূন্যে লীন হইয়া যাইত। ঐ সকল উপদেবতাকে তিনি অনেক সময় দেখিতে পাইতেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইলেও কনিষ্ঠকে কোন কোন দিন গৃহে ফিরিতে না দেখিয়া ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুত রামেশ্বর শ্মশানের নিকটে যাইয়া ভ্রাতার নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে থাকিতেন। ঠাকুর উহাতে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য উচ্চকণ্ঠে বলিতেন, 'যাচ্ছি গো দাদা; তুমি এদিকে আর অগ্রসর হইও না, তাহা হইলে ইহারা (উপদেবতারা) তোমার অপকার করিবে।' ভূতির খালের পার্শ্বস্থ শ্মশানে

তিনি এই সময়ে একটি বিল্ববৃক্ষ স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলেন এবং শ্মশানমধ্যে যে প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল তাহার তলে বসিয়া অনেক সময় জপ-ধ্যানে অতিবাহিত করিতেন। ঠাকুরের আত্মীয়বর্গের ঐ সকল কথায় বুঝিতে পারা যায়, জগদম্বার দর্শনলালসায় তিনি ইতিপূর্ব্বে যে বিষম অভাব প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা কতকগুলি অপূর্ব্ব দর্শন ও উপলব্ধি দ্বারা এই সময়ে প্রশমিত হইয়াছিল। তাঁহার এই কালের জীবনালোচনা করিয়া মনে হয় শ্রীশ্রীজগদম্বার [illegible], বরাভয়করা, সাধকানুগ্রহকারিণী চিন্ময়ী মূর্ত্তির দর্শন, তিনি এখন প্রায় সর্ব্বদা লাভ করিতেছিলেন এবং তাঁহাকে যখন যাহা প্রশ্ন করিতেছিলেন তাহার উত্তর পাইয়া তদনুসারে নিজ জীবন চালিত করিতেছিলেন। মনে হয়, এখন হইতে তাঁহার প্রাণে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, শ্রীশ্রীজগন্মাতার বাধামাত্রশূন্য নিরন্তর দর্শন তাঁহার ভাগ্যে অচিরে উপস্থিত হইবে।

ঐ কালে ঠাকুরের যোগবিভূতির কথা।

ভবিষ্যৎ দর্শনরূপ বিভূতির প্রকাশও এইকালে ঠাকুরের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। হৃদয়রাম এবং কামার-পুকুর ও জয়রামবাটীর অনেকে ঐ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে আমরা ঐকথার ইঙ্গিত কখন কখন পাইয়াছি। নিম্নলিখিত ঘটনাবলী হইতে পাঠক উহা বুঝিতে পারিবেন।

ঠাকুরের ব্যবহার ও কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাঁহার মাতা প্রভৃতির ধারণা হইয়াছিল, দৈবকৃপায় তাঁহার বায়ুরোগের এখন অনেকটা শান্তি হইয়াছে। কারণ, তাঁহারা দেখিতেছিলেন, তিনি এখন পূর্ব্বের ন্যায় ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করেন না, আহারাদি যথাসময়ে করেন এবং প্রায় সকল বিষয়ে জনসাধারণের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন। সর্ব্বদা ঠাকুর-দেবতা লইয়া থাকা, শ্মশানে বিচরণ করা, পরিধেয়

বসন ত্যাগপূর্ব্বক কখন কখন ধ্যান পূজাদির অনুষ্ঠান এবং ঐবিষয়ে কাহারও নিষেধ না মানা প্রভৃতি কয়েকটি ব্যবহার অনন্যসাধারণ হইলেও, তিনি চিরকাল করিতেন বলিয়া ঐ সকলে তাঁহারা বায়ু-রোগের পরিচয় পাইবার কারণ দেখেন নাই।

ঠাকুরকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া আত্মীয়বর্গের বিবাহদানের সঙ্কল্প।

কিন্তু সাংসারিক সকল বিষয়ে তাঁহার পূর্ণমাত্রায় উদাসীনতা এবং নিরন্তর উন্মনাভাব দূর করিবার জন্য তাঁহারা এখনও বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। সাংসারিক বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া পূর্ব্বোক্ত ভাবটা যতদিন না প্রশমিত হইতেছে ততদিন বায়ুরোগে পুনরাক্রান্ত হইবার তাঁহার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে—একথা তাঁহাদের মনে পুনঃ পুনঃ উদিত হইত। উহার হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য ঠাকুরের স্নেহময়ী মাতা ও অগ্রজ এখন উপযুক্ত পাত্রী দেখিয়া তাঁহার বিবাহ দিবার পরামর্শ স্থির করিলেন। কারণ, সদ্বংশজা সুশীলা স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা পড়িলে তাঁহার মন নানা বিষয়ে সঞ্চরণ না করিয়া নিজ সাংসারিক অবস্থার উন্নতি সাধনেই বদ্ধ থাকিবে।

গদাধর জানিতে পারিলে পাছে ওজর আপত্তি করে এজন্য মাতা ও পুত্রে পূর্ব্বোক্ত পরামর্শ অন্তরালে হইয়াছিল।

ঠাকুরের বিবাহে সম্মতিদানের কথা।

চতুর গদাধরের কিন্তু ঐ বিষয় জানিতে অধিক বিলম্ব হয় নাই। জানিতে পারিয়াও তিনি উহাতে কোনরূপ আপত্তি করেন নাই। বাটীতে কোন একটা অভিনব ব্যাপার উপস্থিত হইলে বালকবালিকারা যেরূপ আনন্দ করিয়া থাকে তদ্রূপ আচরণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকটে নিবেদন করিয়া ঐ বিষয়ে কিংকর্ত্তব্য জানিয়াই কি তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন—অথবা, বালকের ন্যায় ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ও চিন্তারাহিত্যই তাঁহার ঐরূপ করিবার কারণ? পাঠক

দেখিতে পাইবেন, আমরা ঐ সম্বন্ধে অন্যত্র যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি।*

বিবাহের জন্য ঠাকুরের পাত্রী নির্ব্বাচন।

যাহা হউক, চারিদিকের গ্রামসকলে লোক প্রেরিত হইল কিন্তু মনোমত পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেল না। যে কয়েকটি পাওয়া গেল তাহাদের পিতা মাতা অত্যধিক পণ যাচ্ঞা করায় রামেশ্বর ঐ সকল স্থানে ভ্রাতার বিবাহ দিতে সাহস করিলেন না। ঐরূপে বহু অনুসন্ধানেও পাত্রী মিলিতেছে না দেখিয়া চন্দ্রাদেবী ও রামেশ্বর যখন নিতান্ত বিরস ও চিন্তামগ্ন হইয়াছেন তখন ভাবাবিষ্ট হইয়া গদাধর এক দিবস তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—'অন্যত্র অনুসন্ধান বৃথা জয়রামবাটী গ্রামের শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে বিবাহের পাত্রী কুটাবাঁধা হইয়া রক্ষিতা আছে!'!

বিবাহ।

ঐ কথায় বিশ্বাস না করিলেও ঠাকুরের মাতা ও ভ্রাতা ঐ স্থানে অনুসন্ধান করিতে লোক প্রেরণ করিলেন। লোক যাইয়া সংবাদ আনিল, অন্য সকল বিষয়ে যাহাই হউক পাত্রী কিন্তু নিতান্ত বালিকা, বয়স—পঞ্চম বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে।† ঐরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে সন্ধানলাভে চন্দ্রাদেবী ঐস্থানেই পুত্রের বিবাহ দিতে স্বীকৃতা হইলেন এবং অল্প দিনেই সকল বিষয়ের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেল। অনন্তর শুভদিনে শুভ মুহূর্ত্তে শ্রীযুত রামেশ্বর কামারপুকুরের দুই ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত জয়রামবাটী গ্রামে ভ্রাতাকে লইয়া যাইয়া শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চমবর্ষীয়া একমাত্র কন্যার সহিত শুভ-পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া আসিলেন। বিবাহে তিন শত টাকা পণ লাগিল। তখন সন ১২৬৬

---

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৪র্থ অধ্যায়।

† গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৪র্থ অধ্যায়।

সালের বৈশাখ মাসের শেষভাগ এবং ঠাকুর চতুর্ব্বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন।

বিবাহের পরে শ্রীমতী চন্দ্রমণি এবং ঠাকুরের আচরণ।

গদাধরের বিবাহ দিয়া শ্রীমতী চন্দ্রমণি অনেকটা নিশ্চিন্তা হইয়াছিলেন। বিবাহবিষয়ে তাঁহার নিয়োগ পুত্রকে সম্পন্ন করিতে দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন দেবতা এতদিনে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। উন্মনা পুত্র গৃহে ফিরিল, সদ্বংশীয়া পাত্রী জুটিল, অর্থের অনটনও অচিন্তনীয়ভাবে পূর্ণ হইল, অতএব দৈব অনুকূল নহেন, একথা আর কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? সুতরাং সরলহৃদয়া ধর্ম্মপরায়ণা চন্দ্রাদেবী যে এখন কথঞ্চিৎ সুখী হইয়াছিলেন, একথা আমরা বলিতে পারি। কিন্তু বৈবাহিকের মনস্তুষ্টি ও কাহিরের সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য জমীদার বন্ধু লাহাবাবুদের বাটী হইতে যে গহনাগুলি চাহিয়া বধূকে বিবাহের দিনে সাজাইয়া আনিয়াছিলেন কয়েক দিন পরে ঐগুলি ফিরাইয়া দিবার সময় যখন উপস্থিত হইল তখন তিনি যে আবার নিজ সংসারের দারিদ্র্যচিন্তায় অভিভূতা হইয়াছিলেন, ইহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। নববধূকে তিনি বিবাহের দিন হইতে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। বালিকার অঙ্গ হইতে অলঙ্কারগুলি তিনি কোন্ প্রাণে খুলিয়া লইবেন, এই চিন্তায় বৃদ্ধার চক্ষু এখন জলপূর্ণ হইয়াছিল। অন্তরের কথা তিনি কাহাকেও না বলিলেও গদাধরের উহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। তিনি মাতাকে শান্ত করিয়া নিদ্রিতা বধূর অঙ্গ হইতে গহনাগুলি এমন কৌশলে খুলিয়া লইয়াছিলেন যে, বালিকা উহা কিছুই জানিতে পারে নাই। বুদ্ধিমতী বালিকা কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে বলিয়াছিল, 'আমার গায়ে যে এইরূপ সব গহনা ছিল তাহা কোথায় গেল?' চন্দ্রাদেবী তাহাতে সজলনয়নে তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া

সান্ত্বনা প্রদানের জন্য বলিয়াছিলেন, 'মা! গদাধর তোমাকে ঐ সকলের অপেক্ষাও উত্তম অলঙ্কার সকল ইহার পর কত দিবে!' এইখানেই কিন্তু ঐ বিষয়ের পরিসমাপ্তি হইল না। কন্যার খুল্লতাত তাহাকে ঐ দিন দেখিতে আসিয়া ঐ কথা জানিয়াছিলেন এবং অসন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক ঐ দিনেই তাহাকে পিত্রালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন। মাতার মনে ঐ ঘটনায় বিশেষ বেদনা উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া গদাধর তাঁহার ঐ দুঃখ দূর করিবার জন্য পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন, 'উহারা এখন যাহাই বলুক ও করুক না, বিবাহ ত আর ফিরিবে না?'

ঠাকুরের কলিকাতায় পুনরাগমন।

বিবাহের পরে ঠাকুর প্রায় এক বৎসর সাত মাস কাল কামারপুকুরেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বোধ হয়, শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ না হইলে কলিকাতায় ফিরিলে পুনরায় তাঁহার বায়ুরোগ হইতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী তাঁহাকে সহসা যাইতে দেন নাই। যাহা হউক, সন ১২৬৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বধূ সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিলে কুলপ্রথানুসারে তাঁহাকে কয়েক দিনের জন্য শ্বশুরালয়ে গমনপূর্ব্বক শুভদিন দেখিয়া পত্নীর সহিত একত্রে কামারপুকুরে আগমন করিতে হইয়াছিল। ঐরূপে 'যোড়ে' আসিবার অনতিকাল পরে তিনি কলিকাতায় ফিরিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। মাতা ও ভ্রাতা তাঁহাকে কামারপুকুরে আরও কিছুকাল অবস্থান করিতে বলিলেও সংসারের অভাব অনটনের কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না। ঐ কারণে তাঁহাদিগের কথা না শুনিয়া তিনি কালীবাটীতে ফিরিয়া পূর্ব্ববৎ শ্রীশ্রীজগদম্বার সেবাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া কয়েক দিন পূজা করিতে না করিতেই

তাঁহার মন ঐ কার্য্যে এত তন্ময় হইয়া যাইল যে, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, সংসার, অনটন প্রভৃতি কামারপুকুরের সকল কথা তাঁহার মনের এক নিভৃত কোণে চাপা পড়িয়া গেল, এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে সকল সময়ে, সকলের মধ্যে কিরূপে দেখিতে পাইবেন—এই বিষয়ই উহার সকল স্থল অধিকার করিয়া বসিল। দিবারাত্র স্মরণ, মনন, জপ, ধ্যানে তাঁহার বক্ষ পুনরায় সর্ব্বক্ষণ আরক্তিম-ভাব ধারণ করিল, সংসার ও সাংসারিক বিষয়ের প্রসঙ্গ বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল, বিষম গাত্রদাহ পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং নয়নকোণ হইতে নিদ্রা যেন দূরে কোথায় অপসৃত হইল! তবে, শারীরিক ও মানসিক ঐ প্রকার অবস্থা ইতিপূর্ব্বে একবার অনুভব করায় তিনি উহাতে পূর্ব্বের ন্যায় এককালে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন না।

ঠাকুরের দ্বিতীয়বার দেবোন্মাদ অবস্থা।

হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, মথুর বাবুর নির্দ্দেশে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ, ঠাকুরের বায়ুপ্রকোপ, অনিদ্রা ও গাত্রদাহাদি রোগের উপশমের জন্য এইকালে নানাপ্রকার ঔষধ ও তৈল ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চিকিৎসায় আশু ফল না পাইলেও হৃদয়, নিরাশ না হইয়া মধ্যে মধ্যে ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া কবিরাজের কলিকাতাস্থ ভবনে উপস্থিত হইত। ঠাকুর বলিতেন, "একদিন ঐরূপে গঙ্গাপ্রসাদের ভবনে উপস্থিত হইলে তিনি চিকিৎসায় আশানুরূপ ফল হইতেছে না দেখিয়া চিন্তিত হইলেন এবং বিশেষরূপে পরীক্ষাপূর্ব্বক নূতন ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ববঙ্গীয় অন্য একজন বৈদ্যও তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। রোগের লক্ষণ সকল শ্রবণ করিতে করিতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'ইঁহার দেবোন্মাদ অবস্থা বলিয়া বোধ হইতেছে; উহা যোগজ ব্যাধি;

ঔষধে সারিবার নহে।'* ঐ বৈদ্যই ব্যাধির ন্যায় প্রতীয়মান আমার শারীরিক বিকারসমূহের যথার্থ কারণ প্রথম নির্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহই তখন তাঁহার কথায় আস্থা প্রদান করে নাই।" ঐরূপে মথুর বাবু প্রমুখ ঠাকুরের হিতৈষী বন্ধুবর্গ তাঁহার অসাধারণ ব্যাধির জন্য চিন্তান্বিত হইয়া নানারূপে চিকিৎসা করাইয়াছিলেন। রোগের কিন্তু ক্রমশঃ বৃদ্ধি ভিন্ন উপশম হয় নাই।

সংবাদ ক্রমে কামারপুকুরে পৌঁছিল। শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী উপায়ান্তর না দেখিয়া পুত্রের কল্যাণকামনায় ৺মহাদেবের নিকট হত্যা দিবার সংকল্প স্থির করিলেন, এবং কামারপুকুরের 'বুড়ো শিব'কে জাগ্রত দেবতা জানিয়া তাঁহারই মন্দির প্রান্তে প্রায়োপবেশন করিয়া পড়িয়া রহিলেন। 'মুকুন্দপুরের শিবের নিকট হত্যা দিলে তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে,' তিনি এখানে এইরূপ প্রত্যাদেশ লাভ করিলেন এবং তথায় গমন পূর্ব্বক পুনরায় প্রায়োপবেশনের অনুষ্ঠান করিলেন। মুকুন্দপুরের শিবের নিকট ইতিপূর্ব্বে কামনা পূরণের জন্য কেহ হত্যা দিত না। প্রত্যাদিষ্টা বৃদ্ধা উহা জানিয়াও মনে কিছুমাত্র দ্বিধা করিলেন না। দুই তিন দিন পরেই তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, জলদজটাসুশোভিত বাঘাম্বর পরিহিত রজতধবলকান্তি মহাদেব সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দানপূর্ব্বক বলিতেছেন—'ভয় নাই, তোমার পুত্র পাগল হয় নাই, ঈশ্বরিক আবেশে তাহার ঐরূপ অবস্থা হইয়াছে।' ধর্ম্মপরায়ণা বৃদ্ধা ঐরূপ দেবাদেশলাভে আশ্বস্তা হইয়া ভক্তিপূতচিত্তে শ্রীশ্রীমহাদেবের পূজা দিয়া গৃহে ফিরিলেন এবং পুত্রের মানসিক বিকার শান্তির জন্য কুলদেবতা ৺রঘুবীর ও ৺শীতলা মাতার একমনে

চন্দ্রাদেবীর হত্যাদান।

* কেহ কেহ বলেন, ৺গঙ্গাপ্রসাদের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদই ঠাকুরকে ঐ কথা বলিয়াছিলেন

সেবা করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি, মুকুন্দপুরের শিবের নিকট তদবধি অনেক নরনারী প্রতি বৎসর হত্যা দিয়া সকলকাম হইতেছে।

ঠাকুর তাঁহার এই কালের দিব্যোন্মাদ অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া আমাদিগকে কত সময় বলিয়াছেন—"আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাবল্যে সাধারণ জীবের শরীর-মনে ঐরূপ হওয়া দূরে থাকুক উহার এক চতুর্থাংশ বিকার উপস্থিত হইলে শরীর ত্যাগ হয়; দিবা-রাত্রির অধিকাংশ ভাগ, মা'র কোন না কোনরূপ দর্শনাদি পাইয়া ভুলিয়া থাকিতাম তাই রক্ষা, নতুবা (নিজ শরীর দেখাইয়া) এ খোলটা থাকা অসম্ভব হইত!

ঠাকুরের এই কালের অবস্থা।

এখন হইতে আরম্ভ হইয়া দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল তিলমাত্র নিদ্রা হয় নাই। চক্ষু পলকশূন্য হইয়া গিয়াছিল, সময়ে সময়ে চেষ্টা করিয়াও পলক ফেলিতে পারিতাম না। কত কাল গত হইল, তাহার জ্ঞান থাকিত না এবং শরীর বাঁচাইয়া চলিতে হইবে একথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। শরীরের দিকে যখন একটু আধটু দৃষ্টি পড়িত তখন উহার অবস্থা দেখিয়া বিষম ভয় হইত; ভাবিতাম, পাগল হইতে বসিয়াছি নাকি? দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চক্ষে অঙ্গুলি প্রদানপূর্ব্বক দেখিতাম, চক্ষুর পলক উহাতেও পড়ে কি না। তাহাতেও চক্ষু সমভাবে পলক-শূন্য হইয়া থাকিত! ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিতাম এবং মাকে বলিতাম—'মা, তোকে ডাকার ও তোর উপর একান্ত বিশ্বাস নির্ভর করার কি এই ফল হ'ল? শরীরে বিষম ব্যাধি দিলি?' আবার পরক্ষণেই বলিতাম, 'তা যা হবার হকগে, শরীর যায় যাক, তুই কিন্তু আমায় ছাড়িস্ নি, আমায় দেখা দে, কৃপা কর্, আমি যে মা তোর পাদপদ্মে একান্ত শরণ নিয়েছি, তুই ভিন্ন আমার যে, আর অন্য গতি একেবারেই নাই!' ঐরূপে কাঁদিতে কাঁদিতে মন আবার অদ্ভুত উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া উঠিত, শরীরটাকে অতি তুচ্ছ হেয়

বলিয়া মনে হইত এবং মার দর্শন ও অভয়বাণী শুনিয়া আশ্বস্ত হইতাম!”

মথুর বাবুর ঠাকুরকে শিব-কালীরূপে দর্শন।

শ্রীশ্রীজগন্মাতার অচিন্ত্য নিয়োগে মথুর বাবু এই সময়ে এক দিন ঠাকুরের মধ্যে অদ্ভুত দেবপ্রকাশ অযাচিতভাবে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। কিরূপে তিনি সেদিন ঠাকুরের ভিতর শিব ও কালীমূর্ত্তি সন্দর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে জীবন্ত দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা অন্যত্র বলিয়াছি।* ঐ দিন হইতে তিনি যেন দৈবশক্তিপ্রভাবে ঠাকুরকে ভিন্ন নয়নে দেখিতে এবং সর্ব্বদা ভক্তি বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঐরূপ অঘটন ঘটনা দেখিয়া স্পষ্ট মনে হয়, ঠাকুরের সাধকজীবনে এখন হইতে মথুরের সহায়তা ও আনুকূল্যের বিশেষ প্রয়োজন হইবে বলিয়াই ইচ্ছাময়ী জগন্মাতা তাঁহাদিগের উভয়কে অবিচ্ছিন্ন প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। সন্দেহবাদ, জড়বাদ ও নাস্তিক্যপ্রবণ বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মগ্লানি দূর করিয়া জীবন্ত অধ্যাত্মশক্তি সংক্রমণের জন্য ঠাকুরের শরীরমনরূপ যন্ত্রটিকে শ্রীশ্রীজগদম্বা কতরূপে ও কি অদ্ভুত উপায় অবলম্বনে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ঐরূপ ঘটনাবলীতে তাহার প্রমাণ পাইয়া স্তম্ভিত হইতে হয়।

* গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ—৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

ভৈরবী-ব্রাহ্মণী-সমাগম।

রাণী রাসমণির সাংঘাতিক পীড়া।

সন ১২৬৭ সালের শেষভাগে, ইংরাজী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার পরে ঠাকুরের জীবনে দুইটি ঘটনা সমুপস্থিত হয়। ঘটনা দুইটি তাঁহার জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়াছিল, সেজন্য উহাদের কথা আমাদিগের আলোচনা করা আবশ্যক। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে রাণী রাসমণি গ্রহণীরোগে আক্রান্তা হয়েন। ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি, রাণী ঐ সময়ে একদিন সহসা পড়িয়া যান। উহাতেই জ্বর, গাত্রবেদনা ও অজীর্ণাদি ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হইয়া, উক্ত রোগের সঞ্চার করে। ব্যাধি স্বল্পকাল মধ্যে সাংঘাতিক ভাব ধারণ করিয়াছিল।

রাণীর দিনাজপুরের সম্পত্তি দানপত্র করণ ও মৃত্যু।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, সন ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসের ৩১শে তারিখে, বৃহস্পতিবারে রাণী দক্ষিণেশ্বরে দেবী-প্রতিষ্ঠা করেন। ঠাকুরবাটীর ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য তিনি ঐ বৎসর ১৪ই ভাদ্র, ইংরাজী ২৯শে আগষ্ট তারিখে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত তিন লাট জমিদারী দুই লক্ষ ছাব্বিশ সহস্র মুদ্রায় ক্রয় করিয়াছিলেন।* কিন্তু মনে মনে সঙ্কল্প

---

* Plaint in High Court Suit No 308 of 1872 Puddomoni Dasee vs Jagadamba Dasoee, recites the following from the Deed of

থাকিলেও, এতদিন তিনি ঐ সম্পত্তি দানপত্র করিয়া দেবোত্তরে পরিণত করেন নাই। আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া উহা করিবার জন্য তিনি এখন ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রাণীর চারি কন্যার মধ্যে মধ্যমা ও তৃতীয়া শ্রীমতী কুমারী ও শ্রীমতী করুণাময়ী দাসীর কালীবাটী প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই মৃত্যু হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা কন্যাদ্বয়, শ্রীমতী পদ্মমণি ও শ্রীমতি জগদম্বা দাসীই উপস্থিত ছিলেন। দানপত্র সম্পন্ন করিবার কালে তিনি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া উক্ত সম্পত্তির অন্যথা নিয়োগের পথ এককালে রুদ্ধ করিবার মানসে নিজ কন্যাদ্বয়কে দেবোত্তর করিবার সম্মতি প্রদানপূর্ব্বক ভিন্ন এক অঙ্গীকারপত্রে সহি করিতে বলিয়াছিলেন। শ্রীমতী জগদম্বা উক্ত পত্রে সহি প্রদান করিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠা কন্যা পদ্মমণি বহু অনুরোধেও উহাতে সহি দিলেন না। সেজন্য মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও রাণী শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। অগত্যা, ৺জগদম্বার ইচ্ছায় যাহা হইবার হইবে জানিয়া রাণী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দেবোত্তর দানপত্রে সহি করিলেন * এবং ঐ কার্য্য সমাধা করিবার পরদিন, ১৯শে ফেব্রুয়ারী

Endowment Executed by Rani Rasmoni According to my late husband's desire * * * I on 18th Jaisthi 1262 B S (31st May 1855) established and consecrated the *Thakurs* * * * and for purpose of carrying on the *Sheba* purchased three lots of Zemindaries in District Dinajpur on 14th Bhadra 1262 B S (29th August 1855) for Rs 2,26,000 "

* The Deed of Endowment dated 18th February 1861 was executed by Rani Rosmani, she acknowledged her execution of the same before J F Watkins, Solicitor, Calcutta This dedication was accepted as valid by all parties in Alipore Suit No 47 of 1867.

তারিখে রাত্রিকালে শরীর ত্যাগ করিয়া ৺দেবীলোকে গমন করিলেন।

ঠাকুর বলিতেন শরীরত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্বে রাণী রাসমণি ৺কালীঘাটে আদিগঙ্গাতীরস্থ বাটীতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। দেহরক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে, তাঁহাকে গঙ্গাগর্ভে আনয়ন করা হইলে সম্মুখে অনেকগুলি আলোক জ্বালা রহিয়াছে দেখিয়া, তিনি সহসা বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "সরিয়ে দে, সরিয়ে দে, ও সব রোস্‌নাই আর ভাল লাগছে না, এখন আমার মা (শ্রীশ্রীজগন্মাতা) আস্‌ছেন, তাঁর শ্রীঅঙ্গের প্রভায় চারিদিক আলোকময় হ'য়ে উঠেছে।" (কিছুক্ষণ পরে) "মা এলে! পদ্ম যে সহি দিলে না—কি হবে মা?" ঐ কথার উত্তর প্রদান করিয়াই যেন শিবাকুল ঐ সময়ে চারিদিক হইতে উচ্চ রবে ডাকিয়া উঠিল। কথাগুলি বলিয়াই পুণ্যবতী রাণী শান্তভাবে মাতৃক্রোড়ে মহাসমাধিতে শয়ন করিলেন।—রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে।

শরীর রক্ষা করিবার কালে রাণীর দর্শন।

কালীবাটীর দেবোত্তর সম্পত্তি লইয়া রাণী রাসমণির দৌহিত্রগণের মধ্যে উত্তরকালে যে বহুল বিবাদ-বিসম্বাদ ও মোকদ্দমা চলিতেছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়—তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্না রাণী তাঁহার প্রাণস্বরূপ দেবীসেবার বন্দোবস্ত যথাযথ থাকিবে না বলিয়া কেন অত আশঙ্কা করিয়াছিলেন এবং কেনই বা ব্যাধির যন্ত্রণাপেক্ষা ঐ চিন্তার যন্ত্রণা মৃত্যুকালে তাঁহার নিকট তীব্রতর বলিয়া

রাণী মৃত্যুকালে যাহা আশঙ্কা করেন, তাহাই হইতে বসিয়াছে।

Jadu Nath Chowdhury vs. Puddomoni, and in the High Court Suit No 308 of 1872 Puddomoni vs Jagadamba and also when that Suit (No 308) was revived after contest on 19th July 1888.

অনুভূত হইয়াছিল। আদালতের কাগজপত্রে দেখা যায়, ঐ সকল মোকদ্দমার বহুল ব্যয়ের জন্য ঐ দেবোত্তর সম্পত্তি ঋণগ্রস্ত হইয়া ক্রমশঃ কিঞ্চিন্ন্যূন লক্ষ মুদ্রায় বাঁধা পড়িয়াছে।* কে বলিবে, রাণী রাসমণির অদ্বিতীয় দৈবকীর্ত্তি ঐ বিবাদের ফলে নামমাত্রে পর্য্যবসিত এবং ক্রমে লুপ্ত হইবে কি না।

মথুর বাবুর সাংসারিক উন্নতি ও দেবসেবার বন্দোবস্ত।

রাণীর কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুত মথুরামোহন বিশ্বাস বিষয়সংক্রান্ত সকল কার্য্য পরিচালনায় তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠার কাল হইতে তিনি কালীবাটীর দেবোত্তর সম্পত্তির আয়ব্যয় বুঝিয়া লইয়া রাণীর ইচ্ছামত সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। সুতরাং রাণীর মৃত্যুর পরে তিনিই দেবসেবাসংক্রান্ত সকল কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় পরিচালনা করিতে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র প্রভাবে দেবতাভক্তি মথুরামোহনের অন্তরে বিশেষ আধিপত্য বিস্তৃত করায়, দক্ষিণেশ্বরের মাতৃসেবা রাণীর মৃত্যুতে কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।

মথুর বাবুর ভক্তি ও আধিপত্য ঠাকুরের সহায়তা করিবার জন্য।

ঠাকুরের সহিত মথুর বাবুর বিচিত্র সম্বন্ধের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেকস্থলে বলিয়াছি অতএব এখানে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখানে কেবলমাত্র এই কথা বলিলেই চলিবে যে, দীর্ঘকালব্যাপী তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহ ঠাকুরের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে রাণী রাসমণির স্বর্গারোহণ ও কালীবাটীসংক্রান্ত সকল বিষয়ে মথুরামোহনের একাধিপত্যরূপ ঘটনা উপস্থিত

* Debt due on mortgage by the Estate is Rs 50,000, interest payable quarterly is Rs 876-0-0. Costs of the Referee already stated amount to Rs 20,000, as yet untaxed

হওয়ায়, ভক্তিমান্ মথুর তাঁহাকে ঐ বিষয়ে সহায়তা করিবার বিশেষ অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনে হয়, মথুরের উক্ত আধিপত্যলাভ যেন ঠাকুরকে সহায়তা করিবার জন্যই উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ দেখা যায়, দেবতাজ্ঞানে ঠাকুরের সেবা করাই এখন হইতে তাঁহার নিকটে সর্ব্বপ্রধান কার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল সমভাবে এক বিষয়ে বিশ্বাসী থাকিয়া উচ্চভাবাশ্রয়ে জীবন অতিবাহিত করা একমাত্র ঈশ্বরকৃপাতেই সম্ভবপর হয়। অতএব রাণীর বিপুল বিষয়ে একাধিপত্য লাভপূর্ব্বক বিপথগামী না হইয়া মথুরামোহন যে ঠাকুরের প্রতি দিন দিন অধিকতর বিশ্বাসসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং এখন হইতে দীর্ঘ একাদশ বৎসর কাল তাঁহার সেবায় আপনাকে সমভাবে নিযুক্ত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ইহাতে তাঁহার পরম ভাগ্যের কথা বুঝিতে পারা যায়।

ঠাকুরের সম্বন্ধে ইতর-সাধারণের ও মথুরের ধারণা।

ঈশ্বরসাধক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি ঠাকুরের দিব্যোন্মাদ অবস্থার অসাধারণ উচ্চতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণা করিতে পারে নাই। মানব-সাধারণ তাঁহাকে বিকৃত-মস্তিষ্ক বলিয়া স্থির করিয়াছিল। কারণ, তাহারা দেখিয়াছিল, তিনি সর্ব্বপ্রকার পার্থিব ভোগসুখ লাভে পরাঙ্মুখ হইয়া তাহাদিগের বুদ্ধির অগোচর একটা অনির্দ্দিষ্ট ভাবে বিভোর থাকিয়া কখন 'হরি,' কখন 'রাম', এবং কখন বা 'কালী' 'কালী,' বলিয়া দিন কাটাইয়া দেন। আবার রাণী রাসমণি ও মথুর বাবুর কৃপা প্রাপ্ত হইয়া কত লোকে ধনী হইয়া যাইল, তিনি কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের সুনয়নে পড়িয়াও আপনার সাংসারিক উন্নতির কিছুই করিয়া লইতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি হিতাহিত জ্ঞান শূন্য উন্মাদ ভিন্ন অপর কি হইবেন? একথা কিন্তু সকলে বুঝিয়াছিল যে, সাংসারিক সকল বিষয়ে অকর্ম্মণ্য

হইলেও এই উন্মাদের উজ্জ্বল নয়নে, অদৃষ্টপূর্ব্ব চালচলনে, মধুর কণ্ঠস্বরে, সুললিত বাক্যবিন্যাসে এবং অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে এমন একটা কি আকর্ষণ আছে, যাহাতে তাহারা যে সকল ধনী মানী পণ্ডিত ব্যক্তির সম্মুখে অগ্রসর হইতেও সঙ্কোচ বোধ করে, সেই সকল লোকের সম্মুখে ইনি কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া উপস্থিত হন এবং অচিরে তাঁহাদিগের প্রিয় হইয়া উঠেন। ইতরসাধারণ মানব এবং কালীবাটীর কর্ম্মচারীরা ঐরূপ ভাবিলেও, মথুর বাবু কিন্তু এখন অন্যরূপ ভাবিতেন। মথুরামোহন বলিতেন, "শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপা হইয়াছে বলিয়াই উঁহার ঐ প্রকার উন্মত্তবৎ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।"

রাণী রাসমণির মৃত্যুর স্বল্পকাল পরে ঠাকুরের জীবনে ঐ বৎসর আর একটি বিশেষ ঘটনা সমুপস্থিত হয়।

ভৈরবী ব্রাহ্মণীর আগমন।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর পশ্চিমভাগে গঙ্গাতীরে সুবৃহৎ পোস্তার উপর এইকালে বিচিত্র পুষ্প-কানন ছিল। সযত্ন-রক্ষিত ঐ উদ্যানে নানাজাতীয় পুষ্পসম্ভারে ভূষিত হইয়া বৃক্ষলতাদি তখন বিচিত্র শোভা বিস্তার করিত, এবং মধুগন্ধে দিক আমোদিত হইত। শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা না করিলেও, ঠাকুর এই সময়ে নিত্য ঐ কাননে পুষ্পচয়ন করিতেন এবং মাল্য রচনা করিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকে স্বহস্তে সাজাইতেন। ঐ কাননের মধ্যভাগে গঙ্গাগর্ভ হইতে মন্দিরে যাইবার চাঁদনী-শোভিত বিস্তৃত সোপানাবলী এবং উত্তরে, পোস্তার শেষে স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহারের জন্য একটি বাঁধাঘাট ও নহবৎখানা অদ্যাপি বর্ত্তমান। বাঁধা ঘাটটির উপরে একটি বৃহৎ বকুল বৃক্ষ বিদ্যমান থাকায়, লোকে উহাকে বকুলতলার ঘাট বলিয়া নির্দ্দেশ করিত।

ঠাকুর একদিন প্রাতে পুষ্পচয়ন করিতেছেন, এমন সময়ে একখানি নৌকা বকুলতলার ঘাটে আসিয়া লাগিল এবং গৈরিকবস্ত্র-পরিহিতা আলুলায়িত-দীর্ঘ-কেশা, ভৈরবীবেশধারিণী এক সুন্দরী রমণী উহা হইতে অবতরণপূর্ব্বক দক্ষিণেশ্বর ঘাটের চাঁদনীর দিকে অগ্রসর হইলেন। প্রৌঢ়া হইলেও যৌবনের সৌন্দর্য্যাভাস তাঁহার শরীরকে তখনও ত্যাগ করে নাই। ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি, ভৈরবীর বয়স তখন চল্লিশের কাছাকাছি ছিল। নিকট আত্মীয়কে দেখিলে লোকে যেরূপ বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকে, ভৈরবীকে দেখিয়া তিনি ঐরূপ অনুভব করিয়াছিলেন, এবং গৃহে ফিরিয়া ভাগিনেয় হৃদয়কে চাঁদনী হইতে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতে বলিয়াছিলেন। হৃদয় তাঁহার ঐরূপ আদেশে ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়াছিল, "রমণী অপরিচিতা, ডাকিলেই আসিবে কেন?" ঠাকুর তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমার নাম করিয়া বলিলেই আসিবে।" হৃদয় বলিত, অপরিচিতা সন্ন্যাসিনীর সহিত আলাপ করিবার জন্ত মাতুলের ঐরূপ আগ্রহাতিশয় দেখিয়া সে অবাক হইয়াছিল। কারণ, তাঁহাকে ঐরূপ আচরণ করিতে সে ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখে নাই।

উন্মাদ মাতুলের বাক্য অন্যথা করিবার উপায় নাই বুঝিয়া, হৃদয় চাঁদনীতে যাইয়া দেখিল ভৈরবী ঐ স্থানেই উপবিষ্টা রহিয়াছেন। সে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, তাহার ঈশ্বরভক্ত মাতুল তাঁহার দর্শনলাভের জন্ত প্রার্থনা করিতেছেন। ঐ কথা শুনিয়া ভৈরবী, কোনরূপ প্রশ্ন না করিয়া, তাহার সহিত আগমনের জন্ত উঠিলেন দেখিয়া সে অধিকতর বিস্মিত হইল।

ঠাকুরের ঘরে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে দেখিয়াই ভৈরবী আনন্দে

বিস্ময়ে অভিভূতা হইলেন এবং সজলনয়নে সহসা বলিয়া উঠিলেন, 'বাবা, তুমি এখানে রহিয়াছ! তুমি গঙ্গাতীরে আছ জানিয়া তোমায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম, এতদিনে দেখা পাইলাম!' ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কথা কেমন করিয়া জানিতে পারিলে মা?" ভৈরবী বলিলেন, 'তোমাদের তিন জনের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে, একথা ৺জগদম্বার কৃপায় পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলাম। দুইজনের দেখা পূর্ব্ব (বঙ্গ) দেশে পাইয়াছি, আজ এখানে তোমার দেখা পাইলাম।"

প্রথম দর্শনে ভৈরবী ঠাকুরকে যাহা বলেন।

ঠাকুর তখন ভৈরবীর নিকটে উপবিষ্ট হইয়া, বালক যেমন অন্তরের কথা জননীর নিকট সানন্দে প্রকাশ করে সেইরূপে নিজ অলৌকিক দর্শন, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হওয়া, গাত্রদাহ, নিদ্রাশূন্যতা প্রভৃতি শারীরিক বিকার, প্রভৃতি জীবনে নিত্য অনুভূত বিষয়সকল তাঁহাকে বলিতে বলিতে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "হ্যাগা আমার এ সকল কি হয়? আমি কি সত্যই পাগল হইলাম! জগদম্বাকে মনে প্রাণে ডাকিয়া সত্যই কি আমার কঠিন ব্যাধি হইল?" ভৈরবী তাঁহার ঐ সকল কথা শুনিতে শুনিতে জননীর ন্যায় কখন উত্তেজিতা, কখন উল্লসিতা এবং কখন করুণার্দ্র-হৃদয়া হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দানের জন্য বারংবার বলিতে লাগিলেন, "তোমায় কে পাগল বলে, বাবা? তোমার ইহা পাগলামি নয়, তোমার মহাভাব হইয়াছে সেই জন্যই ঐরূপ অবস্থাসকল হইয়াছে ও হইতেছে। তোমার যে অবস্থা হইয়াছে তাহা কি কাহারও চিনিবার সাধ্য আছে? সেইজন্য ঐ প্রকার বলে। ঐ প্রকার অবস্থা হইয়াছিল শ্রীমতী রাধারাণীর;

ঠাকুর ও ভৈরবীর প্রথমালাপ।

ঐ প্রকার হইয়াছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর। এই কথা ভক্তিশাস্ত্রে আছে। আমার নিকটে যে সকল পুঁথি আছে তাহা হইতে আমি পড়িয়া দেখাইব, ঈশ্বরকে যাঁহারা এক মনে ডাকিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই ঐরূপ অবস্থা সকল হইয়াছে ও হয়।” ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও নিজ মাতুলকে ঐরূপে পরমাত্মীয়ের ন্যায় বাক্যালাপ করিতে দেখিয়া, হৃদয়ের বিস্ময়ের অবধি ছিল না।

অনন্তর কথায় কথায় বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া, ঠাকুর দেবীর প্রসাদি ফলমূল, মাখন, মিছরি প্রভৃতি ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে জলযোগ করিতে দিলেন, এবং মাতৃভাবে ভাবিতা ব্রাহ্মণী পুত্রস্বরূপ তাঁহাকে পূর্ব্বে না খাওয়াইয়া জলগ্রহণ করিবেন না বুঝিয়া স্বয়ং ঐ সকল খাদ্যের কিয়দংশ গ্রহণ করিলেন। দেবদর্শন ও জলযোগ শেষ হইলে, ব্রাহ্মণী নিজ কণ্ঠগত রঘুবীর শিলার ভোগের জন্য ঠাকুরবাড়ীর ভাণ্ডার হইতে আটা চাল প্রভৃতি ভিক্ষাস্বরূপে গ্রহণ করিয়া পঞ্চবটীতলে রন্ধনাদিতে ব্যাপৃতা হইলেন।

পঞ্চবটীতে ভৈরবীর অপূর্ব্ব দর্শন।

রন্ধন শেষ হইলে, ঈশ্বর রঘুবীরের সম্মুখে খাদ্যাদি রাখিয়া ব্রাহ্মণী নিবেদন করিয়া দিলেন এবং ইষ্টদেবকে চিন্তা করিতে করিতে গভীর ধ্যানে নিমগ্না হইয়া অদ্ভুতপূর্ব্ব দর্শনলাভে সমাধিস্থা হইলেন। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া তাঁহার দুনয়নে প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। ঠাকুর ঐ সময়ে প্রাণে প্রাণে আকৃষ্ট হইয়া অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দৈবশক্তিবলে পূর্ণাবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণী-নিবেদিত খাদ্যসকল ভোজন করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে ব্রাহ্মণী সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু উন্মীলন করিলেন এবং বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐ প্রকার কার্য্যকলাপ নিজ দর্শনের সহিত মিলাইয়া পাইয়া আনন্দে কণ্টকিত-কলেবরা হইলেন। কিয়ৎকাল

পরে ঠাকুর সাধারণ জ্ঞানভূমিতে অবরোহণ করিলেন এবং নিজকৃত কার্য্যের জন্য ক্ষুব্ধ হইয়া ব্রাহ্মণীকে বলিতে লাগিলেন, "কে জানে বাপু, আত্মহারা হইয়া কেন এইরূপ কার্য্যসকল করিয়া বসি।" ব্রাহ্মণী তখন জননীর ন্যায় তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, "বেশ করিয়াছ বাবা; ঐরূপ কার্য্য তুমি কর নাই, তোমার ভিতরে যিনি আছেন, তিনিই করিয়াছেন, ধ্যান করিতে করিতে আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয় বুঝিয়াছি কে ঐরূপ করিয়াছে এবং কেনই বা করিয়াছে, বুঝিয়াছি, আর আমার পূর্ব্বের ন্যায় বাহ্যপূজার আবশ্যকতা নাই, আমার পূজা এতদিনে সার্থক হইয়াছে!" এই বলিয়া ব্রাহ্মণী কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া, দেবপ্রসাদজ্ঞানে উক্ত ভোজনাবশিষ্ট গ্রহণ করিলেন এবং ঠাকুরের শরীরমনাশ্রয়ে ৺রঘুবীরের জীবন্ত দর্শনলাভপূর্ব্বক প্রেমগদ্গদচিত্তে বাষ্পবারি মোচন করিতে করিতে বহুকালের পূজিত নিজ রঘুবীর শিলাটিকে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন করিলেন!

প্রথম দর্শনের প্রীতি ও আকর্ষণ ঠাকুর ও ব্রাহ্মণীর মধ্যে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ঠাকুরের প্রতি অপত্যপ্রেমে মুগ্ধহৃদয়া সন্ন্যাসিনী দক্ষিণেশ্বরেই রহিয়া গেলেন। আধ্যাত্মিক বাক্যালাপে দিনের পর দিন কোথা দিয়া যাইতে লাগিল,

পঞ্চবটীতে শাস্ত্রপ্রসঙ্গ।

উভয়ের মধ্যে কাহারও তাহা অনুভবে আসিল না। নিজ আধ্যাত্মিক দর্শন ও অবস্থা সম্বন্ধীয় রহস্য কথাসকল অকপটে বলিয়া ঠাকুর নিত্য নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং ভৈরবী তন্ত্র শাস্ত্র হইতে ঐ সকলের সমাধান করিয়া অথবা ঈশ্বরপ্রেমের প্রবল বেগে অবতারপুরুষদিগের দেহমনে কিরূপ লক্ষণসকল প্রকাশিত হয়, ভক্তিগ্রন্থসমূহ হইতে তদ্বিষয় পাঠ করিয়া ঠাকুরের সংশয়সকল ছিন্ন করিতে লাগিলেন। পঞ্চবটীতে ঐরূপে কয়েক দিবস দিব্যানন্দের প্রবাহ ছুটিয়াছিল।

ছয় সাত দিন ঐরূপে কাটিবার পরে, ঠাকুরের মনে হইল ব্রাহ্মণীকে এখানে রাখা ভাল হইতেছে না। কামকাঞ্চনাসক্ত সংসারী মানব বুঝিতে না পারিয়া পবিত্রা রমণীর চরিত্র-সম্বন্ধে নানা কথা রটনার অবসর পাইবে। ব্রাহ্মণীকে উহা বলিবামাত্র তিনি ঐ বিষয়ের যাথার্থ্য অনুধাবন করিলেন এবং গ্রামমধ্যে নিকটে কোন স্থানে থাকিয়া, প্রতিদিন দিবসে কিছুকালের জন্য আসিয়া ঠাকুরের সহিত দেখা করিয়া যাইবার সংকল্প স্থিরপূর্ব্বক কালীবাটী পরিত্যাগ করিলেন।

ভৈরবীর দেবমণ্ডলের ঘাটে অবস্থানের কারণ।

কালীবাটীর উত্তরে, ভাগীরথীতীরে, দক্ষিণেশ্বর গ্রামস্থ দেবমণ্ডলের ঘাটে আসিয়া ব্রাহ্মণী বাস করিতে লাগিলেন * এবং গ্রাম-মধ্যে পরিভ্রমণপূর্ব্বক রমণীগণের সহিত আলাপ করিয়া স্বল্পদিনেই তাহাদিগের শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়া উঠিলেন। সুতরাং এখানে তাঁহার বাস ও ভিক্ষা সম্বন্ধে কোনরূপ অসুবিধা রহিল না এবং লোক-নিন্দার ভয়ে ঠাকুরের পবিত্র দর্শনলাভে তাঁহাকে একদিনের জন্যও বঞ্চিত হইতে হইল না। তিনি প্রতিদিন কিয়ৎকালের জন্য কালীবাটীতে আসিয়া ঠাকুরের সহিত কথাবার্ত্তায় কাল কাটাইতে লাগিলেন এবং গ্রামস্থ রমণীগণের নিকট হইতে নানাপ্রকার খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহপূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। †

---

* হৃদয় বলিত, দেবমণ্ডলের ঘাটে থাকিবার পরামর্শ ঠাকুরই ব্রাহ্মণীকে প্রদান-পূর্ব্বক মণ্ডলদের বাটীতে পাঠাইয়া দেন। তথায় যাইবামাত্র নবীনচন্দ্র নিয়োগীর ধর্ম্মপরায়ণা পত্নী তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং ঘাটের চাঁদনীতে যতকাল ইচ্ছা থাকিবার অনুমতিসহ একখানি তক্তাপোষ, চাল, ডাল, ঘী ও অন্যান্য ভোজনসামগ্রী প্রদান করিয়াছিলেন।

† গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৮ম অধ্যায়।

ঠাকুরকে ভৈরবীর অবতার বলিয়া ধারণা কিরূপে হয়।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণীর ইতিপূর্ব্বে মনে হইয়াছিল, অসাধারণ ঈশ্বরপ্রেমেই তাঁহার অলৌকিক দর্শন ও অবস্থাসকল উপস্থিত হইয়াছে। এখন ভগবদালাপে, তাঁহার ভাবসমাধিতে মুহুর্মুহুঃ বাহ্যচৈতন্যলোপ ও কীর্ত্তনে পরমানন্দ দেখিয়া, তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল—ইনি কখনই সামান্য সাধক নহেন। চৈতন্যচরিতামৃত ও ভাগবতাদি গ্রন্থের স্থলে স্থলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবোদ্ধারের নিমিত্ত পুনরায় শরীর ধারণপূর্ব্বক আগমনের যে সকল ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়, ঠাকুরকে দেখিয়া ব্রাহ্মণীর স্মৃতিপথে সেই সকল কথা পুনঃ পুনঃ উদিত হইতে লাগিল। বিদুষী ব্রাহ্মণী ঐ সকল গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ সম্বন্ধে যে সকল কথা লিপিবদ্ধ দেখিয়াছিলেন, সেই সকলের সহিত ঠাকুরের আচারব্যবহার ও অলৌকিক প্রত্যক্ষাদি মিলাইয়া সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাইলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় ভাবাবেশে স্পর্শ করিয়া অপরের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিবার শক্তি ঠাকুরে প্রকাশিত দেখিলেন। আবার ঈশ্বর-বিরহ-বিধুর শ্রীচৈতন্যদেবের গাত্রদাহ উপস্থিত হইলে স্রকচন্দনাদি যে সকল পদার্থের ব্যবহারে উহা প্রশমিত হইত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, ঠাকুরের গাত্রদাহ প্রশমনের জন্য ঐ সকলের প্রয়োগ করিয়া তিনি তদ্রূপ ফল পাইলেন।* সুতরাং তাঁহার মনে এখন হইতে দৃঢ় ধারণা হইল শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ উভয়ে জীবোদ্ধারের নিমিত্ত ঠাকুরের শরীরাশ্রয়ে পুনরায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সিহড় গ্রামে যাইবার কালে ঠাকুর নিজ দেহাভ্যন্তর হইতে কিশোরবয়স্ক দুই জনকে যেরূপে বাহিরে আবির্ভূত হইতে দেখিয়াছিলেন, তাহা আমরা পাঠককে

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—১ম অধ্যায়।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি।* ব্রাহ্মণী এখন ঐ দর্শনের কথা ঠাকুরের মুখে শ্রবণপূর্ব্বক শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধীয় নিজ মীমাংসায় দৃঢ়তর বিশ্বাসবতী হইয়া বলিলেন, "এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব।"

উদাসিনী ব্রাহ্মণী সংসারে কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা করিতেন না; প্রাণ যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছে তাহা প্রকাশে লোকের নিন্দা বা উপহাসভাগিনী হইতে হইবে এ আশঙ্কা রাখিতেন না। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধীয় নিজ মীমাংসা তিনি সকলের সম্মুখে বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই। শুনিয়াছি, এই সময়ে একদিন ঠাকুর পঞ্চবটীতলে মথুর বাবুর সহিত বসিয়া ছিলেন। হৃদয়ও তাঁহাদের নিকটে ছিল। কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর, ব্রাহ্মণী তাঁহার সম্বন্ধে যে মীমাংসায় উপনীতা হইয়াছেন, তাহা মথুরামোহনকে বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, "সে বলে যে, অবতারদিগের যে সকল লক্ষণ থাকে, তাহা এই শরীর মনে আছে। তার অনেক শাস্ত্র দেখা আছে, কাছে অনেক পুঁথিও আছে।" মথুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তিনি যাহাই বলুন না বাবা, অবতার ত আর দশটীর অধিক নাই? সুতরাং তাঁহার কথা সত্য হইবে কেমন করিয়া? তবে, আপনার উপর মা কালীর কৃপা হইয়াছে, একথা সত্য।"

তাঁহারা ঐরূপে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে এক সন্ন্যাসিনী তাঁহাদের অভিমুখে আগমন করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন এবং মথুর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনিই কি তিনি?" ঠাকুর স্বীকার করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন—ব্রাহ্মণী কোথা হইতে একথাল মিষ্টান্ন সংগ্রহ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে নন্দরাণী

মথুরের সম্মুখে ভৈরবীর ঠাকুরকে অবতার বলা।

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—১ম অধ্যায়।

যশোদা যে ভাবে গোপালকে খাওয়াইতে সপ্রেমে অগ্রসর হইতেন, সেইভাবে তন্ময় হইয়া অন্যমনে তাঁহাদিগের দিকে চলিয়া আসিতেছেন। নিকটে আসিয়া মথুর বাবুকে দেখিতে পাইয়া তিনি যত্নপূর্ব্বক আপনাকে সংযতা করিলেন এবং ঠাকুরকে খাওয়াইবার নিমিত্ত হৃদয়ের হস্তে মিষ্টান্নথালাটি প্রদান করিলেন। তখন মথুর বাবুকে দেখাইয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "ওগো! তুমি আমাকে যাহা বল, সেই সব কথা আজ ইঁহাকে বলিতেছিলাম, ইনি বলিলেন, 'অবতার ত দশটী ছাড়া আর নাই'।" মথুরানাথও ইত্যবসরে সন্ন্যাসিনীকে অভিবাদন করিলেন এবং তিনি সত্যই যে ঐরূপ আপত্তি করিতেছিলেন, তদ্বিষয় অঙ্গীকার করিলেন। ব্রাহ্মণী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া উত্তর করিলেন, "কেন? শ্রীমদ্ভাগবতে চব্বিশটী অবতারের কথা বলিবার পরে ভগবান্ ব্যাস শ্রীহরির অসংখ্য বার অবতীর্ণ হইবার কথা বলিয়াছেন ত? বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থেও মহাপ্রভুর পুনরাগমনের কথা স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তদ্ভিন্ন শ্রীচৈতন্যের সহিত (শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখাইয়া) ইঁহার শরীরমনে প্রকাশিত লক্ষণসকলের বিশেষ সৌসাদৃশ্য মিলাইয়া পাওয়া যায়।" ব্রাহ্মণী ঐরূপে নিজপক্ষ সমর্থন করিয়া বলিলেন, শ্রীমদ্ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের গ্রন্থে সুপণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে তাঁহার কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। ঐরূপ ব্যক্তির নিকটে তিনি নিজ পক্ষ সমর্থন করিতে সম্মত আছেন। ব্রাহ্মণীর ঐ কথার কোন উত্তর দিতে না পারিয়া মথুরামোহন নীরব রহিলেন।

ঠাকুরের সম্বন্ধে ব্রাহ্মণীর অপূর্ব্ব ধারণা ক্রমে কালীবাটীর সকলেই জানিতে পারিল এবং উহা লইয়া একটা

বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল। উহার ফলাফল আমরা অন্যত্র বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।* ভৈরবী ব্রাহ্মণী ঐরূপে ঠাকুরকে সকলের সমক্ষে সহসা দেবতার সম্মান প্রদান করিলেও তাঁহার মনে কিছুমাত্র বিকার উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষসকলে কিরূপ মতামত প্রদান করেন তাহা জানিতে উৎসুক হইয়া তিনি বালকের ন্যায় মথুরামোহনকে ঐ বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ঐ অনুরোধের ফলেই বৈষ্ণবচরণ প্রমুখ পণ্ডিতসকলের দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আগমন হইয়াছিল। তাঁহাদিগের নিকটে ব্রাহ্মণী কিরূপে নিজ পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন তাহা অন্যত্র বলিয়াছি।†

পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের কারণ।

---

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ও উত্তরার্দ্ধ—১ম অধ্যায়।

† গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—১ম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

ঠাকুরের তন্ত্রসাধন।

কেবলমাত্র তর্কযুক্তি-সহায়ে ব্রাহ্মণী, ঠাকুরের সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত স্থির করেন নাই। পাঠকের স্মরণ থাকিবে, ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকালে তিনি বলিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবপ্রমুখ তিন ব্যক্তির সহিত দেখা করিয়া, তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক-জীবন-বিকাশে তাঁহাকে সহায়তা করিতে হইবে। ঠাকুরকে দর্শন করিবার বহুপূর্ব্বে তিনি ঈশ্বর প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং বুঝিতে পারা যায়, সাধনপ্রসূত দিব্যদৃষ্টিই তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনয়নপূর্ব্বক স্বল্প পরিচয়েই ঠাকুরকে ঐরূপে বুঝিতে সহায়তা করিয়াছিল। আবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তাঁহার সহিত তিনি যত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিতা হইতে লাগিলেন ততই তাঁহার মনে ঠাকুরকে কি ভাবে কতদূর সহায়তা করিতে হইবে, তদ্বিষয় পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। অতএব ঠাকুরের সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রম ধারণা দূর করিবার চেষ্টাতেই তিনি এখন কালক্ষেপ করেন নাই, কিন্তু শাস্ত্রপথাবলম্বনে সাধন সকলের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক শ্রীশ্রীজগদম্বার পূর্ণ প্রসন্নতার অধিকারী হইয়া ঠাকুর যাহাতে দিব্যভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েন তদ্বিষয়ে যত্নবতী হইয়াছিলেন।

সাধনপ্রসূত দিব্যদৃষ্টি ব্রাহ্মণীকে ঠাকুরের অবস্থা যথাযথরূপে বুঝাইয়াছিল।

গুরু-পরম্পরাগত, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সাধনপথ অবলম্বন না করিয়া কেবলমাত্র অনুরাগ-সহায়ে ঈশ্বরদর্শনে অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়াই, ঠাকুর নিজ উচ্চ অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারিতেছেন না,

প্রবীণা সাধিকা ব্রাহ্মণীর একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। নিজ অপূর্ব্ব প্রত্যক্ষসকলকে মস্তিষ্ক বিকৃতির ফল বলিয়া এবং শারীরিক বিকারসমূহ ব্যাধির জন্য উপস্থিত হইতেছে বলিয়া যে সন্দেহ ঠাকুরকে মধ্যে মধ্যে মুহ্যমান করিতেছিল তাহার হস্ত হইতে নির্মুক্ত করিবার জন্য ব্রাহ্মণী এখন তাঁহাকে তন্ত্রোক্ত সাধনমার্গ অবলম্বনে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। কারণ, সাধক যেরূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে যেরূপ ফল প্রাপ্ত হইবেন, তন্ত্রে তদ্বিষয় লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইয়া এবং অনুষ্ঠান-সহায়ে স্বয়ং ঐরূপ ফলসমূহ লাভ করিয়া তাঁহার মনে এ কথার দৃঢ় প্রতীতি হইবে যে, সাধনা সহায়ে মানব অন্তঃরাজ্যের উচ্চ উচ্চতর ভূমিসমূহে যত আরোহণ করিতে থাকে ততই তাহার অনন্যসাধারণ শারীরিক ও মানসিক অবস্থাসমূহের উপলব্ধি হয়। ফলে ইহা দাঁড়াইবে যে, ঠাকুরের জীবনে ভবিষ্যতে যেরূপ অসাধারণ প্রত্যক্ষসকল উপস্থিত হউক না কেন, কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তিনি ঐ সকলকে সত্য ও অবশ্যম্ভাবী জানিয়া নিশ্চিন্তমনে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। ব্রাহ্মণী জানিতেন, শাস্ত্র ঐজন্য সাধককে গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যের সহিত নিজ জীবনের অনুভব-সকলকে মিলাইয়া অনুরূপ হইল কি না, দেখিতে বলিয়াছেন।

> ঠাকুরকে ব্রাহ্মণীর তন্ত্র সাধন করিতে বলিবার কারণ।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, ঠাকুরকে অবতার-মহাপুরুষ বলিয়া বুঝিয়া, ব্রাহ্মণী কোন্ যুক্তি বলে আবার তাঁহাকে সাধন করাইতে উদ্যত হইলেন? ঐশী-মহিমাসম্পন্ন অবতার-পুরুষকে সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে সাধনাদি চেষ্টার অনাবশ্যকতা সর্ব্বথা প্রতীয়মান হইয়া থাকে। উত্তরে বলা যাইতে পারে, ঠাকুরের সম্বন্ধে ঐ প্রকার মহিমা বা ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ব্রাহ্মণীর

> অবতার বলিয়া বুঝিয়াও ব্রাহ্মণী কিরূপে ঠাকুরকে সাধনার সহায়তা করিয়াছিলেন।

মনে সর্ব্বদা সমুদিত থাকিলে, তাঁহার মানসিক ভাব বোধ হয় ঐরূপ হইত, কিন্তু তাহা হয় নাই। আমরা বলিয়াছি, প্রথম দর্শন হইতে ব্রাহ্মণী অপত্যনির্ব্বিশেষে ঠাকুরকে ভালবাসিয়াছিলেন—এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ভুলাইয়া প্রিয়তমের কল্যাণচেষ্টায় নিযুক্ত করাইতে ভালবাসার ন্যায় দ্বিতীয় পদার্থ সংসারে নাই। অতএব বুঝা যায়, অকৃত্রিম ভালবাসার প্রেরণাতেই তিনি ঠাকুরকে সাধনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। দেব-মানব, অবতার-পুরুষসকলের জীবনালোচনায় আমরা সর্ব্বত্র ঐরূপ দেখিতে পাই। দেখিতে পাই, তাঁহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ ব্যক্তিসকল তাঁহাদিগের অলৌকিক ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে সময়ে সময়ে স্তম্ভিত হইলেও, পরক্ষণে উহা ভুলিয়া যাইতেছেন এবং প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে অন্য সাধারণের ন্যায় অপূর্ণ জ্ঞানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের কল্যাণচেষ্টায় নিযুক্ত হইতেছেন। অতএব অলৌকিক ভাবাবেশ ও শক্তিপ্রকাশ দর্শনে সময়ে সময়ে স্তম্ভিতা হইলেও, তাঁহার প্রতি ঠাকুরের অকৃত্রিম ভক্তি বিশ্বাস এবং নির্ভরতা ব্রাহ্মণীর হৃদয়নিহিত কোমলকঠোর মাতৃস্নেহকে উদ্বেলিত করিয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিতে এবং ঠাকুরকে সুখী করিবার জন্য সকল বিষয়ে সহায়তা করিতে সতত অগ্রসর করিত।

যোগ্য ব্যক্তিকে শিক্ষাদানের সুযোগ উপস্থিত হইলে, গুরুর হৃদয়ে পরম পরিতৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ স্বতঃ উদয় হয়। সুতরাং ঠাকুরের ন্যায় উত্তমাধিকারীকে শিক্ষাদানের অবসর পাইয়া ব্রাহ্মণীর হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল। তাহার উপর ঠাকুরের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম বাৎসল্য ভাব—অতএব, এ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণী তাঁহার আজীবন স্বাধ্যায় ও তপস্যার ফল স্বল্পকালের মধ্যে তাঁহাকে অনুভব করাইবার জন্য সচেষ্ট হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে।

ঠাকুরকে ব্রাহ্মণীর সর্ব্ব তপস্যার ফলপ্রদানের জন্য ব্যস্ততা।

তন্ত্রোক্ত সাধনসকল অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে ঠাকুর ঐ বিষয়ের ইতিকর্ত্তব্যতাসম্বন্ধে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক তাঁহার অনুমতি লাভ করিয়া উহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—একথা আমরা তাঁহার শ্রীমুখে কখন কখন শ্রবণ করিয়াছি। অতএব কেবলমাত্র ব্রাহ্মণীর আগ্রহ ও উত্তেজনা তাঁহাকে ঐ বিষয়ে নিযুক্ত করে নাই, সাধনপ্রসূত যোগদৃষ্টিপ্রভাবেও তিনি এখন প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন—শাস্ত্রীয় প্রণালী অবলম্বনে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ করিবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে। ঠাকুরের একনিষ্ঠ মন ঐরূপে ব্রাহ্মণীনির্দ্দিষ্ট সাধনপথে এখন পূর্ণাগ্রহে ধাবিত হইয়াছিল। সে আগ্রহের পরিমাণ ও তীব্রতা অনুভব করা আমাদিগের ন্যায় ব্যক্তির সম্ভবপর নহে। কারণ, পার্থিব নানা বিষয়ে প্রসারিত আমাদিগের মনের সে উপরতি ও একলক্ষ্যতা কোথায়?—অন্তঃসমুদ্রের ঊর্ম্মিমালার বিচিত্র রঙ্গভঙ্গে ভাসমান না থাকিয়া, উহার তলস্পর্শ করিবার জন্য সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া নিমগ্ন হইবার অসীম সাহস আমাদিগের কোথায়?—'একেবারে ডুবিয়া যা', 'আপনাতে আপনি ডুবিয়া যা' বলিয়া, ঠাকুর আমাদিগকে বারম্বার যে ভাবে উত্তেজিত করিতেন, সেইভাবে জগতের সকল পদার্থের এবং নিজ শরীরের প্রতি মায়া মমতা উচ্ছিন্ন করিয়া আধ্যাত্মিকতার গভীর গর্ভে ডুবিয়া যাইবার আমাদিগের সামর্থ্য কোথায়? আমরা যখন শুনি, ঠাকুর অসহ্য যন্ত্রণায় ব্যাকুল হইয়া 'মা দেখা দে' বলিয়া পঞ্চবটীমূলে গঙ্গাসৈকতে মুখঘর্ষণ করিতেন এবং দিনের পর দিন চলিয়া যাইলেও তাঁহার ঐভাবের বিরাম হইত না—তখন কথাগুলি কর্ণে প্রবিষ্ট হয় মাত্র, হৃদয়ে অনুরূপ ঝঙ্কারের কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় না। হইবেই বা কেন? শ্রীশ্রীজগন্মাতা যে যথার্থই আছেন এবং সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া ব্যাকুলহৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিলে তাঁহার

জগদম্বার অনুজ্ঞালাভে ঠাকুরের তন্ত্রসাধনের অনুষ্ঠান—তাঁহার সাধনাগ্রহের পরিমাণ।

দর্শনলাভ যে যথার্থই সম্ভবপর—একথায় কি আমরা ঠাকুরের ন্যায় সরলভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি?

সাধনকালে নিজ মানসিক আগ্রহের পরিমাণ ও তীব্রতার কিঞ্চিৎ আভাস ঠাকুর আমাদিগকে একদিন কাশীপুরে অবস্থানকালে প্রদান করিয়া স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। তৎকালে আমরা যাহা অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা পাঠককে কতদূর বুঝাইতে সমর্থ হইব বলিতে পারি না, কিন্তু কথাটির এখানে উল্লেখ করিব।—

কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর নিজ সাধনকালের আগ্রহসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন।

ঈশ্বরলাভের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাকুল আগ্রহ তখন আমরা কাশীপুরে স্বচক্ষে দর্শন করিতেছিলাম। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য নির্দ্ধারিত টাকা (ফি) জমা দিতে যাইয়া কেমন করিয়া তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল, উহার প্রেরণায় অস্থির হইয়া কেমন করিয়া তিনি একবস্ত্রে, নগ্নপদে জ্ঞানশূন্যের ন্যায় সহরের রাস্তা দিয়া ছুটিয়া কাশীপুরে শ্রীগুরুর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় নিজ মনোবেদনা নিবেদনপূর্ব্বক তাঁহার কৃপালাভ করিলেন, আহার-নিদ্রা ত্যাগপূর্ব্বক কেমন করিয়া তিনি ঐ সময় হইতে দিবারাত্র ধ্যান জপ ভজন ও ঈশ্বরচর্চ্চায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন, অসীম সাধনোৎসাহে কেমন করিয়া তাঁহার কোমল হৃদয় তখন বজ্রকঠোর-ভাবাপন্ন হইয়া নিজ মাতা ও ভ্রাতৃবর্গের অশেষ কষ্টে এককালে উদাসীন হইয়া রহিল, এবং কেমন করিয়া শ্রীগুরু-প্রদর্শিত সাধনপথে দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হইয়া তিনি দর্শনের পর দর্শন লাভ করিতে করিতে তিন চারি মাসের অন্তেই নির্ব্বিকল্প সমাধিসুখ প্রথম অনুভব করিলেন—ঐ সকল বিষয় তখন আমাদের চক্ষের সমক্ষে অভিনীত হইয়া আমাদিগকে স্তম্ভিত করিতেছিল। ঠাকুর তখন পরমানন্দে স্বামিজীর ঐরূপ অপূর্ব্ব অনুরাগ, ব্যাকুলতা ও

সাধনোৎসাহের ভূয়সী প্রশংসা নিত্য করিতেছিলেন। ঐ সময়ে একদিন, ঠাকুর নিজ অনুরাগ ও সাধনোৎসাহের সহিত স্বামিজীর ঐ বিষয়ের তুলনা করিয়া ঐ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"নরেন্দ্রের অনুরাগ উৎসাহ অতি অদ্ভুত, কিন্তু (আপনাকে দেখাইয়া) এখানে তখন (সাধনকালে) উহাদের যে তোড়্ (বেগ) আসিয়াছিল, তাহার তুলনায় ইহা যৎসামান্য—ইহা তাহার সিকিও হইবে না!"—ঠাকুরের ঐ কথায় আমাদিগের মনে কীদৃশ ভাবের উদয় হইয়াছিল, হে পাঠক, পার ত কল্পনাসহায়ে তাহা অনুভব কর।

সে যাহা হউক, শ্রীশ্রীজগদম্বার ইঙ্গিতে ঠাকুর এখন সর্ব্বস্ব ভুলিয়া সাধনায় মগ্ন হইলেন এবং প্রজ্ঞাসম্পন্না কর্ম্মকুশলা ব্রাহ্মণী তান্ত্রিক ক্রিয়োপযোগী পদার্থসকলের সংগ্রহপূর্ব্বক উহাদিগের প্রয়োগসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাকে সহায়তা করিতে অশেষ আয়াস করিতে লাগিলেন। মনুষ্যপ্রভৃতি পঞ্চপ্রাণীর মস্তক-কঙ্কাল* গঙ্গাহীন

---

* ইদানীং শৃণু দেবেশি শবাসনমনুত্তমম্।
যং কৃত্বা সাধকো যাতি মহাদেব্যাঃ পরং পদং ॥ ৫১
নর-মহিষ-মার্জ্জার-মুণ্ডত্রয়ং বরাননে।
অথবা পরমেশানি নৃমুণ্ডত্রয়মাদরাৎ ॥ ৫২
শিবাসর্পসারমেয়বৃষভানাং মহেশ্বরি।
নরমুণ্ডং তথা মধ্যে পঞ্চমুণ্ডানি কীর্ত্তিতং ॥ ৫৩
অথবা পরমেশানি নরাণাং পঞ্চমুণ্ডকান্।
তথা শতং সহস্রং বাযুতং লক্ষং তথৈব চ ॥ ৫৪
নিযুতঞ্চাথবা কোটিং নৃমুণ্ডান্ পরমেশ্বরি।
নরমুণ্ডং স্থাপয়িত্বা প্রোথয়িত্বা ধরাতলে ॥ ৫৫
বিতস্তিপ্রমিতাং বেদীং তস্যোপরি প্রকল্পয়েৎ।
আয়ামপ্রস্থতো দেবি চতুর্হস্তৌ সমাচরেৎ ॥ ৫৬

যোগিনী তন্ত্রম্—পঞ্চম পটলঃ।

প্রদেশ হইতে সযত্নে সমাহৃত হইয়া, ঠাকুরবাটীর উদ্যানে উত্তরসীমান্তে অবস্থিত বিল্বতরুমূলে এবং ঠাকুরের স্বহস্ত-প্রোথিত পঞ্চবটীতলে সাধনানুকূল দুইটি বেদিকা* নির্ম্মিত হইল এবং প্রয়োজনমত ঐ মুণ্ডাসনদ্বয়ের অন্যতমের উপরে উপবিষ্ট হইয়া জপ, পুরশ্চরণ ও ধ্যানাদিতে ঠাকুরের কাল কাটিতে লাগিল। কয়েক মাস দিবারাত্র কোথা দিয়া আসিতে ও যাইতে লাগিল, তাহা এই অদ্ভুত সাধক এবং উত্তরসাধিকার জ্ঞান রহিল না। ঠাকুর বলিতেন † "ব্রাহ্মণী দিবাভাগে দূরে, নানা স্থানে পরিভ্রমণপূর্ব্বক তন্ত্রনির্দ্দিষ্ট দুষ্প্রাপ্য পদার্থসকল সংগ্রহ করিত। রাত্রিকালে বিল্বমূলে বা পঞ্চবটীতলে সমস্ত উদ্যোগ করিয়া আমাকে আহ্বান করিত, এবং ঐ সকল পদার্থের সহায়ে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা যথাবিধি সম্পন্ন করাইয়া, জপ ধ্যানে নিমগ্ন হইতে বলিত। কিন্তু পূজান্তে জপ প্রায়ই করিতে

পঞ্চমুণ্ডাসন নির্ম্মাণ ও চৌষট্টিখান তন্ত্রের সকল সাধনের অনুষ্ঠান।

---

* সচরাচর পঞ্চমুণ্ডসংযুক্ত একটি বেদিকা নির্ম্মাণ করিয়া সাধকেরা জপ ধ্যানাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ঠাকুর কিন্তু দুইটি মুণ্ডাসনের কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বিল্বমূলের বেদিকার নিম্নে তিনটি নরমুণ্ড প্রোথিত ছিল এবং পঞ্চবটীতলস্থ বেদিকায় পঞ্চপ্রকার জীবের পাঁচটি মুণ্ড প্রোথিত ছিল। সাধনায় সিদ্ধ হইবার কিছুকাল পরে তিনি মুণ্ডকঙ্কালসকল গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপপূর্ব্বক আসনদ্বয় ভঙ্গ করিয়া দিয়াছিলেন। সাধনায় ত্রিমুণ্ডাসন প্রশস্ততর বলিয়া হউক অথবা বিল্বমূল তৎকালে অধিকতর বিশেষ নির্জ্জন থাকায় বিশেষ ক্রিয়াসকল অনুষ্ঠানের সুবিধা হইবে বলিয়াই হউক দুইটি আসন নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিল্বমূলের সন্নিকটে কোম্পানির বারুদখানা বিদ্যমান থাকায়, হোমাদির তথায় অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার অসুবিধা হওয়ায় দুইটি মুণ্ডাসন নির্ম্মিত হইয়াছিল, এরূপও হইতে পারে।

† ঠাকুরের শ্রীমুখে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যাহা শুনা গিয়াছে, তাহা এখানে সম্বদ্ধভাবে দেওয়া গেল।

পারিতাম না, মন এতদূর তন্ময় হইয়া পড়িত যে, মালা ফিরাইতে যাইয়া সমাধিস্থ হইতাম এবং ঐ ক্রিয়ার শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ফল যথাযথ প্রত্যক্ষ করিতাম। ঐরূপে এই কালে দর্শনের পর দর্শন, অনুভবের পর অনুভব, অদ্ভুত অদ্ভুত সব কতই যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত। চৌষট্টিখানা তন্ত্রে যত কিছু সাধনের কথা আছে, সকলগুলিই ব্রাহ্মণী একে একে অনুষ্ঠান করাইয়াছিল। কঠিন কঠিন সাধন—যাহা করিতে যাইয়া অধিকাংশ সাধক পথভ্রষ্ট হয়—মার (শ্রীশ্রীজগদম্বার) কৃপায় সে সকলে উত্তীর্ণ হইয়াছি!

"একদিন দেখি, ব্রাহ্মণী নিশাভাগে কোথা হইতে এক পূর্ণযৌবনা সুন্দরী রমণীকে ডাকিয়া আনিয়াছে এবং পূজার আয়োজন করিয়া ৺দেবীর আসনে তাঁহাকে বিবস্ত্রা করিয়া উপবেশন করাইয়া আমাকে বলিতেছে, 'বাবা, ইহাকে দেবীবুদ্ধিতে পূজা কর।' পূজা সাঙ্গ হইলে বলিল, 'বাবা, সাক্ষাৎ জগজ্জননী জ্ঞানে ইহার ক্রোড়ে বসিয়া তন্ময়চিত্তে জপ কর।'—তখন আতঙ্কে ক্রন্দন করিয়া মাকে (শ্রীশ্রীজগদম্বাকে) বলিলাম, 'মা, তোর শরণাগতকে এ কি আদেশ করিতেছিস্? দুর্ব্বল সন্তানের ঐরূপ দুঃসাহসের সামর্থ্য কোথায়?'—ঐরূপ বলিবামাত্র দিব্য বলে হৃদয় পূর্ণ হইল এবং দেবতাবিষ্টের ন্যায়, কি করিতেছি সম্যক্ না জানিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে রমণীর ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইবামাত্র সমাধিস্থ হইয়া পড়িলাম। অনন্তর যখন জ্ঞান হইল তখন ব্রাহ্মণী বলিল 'ক্রিয়া পূর্ণ হইয়াছে বাবা; অপরে কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া ঐ অবস্থায় কিছুকাল জপমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তুমি এককালে শরীরবোধশূন্য হইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছ!'—শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করার জন্য

স্ত্রীমূর্ত্তিতে দেবীজ্ঞান-সিদ্ধি।

মাকে (শ্রীশ্রীজগদম্বাকে) কৃতজ্ঞতাপূর্ণ-হৃদয়ে বারম্বার প্রণাম করিতে লাগিলাম।

"আর একদিন দেখি, ব্রাহ্মণী শবের খর্পরে মৎস্য রাঁধিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার তর্পণ করিল এবং আমাকেও ঐরূপ করাইয়া উহা গ্রহণ করিতে বলিল! তাহার আদেশে তাহাই করিলাম, মনে কোনরূপ ঘৃণার উদয় হইল না।

"কিন্তু যে দিন সে (ব্রাহ্মণী) গলিত আম-মহামাংস-খণ্ড আনিয়া তর্পণান্তে উহা জিহ্বা দ্বারা স্পর্শ করিতে বলিল, সে দিন ঘৃণায় বিচলিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, 'তা কি কখন করা যায়?'—শুনিয়া সে বলিল, 'সে কি বাবা, এই দেখ আমি করিতেছি!,—বলিয়াই সে উহা নিজ মুখে গ্রহণ করিয়া 'ঘৃণা করিতে নাই' বলিয়া, পুনরায় উহার কিয়দংশ আমার সম্মুখে ধারণ করিল। তাহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রচণ্ড চণ্ডিকা-মূর্ত্তির উদ্দীপনা হইয়া গেল এবং 'মা' 'মা' বলিতে বলিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম। তখন ব্রাহ্মণী উহা মুখে প্রদান করিলেও, ঘৃণার উদয় হইল না।

ঘৃণা ত্যাগ।

"ঐরূপে পূর্ণাভিষেক গ্রহণ করাইয়া অবধি ব্রাহ্মণী কত প্রকারের অনুষ্ঠান করাইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না। সকল কথা সকল সময়ে এখন স্মরণে আসে না। তবে মনে আছে, যে দিন সুরত-ক্রিয়াসক্ত নরনারীর সম্ভোগানন্দ দর্শনপূর্ব্বক শিব শক্তির লীলাবিলাস জ্ঞানে মুগ্ধ ও সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই দিন বাহ্যচৈতন্য লাভের পর ব্রাহ্মণী বলিয়াছিল, 'বাবা' তুমি আনন্দাসনে সিদ্ধ হইয়া দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে, উহাই এই মতের (বীরভাবের) শেষ সাধন।' উহার কিছুকাল পরে একজন ভৈরবীকে পাঁচ সিকা দক্ষিণা দানে প্রসন্ন করিয়া, তাঁহার সহায়ে কালীঘরের নাটমন্দিরে দিবাভাগে সর্ব্বজনসমক্ষে কুলাগার-পূজার

আনন্দাসনে সিদ্ধিলাভ, কুলাগার পূজা, এবং তন্ত্রোক্ত সাধনকালে ঠাকুরের আচরণ।

যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া বীরভাবের সাধন সম্পূর্ণ করিয়াছিলাম। দীর্ঘকালব্যাপী তন্ত্রোক্ত সাধনের সময় আমার রমণীমাত্রে মাতৃভাব যেমন অক্ষুণ্ণ ছিল, তদ্রূপ বিন্দুমাত্র কারণ গ্রহণ কখন করিতে পারি নাই।—কারণের নাম বা গন্ধমাত্রেই জগৎকারণের উপলব্ধিতে আত্মহারা হইতাম এবং 'যোনি' শব্দ শ্রবণমাত্রেই জগদ্‌যোনির উদ্দীপনায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িতাম।"

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে ঠাকুর একদিন তাঁহার রমণীমাত্রে মাতৃভাবের উল্লেখ করিয়া একটি পৌরাণিক কাহিনী বলিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগণপতির রমণী-মাত্রে মাতৃজ্ঞান সম্বন্ধে ঠাকুরের গল্প।

সিদ্ধজ্ঞানিগণের অধিনায়ক শ্রীশ্রীগণপতিদেবের হৃদয়ে ঐরূপ মাতৃজ্ঞান কিরূপে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, গল্পটি তাহারই বিবরণ। মদস্রাবি-গজতুণ্ডাস্ফালিত-বদন লম্বোদর দেবতাটির উপর ইতিপূর্ব্বে আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধার বড় একটা আতিশয্য ছিল না। কিন্তু ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে উহা শুনিয়া পর্য্যন্ত ধারণা হইয়াছে শ্রীশ্রীগণপতি বাস্তবিকই সকল দেবতার অগ্রে পূজা পাইবার যোগ্য।

কিশোর বয়সে গণেশ একদিন ক্রীড়া করিতে করিতে একটি বিড়াল দেখিতে পান এবং বালসুলভ-চপলতায় উহাকে নানাভাবে পীড়াপ্রদান ও প্রহার করিয়া ক্ষতবিক্ষত করেন। বিড়াল কোনরূপে প্রাণ বাঁচাইয়া পলায়ন করিলে, গণেশ শান্ত হইয়া নিজ জননী শ্রীশ্রীপার্ব্বতীদেবীর নিকট আগমন করিয়া দেখিলেন, দেবীর শ্রীঅঙ্গের নানাস্থানে প্রহারচিহ্ন দেখা যাইতেছে। বালক মাতার ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দেবী বিমর্ষভাবে উত্তর করিলেন,—'তুমিই আমার ঐরূপ দুরবস্থার কারণ।' মাতৃভক্ত গণেশ ঐ কথায় বিস্মিত ও অধিকতর দুঃখিত

হইয়া সজলনয়নে বলিলেন,—'সে কি কথা মা, আমি তোমাকে কখন প্রহার করিলাম? অথবা এমন কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি বলিয়াও ত স্মরণ হইতেছে না, যাহাতে তোমার অবোধ বালকের জন্য অপরের হস্তে তোমাকে ঐরূপ অপমান সহ্য করিতে হইবে?' জগন্ময়ী শ্রীশ্রীদেবী তখন বালককে বলিলেন,—'ভাবিয়া দেখ দেখি, কোন জীবকে আজ তুমি প্রহার করিয়াছ কি না?' গণেশ বলিলেন,—'তাহা করিয়াছি; অল্পক্ষণ হইল একটা বিড়ালকে মারিয়াছি।' যাহার বিড়াল সেই মাতাকে ঐরূপে প্রহার করিয়াছে ভাবিয়া, গণেশ তখন রোদন করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীশ্রীগণেশজননী অনুতপ্ত বালককে সাদরে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক বলিলেন,—'তাহা নহে বাবা, তোমার সম্মুখে বিদ্যমান আমার এই শরীরকে কেহ প্রহার করে নাই, কিন্তু আমিই মার্জ্জারাদি যাবতীয় প্রাণীরূপে সংসারে বিচরণ করিতেছি, এজন্য তোমার প্রহারের চিহ্ন আমার অঙ্গে দেখিতে পাইতেছ। তুমি না জানিয়া ঐরূপ করিয়াছ, সেজন্য দুঃখ করিও না; কিন্তু অদ্যাবধি একথা স্মরণ রাখিও, স্ত্রীমূর্ত্তি-বিশিষ্ট জীবসকল আমার অংশে উদ্ভূত হইয়াছে এবং পুংমূর্ত্তিধারী জীবসমূহ তোমার পিতার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে—শিব ও শক্তি ভিন্ন জগতে কেহ বা কিছুই নাই।' গণেশ মাতার ঐ কথা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিলেন এবং বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, মাতাকে বিবাহ করিতে হইবে ভাবিয়া, উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে অসম্মত হইলেন। ঐরূপে শ্রীশ্রীগণেশ চিরকাল ব্রহ্মচারী হইয়া রহিলেন এবং শিবশক্ত্যাত্মক জগৎ—এই কথা হৃদয়ে সর্ব্বদা ধারণা করিয়া থাকায়, জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য হইলেন।

পূর্ব্বোক্ত গল্পটি বলিয়া ঠাকুর, শ্রীশ্রীগণপতির জ্ঞানগরিমাসূচক

নিম্নলিখিত কাহিনীটিও বলিয়াছিলেন,—কোন সময়ে শ্রীশ্রীপার্ব্বতীদেবী নিজ বহুমূল্য রত্নমালা দেখাইয়া, গণেশ ও কার্ত্তিককে বলেন যে, চতুর্দ্দশভুবনান্বিত জগৎপরিক্রমণ করিয়া তোমাদের মধ্যে যে অগ্রে আমার নিকট উপস্থিত হইবে, তাহাকে আমি এই রত্নমালা প্রদান করিব। শিখিবাহন কার্ত্তিকেয় অগ্রজের লম্বোদর স্থূল তনুর গুরুত্ব এবং তদীয় বাহন মূষিকের মন্দগতি স্মরণ করিয়া বিদ্রূপহাস্থ হাসিলেন এবং 'রত্নমালা আমারই হইয়াছে' স্থির করিয়া, ময়ূরারোহণে জগৎ পরিভ্রমণে বহির্গত হইলেন। কার্ত্তিক চলিয়া যাইবার বহুক্ষণ পরে গণেশ আসন পরিত্যাগ করিলেন এবং প্রজ্ঞাচক্ষুসহায়ে শিবশক্ত্যাত্মক জগৎকে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীর শরীরে অবস্থিত দেখিয়া, ধীরপদে তাঁহাদিগকে পরিক্রমণ ও বন্দনা করতঃ নিশ্চিন্ত মনে উপবিষ্ট রহিলেন। অনন্তর কার্ত্তিক ফিরিয়া আসিলে শ্রীশ্রীপার্ব্বতীদেবী প্রসাদী রত্নমালা গণপতির প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাঁহার গলদেশে উহা সস্নেহে লম্বিত করিলেন।

গণেশ ও কার্ত্তিকের জগৎ পরিভ্রমণবিষয়ক গল্প।

ঐরূপে শ্রীশ্রীগণপতির রমণীমাত্রে মাতৃভাবের উল্লেখ করিয়া ঠাকুর বলিলেন,—"আমারও রমণীমাত্রে ঐরূপ ভাব; সেই জন্য বিবাহিতা স্ত্রীর ভিতরে শ্রীশ্রীজগদম্বার মাতৃমূর্ত্তির সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়া পূজা ও পাদবন্দনা করিয়াছিলাম।"

রমণীমাত্রে মাতৃজ্ঞান সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, তন্ত্রোক্ত বীরভাবের সাধনসকল অনুষ্ঠান করিবার কথা আমরা কোনও যুগে কোনও সাধকের সম্বন্ধে শ্রবণ করি নাই। বীরমতাশ্রয়ী হইয়া সাধকমাত্রেই একাল পর্য্যন্ত শক্তিগ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। বীরাচারী সাধকবর্গের মনে ঐ কারণে একটা দৃঢবদ্ধ ধারণা হইয়াছে, শক্তিগ্রহণ না করিলে,

তন্ত্র-সাধনে ঠাকুরের বিশেষত্ব।

সাধনায় সিদ্ধি বা শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসন্নতা লাভ একান্ত অসম্ভব। নিজ পাশব প্রবৃত্তির এবং ঐ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সাধকেরা কখন কখন পরকীয়া শক্তি গ্রহণেও বিরত থাকেন না। লোকে ঐ জন্য তন্ত্রশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বীরাচার মতের নিন্দা করিয়া থাকে।

ঐ বিশেষত্ব ৺জগদম্বার অভিপ্রেত।

যুগাবতার অলৌকিক ঠাকুরই কেবল নিজ সম্বন্ধে একথা আমাদিগকে বারম্বার বলিয়াছেন, আজীবন তিনি কখন স্বপ্নেও স্ত্রী গ্রহণ করেন নাই। অতএব আজন্ম মাতৃভাবাবলম্বী ঠাকুরকে বীরমতের সাধনসমূহ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করাতে শ্রীশ্রীজগদম্বার গূঢ় অভিপ্রায় সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়।

শক্তিগ্রহণ না করিয়া ঠাকুরের সিদ্ধিলাভে যাহা প্রমাণিত হয়।

ঠাকুর বলিতেন, সাধনসকলের কোনটিতে সাফল্য লাভ করিতে তাঁহার তিনদিনের অধিক সময় লাগে নাই। 'সাধনবিশেষ গ্রহণ করিয়া ফল প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ব্যাকুলহৃদয়ে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে ধরিয়া বসিলে, তিন দিবসেই উহাতে সিদ্ধকাম হইতাম।' শক্তিগ্রহণ না করিয়া বীরাচারের সাধনসকলে তাঁহার ঐরূপে স্বল্পকালে সাফল্য লাভ করাতে একথা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, পঞ্চ 'ম'কার বা স্ত্রী গ্রহণ ঐ সকল অনুষ্ঠানের অবশ্যকর্ত্তব্য অঙ্গ নহে। সংযমরহিত সাধক আপন দুর্ব্বল প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া ঐরূপ করিয়া থাকে। সাধক ঐরূপ করিয়া বসিলেও যে, তন্ত্র তাহাকে অভয় দান করিয়াছেন, এবং পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে কালে সে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে, একথার উপদেশ করিয়াছেন, ইহাতে ঐ শাস্ত্রের পরমকারুণিকত্বই উপলব্ধি হয়।

অতএব রূপরসাদি যে সকল পদার্থ মানবসাধারণকে প্রলোভিত করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদি অনুভব করাইতেছে এবং ঈশ্বরলাভ

ও আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে দিতেছে না, সংযম সহায়ে যাবজ্জীবন উদ্যম ও চেষ্টার দ্বারা সেই সকলকে ঈশ্বরের মূর্ত্তি বলিয়া অবধারণ করিতে সাধককে অভ্যস্ত করানই তান্ত্রিকী ক্রিয়া সকলের উদ্দেশ্য বলিয়া অনুমিত হয়। সাধকের সংযম এবং সর্ব্বভূতে ঈশ্বরধারণার তারতম্য বিচার করিয়াই তন্ত্র পশু, বীর ও দিব্যভাবের অবতারণা করিয়াছেন এবং তাহাকে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাবে ঈশ্বরোপাসনায় অগ্রসর হইতে উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু কঠোর সংযমকে ভিত্তিস্বরূপে অবলম্বনপূর্ব্বক তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহে প্রবৃত্ত হইলে ফল প্রত্যক্ষ হইবে নতুবা নহে, একথা লোকে কালধর্ম্মে প্রায় বিস্মৃত হইয়াছিল এবং তাহাদিগের অনুষ্ঠিত কুক্রিয়াসকলের জন্য তন্ত্রশাস্ত্রই দায়ী স্থির করিয়া সাধারণে তাহার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অতএব রমণীমাত্রে মাতৃভাবে পূর্ণহৃদয় ঠাকুরের এই সকল অনুষ্ঠানের সাফল্য দেখিয়া যথার্থ সাধককুল কোন্ লক্ষ্যে চলিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ লাভপূর্ব্বক যেমন উপকৃত হইয়াছে, তন্ত্রশাস্ত্রের প্রামাণ্যও তেমনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐ শাস্ত্র মহিমান্বিত হইয়াছে।

তন্ত্রোক্ত-অনুষ্ঠান-সকলের উদ্দেশ্য।

ঠাকুর এই সময়ে তন্ত্রোক্ত রহস্য সাধনসমূহের অনুষ্ঠান তিন চারি বৎসর কাল একাদিক্রমে করিলেও, উহাদিগের আদ্যোপান্ত বিবরণ আমাদিগের কাহাকেও কখন বলিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তবে, সাধনপথে উৎসাহিত করিবার জন্য ঐ সকল কথার অল্প বিস্তর আমাদিগের অনেককে সময়ে সময়ে বলিয়াছেন, অথবা, ব্যক্তিগত প্রয়োজন বুঝিয়া বিরল কাহাকেও কোন কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাইয়াছেন। তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াসকলের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অসাধারণ অনুভবসমূহ স্বয়ং প্রত্যক্ষ না করিলে, উত্তরকালে সমীপাগত নানা বিভিন্নপ্রকৃতিবিশিষ্ট

ঠাকুরের তন্ত্রসাধনের অন্য কারণ।

ভক্তগণের মানসিক অবস্থা ধরিয়া সাধনপথে সহজে অগ্রসর করাইয়া দিতে পারিবেন না বলিয়াই যে, শ্রীশ্রীজগন্মাতা ঠাকুরকে এসময় এই পথের সহিত সম্যক্ পরিচিত করাইয়াছিলেন—একথা বুঝিতে পারা যায়। শরণাগত ভক্তদিগকে কি ভাবে কত রূপে তিনি সাধনপথে অগ্রসর করাইয়া দিতেন, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাস আমরা অন্যত্র * প্রদান করিয়াছি; তৎপাঠে আমাদের পূর্ব্বোক্ত বাক্যের যুক্তিযুক্ততা বুঝিতে পাঠকের বিলম্ব হইবে না। অতএব এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সাধনক্রিয়াসকল পূর্ব্বোক্তভাবে বলা ভিন্ন ঠাকুর তাঁহার তন্ত্রোক্ত সাধনকালের অনেকগুলি দর্শন এবং অনুভবের কথা আমাদিগের নিকট মধ্যে মধ্যে উল্লেখ করিতেন। আমরা এখন উহাদিগের কয়েকটি পাঠককে বলিব:—

তন্ত্র সাধনকালে ঠাকুরের দর্শন ও অনুভবসমূহ।

তিনি বলিতেন, তন্ত্রোক্ত সাধনের সময় তাঁহার পূর্ব্বস্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগদম্বা সময়ে সময়ে শিবারূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন শুনিয়া এবং কুকুরকে ভৈরবের বাহন জানিয়া, তিনি ঐকালে তাহাদের উচ্ছিষ্ট খাদ্যকে পবিত্রবোধে গ্রহণ করিতেন! মনে কোনরূপ দ্বিধা হইত না।

শিবানী উচ্ছিষ্ট গ্রহণ।

শ্রীশ্রীজগদম্বার পাদপদ্মে দেহ, মন, প্রাণ আহুতি প্রদান করিয়া, তিনি ঐকালে আপনাকে অন্তরে-বাহিরে জ্ঞানাগ্নিপরিব্যাপ্ত দেখিয়াছিলেন।

আপনাকে জ্ঞানাগ্নি-ব্যাপ্ত দর্শন।

কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া মস্তকে উঠিবার কালে মূলাধারাদি

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—১ম ও ২য় অধ্যায়।

সহস্রার পর্য্যন্ত পদ্মসকল ঊর্দ্ধমুখ ও পূর্ণপ্রস্ফুটিত হইতেছে, এবং উহাদিগের একের পর অন্য যেমনি প্রস্ফুটিত হইতেছে, অমনি অপূর্ব্ব অনুভবসমূহ অন্তরে উদিত হইতেছে *—এবিষয় ঠাকুর এই সময়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলেন—এক জ্যোতির্ম্ময় দিব্য পুরুষমূর্ত্তি সুষুম্নার মধ্য দিয়া ঐ সকল পদ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া জিহ্বাদ্বারা স্পর্শ করিয়া উহাদিগকে প্রস্ফুটিত করাইয়া দিতেছেন!

কুণ্ডলিনী-জাগরণ দর্শন।

স্বামী শ্রীবিবেকানন্দের একবালে ধ্যান করিতে বসিলেই সম্মুখে সুবৃহৎ বিচিত্র জ্যোতির্ম্ময় একটি ত্রিকোণ স্বতঃ সমুদিত হইত এবং ঐ ত্রিকোণকে জীবন্ত বলিয়া তাঁহার বোধ হইত! একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরকে ঐ বিষয় বলায়, তিনি বলিয়াছিলেন,—"বেশ, বেশ, তোর ব্রহ্মযোনি দর্শন হইয়াছে; বিল্বমূলে সাধনকালে আমিও ঐরূপ দেখিতাম এবং উহা প্রতিমূহূর্ত্তে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিতেছে, দেখিতে পাইতাম।"

ব্রহ্মযোনি দর্শন।

ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত পৃথক্ পৃথক্ যাবতীয় ধ্বনি একত্রীভূত হইয়া এক বিরাট প্রণবধ্বনি প্রতিমুহূর্ত্তে জগতে সর্ব্বত্র স্বতঃ উদিত হইতেছে—এ বিষয় ঠাকুর এই কালে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। আমাদিগের কেহ কেহ বলেন, এইকালে তিনি পশু পক্ষী প্রভৃতি মনুষ্যেতর জন্তুদিগের ধ্বনিসকলের যথাযথ অর্থবোধ করিতে পারিতেন—একথা তাঁহারা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছেন।

অনাহতধ্বনি শ্রবণ।

স্ত্রীযোনির মধ্যে তিনি এই কালে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে সাক্ষাৎ অধিষ্ঠিতা দেখিয়াছিলেন।

কুলাগারে দেবীদর্শন।

এইকালের শেষে ঠাকুর আপনাতে অণিমাদি সিদ্ধি বা বিভূতির

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৩য় অধ্যায়।

আবির্ভাব অনুভব করিয়াছিলেন এবং নিজ ভাগিনেয় হৃদয়ের পরামর্শে ঐ সকল প্রয়োগ করিবার ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট একদিন জানিতে যাইয়া দেখিয়াছিলেন, উহারা বেশ্যা-বিষ্ঠার তুল্য হেয় ও সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। তিনি বলিতেন,—ঐরূপ দর্শন করা পর্য্যন্ত সিদ্ধাইয়ের নামে তাঁহার ঘৃণার উদয় হয়।

অষ্টসিদ্ধিসম্বন্ধে ঠাকুরের স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথা।

ঠাকুরের অণিমাদি সিদ্ধিসকলের অনুভব প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের মনে উদিত হইতেছে। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি পঞ্চবটীতলে নির্জ্জনে একদিন আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন,—'দ্যাখ, আমাতে প্রসিদ্ধ অষ্টসিদ্ধি উপস্থিত রহিয়াছে, কিন্তু আমি ঐ সকলের কখন প্রয়োগ করিব না, একথা বহুপূর্ব্ব হইতে নিশ্চয় করিয়াছি—উহাদিগের প্রয়োগ করিবার আমার কোনরূপ আবশ্যকতাও দেখি না; তোকে ধর্ম্মপ্রচারাদি অনেক কার্য্য করিতে হইবে, তোকেই ঐ সকল দান করিব, স্থির করিয়াছি—গ্রহণ কর।' স্বামিজী তদুত্তরে জিজ্ঞাসা করেন,—'মহাশয়, ঐ সকল আমাকে ঈশ্বরলাভে কোনরূপ সহায়তা করিবে কি?' পরে ঠাকুরের উত্তরে যখন বুঝিলেন, উহারা ধর্ম্ম-প্রচারাদি কার্য্যে কিছুদূর পর্য্যন্ত সহায়তা করিতে পারিলেও, ঈশ্বর-লাভে কোনরূপ সহায়তা করিবে না, তখন তিনি ঐ সকল গ্রহণে অসম্মত হইলেন। স্বামিজী বলিতেন,—তাঁহার ঐরূপ আচরণে ঠাকুর তাঁহার উপর অধিকতর প্রসন্ন হইয়াছিলেন।

মোহিনীমায়া দর্শন।

শ্রীশ্রীজগন্মাতার মোহিনী-মায়ার দর্শন করিবার ইচ্ছা মনে সমুদিত হইয়া ঠাকুর এইকালে দর্শন করিয়াছিলেন—এক অপূর্ব্ব সুন্দরী স্ত্রীমূর্ত্তি গঙ্গাগর্ভ হইতে উত্থিতা হইয়া ধীরপদবিক্ষেপে পঞ্চবটীতে আগমন করিলেন, ক্রমে দেখিলেন, ঐ রমণী পূর্ণগর্ভা; পরে দেখিলেন, ঐ রমণী তাঁহার সম্মুখেই সুন্দর কুমার

প্রসব করিয়া তাহাকে কত স্নেহে স্তন্যদান করিতেছেন; পরক্ষণে দেখিলেন, রমণী কঠোর করালবদনা হইয়া ঐ শিশুকে গ্রাস করিয়া পুনরায় গঙ্গাগর্ভে প্রবিষ্টা হইলেন।

ষোড়শীমূর্ত্তির সৌন্দর্য্য।

পূর্ব্বোক্ত দর্শনসকল ভিন্ন ঠাকুর এই কালে দশভুজা হইতে দ্বিভুজা পর্য্যন্ত কত যে দেবীমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। উঁহাদিগের মধ্যে কোন কোনটি তাঁহাকে নানাভাবে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ মূর্ত্তিসমূহের সকলগুলিই অপূর্ব্বস্বরূপা হইলেও, শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বরী বা ষোড়শী মূর্ত্তির সৌন্দর্য্যের সহিত তাঁহাদিগের রূপের তুলনা হয় না—একথা আমরা তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি। তিনি বলিতেন—"ষোড়শী বা ত্রিপুরামূর্ত্তির অঙ্গ হইতে রূপ-সৌন্দর্য্য গলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পতিত ও বিচ্ছুরিত হইতে দেখিয়াছিলাম!" এতদ্ভিন্ন ভৈরবাদি নানা দেবমূর্ত্তিসকলের দর্শনও ঠাকুর এই সময়ে পাইয়াছিলেন।

অলৌকিক দর্শন ও অনুভবসকল ঠাকুরের জীবনে তন্ত্রসাধনকাল হইতে নিত্য এতই উপস্থিত হইয়াছিল যে, তাহাদের সম্যক্ উল্লেখ করা মনুষ্যশক্তির সাধ্যাতীত বলিয়া আমাদিগের প্রতীতি হইয়াছে।

তন্ত্রসাধনে সিদ্ধিলাভে ঠাকুরের দেহবোধ-রাহিত্য ও বালকভাব প্রাপ্তি।

তন্ত্রোক্তসাধনকাল হইতে ঠাকুরের সুষুম্নাদ্বার পূর্ণভাবে উন্মোচিত হইয়া, তাঁহার বালকবৎ অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার কথা আমরা তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি। এই কালের শেষভাগ হইতে তিনি পরিহিত বস্ত্র ও যজ্ঞসূত্রাদি, চেষ্টা করিলেও অঙ্গে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেন না। ঐ সকল কখন কোথায় যে পড়িয়া যাইত, তাহা জানিতে পারিতেন না। শ্রীশ্রীজগদম্বার শ্রীপাদপদ্মে মন সতত নিবিষ্ট থাকা বশতঃ তাঁহার শরীর-বোধ না থাকাই যে উহার হেতু, তাহা আর বলিতে হইবে না। নতুবা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক

তিনি যে কখন ঐরূপ করেন নাই, বা অন্যত্রদৃষ্ট পরমহংসদিগের ন্যায় উলঙ্গ থাকিতে অভ্যাস করেন নাই—একথা আমরা তাঁহার শ্রীমুখে অনেকবার শ্রবণ করিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন,—ঐ সকল সাধনশেষে তাঁহার সকল পদার্থে অদ্বৈতবুদ্ধি এত অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, বাল্যাবধি তিনি যাহাকে হেয় নগণ্য বস্তু বলিয়া পরিগণনা করিতেন, তাহাকেও মহা পবিত্র বস্তু সকলের সহিত তুল্য দেখিতেন। বলিতেন—"তুলসী ও সজিনা গাছের পত্র সমভাবে পবিত্র বোধ হইত।"

তন্ত্রসাধনকালে ঠাকুরের অঙ্গকান্তি।

এই কাল হইতে আরম্ভ হইয়া কয়েক বৎসর পর্যন্ত ঠাকুরের অঙ্গকান্তি এত অধিক হইয়াছিল যে, তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র লোকনয়নের আকর্ষণের বিষয় হইয়াছিলেন। তাঁহার নিরভিমান চিত্তে উহাতে এত বিরক্তির উদয় হইত যে, তিনি উক্ত দিব্যকান্তি পরিহারের জন্য শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট অনেক সময় প্রার্থনা করিয়া বলিতেন—'মা, আমার এ বাহ্য রূপে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, উহা লইয়া তুই আমাকে আন্তরিক আধ্যাত্মিক রূপ প্রদান কর্।' তাঁহার ঐরূপ প্রার্থনা কালে পূর্ণ হইয়াছিল, একথা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।*

ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীশ্রীযোগমায়ার অংশ ছিলেন।

তন্ত্রোক্ত সাধনে ব্রাহ্মণী যেমন ঠাকুরকে সহায়তা করিয়াছিলেন, ঠাকুরও তদ্রূপ ব্রাহ্মণীর আধ্যাত্মিক জীবন পূর্ণ করিতে উত্তরকালে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি ঐরূপ না করিলে, ব্রাহ্মণী যে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিতা হইতে পারিতেন না, একথার আভাস আমরা পাঠককে অন্যত্র দিয়াছি।† ব্রাহ্মণীর নাম যোগেশ্বরী ছিল, এবং ঠাকুর তাঁহাকে শ্রীশ্রীযোগমায়ার অংশসম্ভূতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন।

---

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৭ম অধ্যায়।

† গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ, ৮ম অধ্যায়।

তন্ত্রসাধনপ্রভাবে দিব্যশক্তি লাভ করিয়া ঠাকুরের অন্য এক বিষয়ের উপলব্ধি হইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসাদে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, উত্তরকালে বহু ব্যক্তি তাঁহার নিকটে ধর্ম্ম লাভের জন্য উপস্থিত হইয়া কৃতার্থ হইবে। পরম অনুগত শ্রীযুক্ত মথুর এবং হৃদয় প্রভৃতিকে তিনি ঐ উপলব্ধির কথা বলিয়াছিলেন। মথুর তাহাতে বলিয়াছিলেন, 'বেশ ত বাবা, সকলে মিলিয়া তোমাকে লইয়া আনন্দ করিব।'

— —

দ্বাদশ অধ্যায়।

জটাধারী ও বাৎসল্যভাব সাধন।

সন ১২৬৭ সালের শেষ ভাগে পুণ্যবতী রাণী রাসমণির দেহ-ত্যাগের পর ভৈরবী শ্রীমতী যোগেশ্বরী দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আগমন করিয়াছিলেন। ঐকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সন ১২৬৯ সালের শেষভাগ পর্য্যন্ত ঠাকুর তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহ অনুষ্ঠান করিয়া-ছিলেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, ঐ কালের প্রারম্ভ হইতে মথুরবাবু ঠাকুরের সেবাধিকার পূর্ণভাবে লাভ করিয়া ধন্য হইয়া-ছিলেন। ঐকালের পূর্ব্বে মথুর বারম্বার পরীক্ষা করিয়া ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব ঈশ্বরানুরাগ, সংযম এবং ত্যাগবৈরাগ্য সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলেন। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার সহিত তাঁহাতে মধ্যে মধ্যে উন্মত্ততারূপ ব্যাধির সংযোগ হয় কি না তদ্বিষয়ে তিনি তখনও একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। তন্ত্রসাধনকালে তাঁহার মন হইতে ঐ সংশয় সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, অলৌকিক বিভূতিসকলের বারম্বার প্রকাশ দেখিতে পাইয়া এই কালে তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা হইয়া-ছিল, তাঁহার ইষ্টদেবী তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহাবলম্বনে তাঁহার সেবা লইতে-ছেন, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া তাঁহাকে সর্ব্ববিষয়ে রক্ষা করিতেছেন এবং তাঁহার প্রভুত্ব ও বিষয়াধিকার সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহাকে দিন দিন অশেষ মর্য্যাদা ও গৌরবসম্পন্ন করিয়া তুলিতেছেন। মথুরামোহন তখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে-

ঠাকুরের কৃপালাভে মথুরের অনুভব ও আচরণ।

ছিলেন, তাহাতেই সিদ্ধকাম হইতেছিলেন এবং ঠাকুরের কৃপালাভে আপনাকে বিশেষভাবে দৈবসহায়বান্ বলিয়া অনুভব করিতেছিলেন। সুতরাং ঠাকুরের সাধনানুকূল দ্রব্যসমূহের সংগ্রহে এবং তাঁহার অভিপ্রায়মত দেবসেবা ও অন্যান্য সৎকর্ম্মে মথুরের এই কালে, বহুল অর্থ ব্যয় করা বিচিত্র নহে।

সাধনসহায়ে ঠাকুরের আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রকাশ দিন দিন যত বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাঁহার শ্রীপদাশ্রয়ী মথুরের সর্ব্ববিষয়ে উৎসাহ, সাহস এবং বল ততই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার আশ্রয় ও কৃপালাভে ভক্ত নিজ হৃদয়ে যে অপূর্ব্ব উৎসাহ এবং বলসঞ্চার অনুভব করেন, মথুরের অনুভূতি এখন তাদৃশী হইয়াছিল। তবে রজোগুণী সংসারী মথুরের ভক্তি ঠাকুরের সেবা ও পুণ্যকার্য্য সকলের অনুষ্ঠানমাত্র করিয়াই পরিতুষ্ট থাকিত, আধ্যাত্মিক রাজ্যের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া গূঢ় রহস্যসকল প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হইত না। ঐরূপ না হইলেও কিন্তু মথুরের মন তাঁহাকে একথা স্থির বুঝাইয়াছিল যে ঠাকুরই তাঁহার বল, বুদ্ধি, ভরসা, তাঁহার ইহকাল পরকালের সম্বল, এবং তাঁহার বৈষয়িক উন্নতি ও পদমর্য্যাদা লাভের মূলীভূত কারণ।

ঠাকুরের কৃপালাভে মথুর যে এখন আপনাকে বিশেষ মহিমান্বিত জ্ঞান করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ের পরিচয় আমরা তাঁহার এই কালানুষ্ঠিত কার্য্যে পাইয়া থাকি। "রাণী রাসমণির জীবনবৃত্তান্ত" শীর্ষক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি এইকালে (সন ১২৭০ সালে) বহুব্যয়সাধ্য অন্নমেরু ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হৃদয় বলিত, এই ব্রতকালে প্রভূত স্বর্ণরৌপ্যাদি ব্যতীত সহস্র মন চাউল ও সহস্র মন তিল ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে দান করা হইয়াছিল এবং সহচরী নাম্নী প্রসিদ্ধ

মথুরের অন্নমেরু ব্রতানুষ্ঠান।

গায়িকার কীর্ত্তন, রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান এবং যাত্রা প্রভৃতিতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী কিছু কালের জন্য উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। ঐ সকল গায়ক-গায়িকাদিগের ভক্তিরসাশ্রিত সঙ্গীত শ্রবণে তাঁহাকে মুহুর্মুহুঃ ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইতে দেখিয়া শ্রীযুত মথুর, ঠাকুরের পরিতৃপ্তির তারতম্যকেই তাহাদিগের গুণপনার পরিমাপক-স্বরূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে বহুমূল্য শাল, রেশমী বস্ত্র এবং প্রচুর মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত ব্রতানুষ্ঠানের স্বল্প-কাল পূর্ব্বে ঠাকুর, বর্দ্ধমানরাজের প্রধান সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মলোচনের গভীর পাণ্ডিত্য ও নিরভিমানিতার কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, অন্নমেরু ব্রতকালে আহূত পণ্ডিতসভাতে পদ্মলোচনকে আনয়ন ও দান গ্রহণ করাইবার নিমিত্ত শ্রীযুত মথুরের বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল। ঠাকুরের প্রতি তাঁহার অচলাভক্তির কথা জানিতে পারিয়া মথুর উক্ত পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিতে হৃদয়রামকে পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন নানাকারণে মথুরের ঐ নিমন্ত্রণ গ্রহণে অসমর্থ হইয়াছিলেন। পদ্মলোচন পণ্ডিতের কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র সবিস্তারে বলিয়াছি।*

বৈদান্তিক পণ্ডিত পদ্মলোচনের সহিত ঠাকুরের সাক্ষাৎ।

তান্ত্রিক সাধনসমূহ অনুষ্ঠানের পর ঠাকুর বৈষ্ণব মতের সাধনসকলে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ঐরূপ হইবার কতকগুলি স্বাভাবিক কারণ আমরা অনুসন্ধানে পাইয়া থাকি। প্রথম—ভক্তিমতি ব্রাহ্মণী বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত পঞ্চভাবাশ্রিত সাধনসমূহে স্বয়ং পারদর্শিনী ছিলেন এবং ঐ ভাবসকলের অন্যতমকে আশ্রয় পূর্ব্বক তন্ময়চিত্তে অনেক

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—২য় অধ্যায়।

কাল অবস্থান করিতেন। নন্দরাণী যশোদার ভাবে তন্ময় হইয়া ঠাকুরকে বালগোপাল জ্ঞানে ভোজন করাইবার কথা আমরা তাঁহার সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। অতএব বৈষ্ণব মত সাধনবিষয়ে ঠাকুরকে তাঁহার উৎসাহ প্রদান করা বিচিত্র নহে। দ্বিতীয়—বৈষ্ণব-কুল-সম্ভূত ঠাকুরের বৈষ্ণব ভাবসাধনে অনুরাগ থাকা স্বাভাবিক। কামারপুকুর অঞ্চলে ঐ সকল সাধন বিশেষভাবে প্রচলিত থাকায় উহাদিগের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইবার বাল্যকাল হইতে বিশেষ সুযোগ ছিল। তৃতীয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট কারণ—ঠাকুরের ভিতর আজীবন পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়বিধ প্রকৃতির

ঠাকুরের বৈষ্ণব মতের সাধনসমূহে প্রবৃত্ত হইবার কারণ।

অদৃষ্টপূর্ব্ব সম্মিলন দেখা যাইত। উহাদিগের একের প্রভাবে তিনি সিংহপ্রতিম নির্ভীক-বিক্রমশালী সর্ব্ববি[illegible]য়ের কারণান্বেষী, কঠোর পুরুষপ্রবররূপে প্রতিভাত হইতেন, এ[illegible] অন্যের প্রকাশে ললনাজন-সুলভ কোমল-কঠোর স্বভাববিশিষ্ট হইয়া হৃদয় দিয়া জগতের যাবতীয় বস্তু ও ব্যক্তিকে দেখিতেছেন ও পরিমাণ করিতেছেন, এইরূপ দেখা যাইত। শেষোক্ত প্রকৃতির বশে তাঁহাতে কতকগুলি বিষয়ে তীব্র অনুরাগ ও অন্য কতকগুলিতে তীব্র বিরাগ স্বভাবতঃ উপস্থিত হইত এবং ভাবাবেশে অশেষ ক্লেশ হাস্যমুখে বহন করিতে পারিলেও ভাববিহীন হইয়া ইতরসাধারণের ন্যায় কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেন না।

সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুর বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত শান্ত, দাস্য, এবং কখন কখন শ্রীকৃষ্ণসখা সুদামাদি ব্রজবালকগণের ন্যায় সখ্যভাবাবলম্বনে সাধনে স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রগতপ্রাণ মহাবীরকে আদর্শরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক দাস্যভক্তি অবলম্বনে তাঁহার কিছুকাল অবস্থিতি এবং জনকনন্দিনী, জনম-

দুঃখিনী সীতার দর্শনলাভ প্রভৃতি কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত বাৎসল্য ও মধুররসাশ্রিত মুখ্য ভাবদ্বয় সাধনেই তিনি এখন মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। দেখিতে পাওয়া যায়, এইকালে তিনি আপনাকে শ্রীশ্রীজগন্মাতার সখারূপে ভাবনা করিয়া চামর-হস্তে তাঁহাকে বীজনে নিযুক্ত আছেন, শরৎ-কালীন দেবীপূজাকালে মথুরের কলিকাতাস্থ বাটীতে উপস্থিত হইয়া রমণীজনোচিত সাজে সজ্জিত ও কুলস্ত্রীগণ পরিবৃত হইয়া ৺দেবীর দর্শনাদি করিতেছেন এবং স্ত্রীভাবের প্রাবল্যে অনেক সময়ে স্বয়ং যে পুংদেহবিশিষ্ট, একথা বিস্মৃত হইতেছেন।* আমরা যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে যাইতে আরম্ভ করিয়াছি, তখনও তাঁহাতে সময়ে সময়ে প্রকৃতিভাবের উদয় হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু তখন উহার এই কালের মত দীর্ঘকালব্যাপী আবেশ উপস্থিত হইত না। ঐরূপ হইবার আবশ্যকতাও ছিল না। কারণ, স্ত্রী-পুং-প্রকৃতিগত যাবতীয় ভাব এবং তদতীত অদ্বৈতভাবমুখে ইচ্ছামত অবস্থান করা শ্রীশ্রীজগ-দম্বার কৃপায় তাঁহার তখন সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং সমীপাগত প্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণসাধনের জন্য ঐ সকল ভাবের যেটীতে যতক্ষণ ইচ্ছা তিনি অবস্থান করিতেছিলেন।

বাৎসল্য ও মধুরভাব সাধনের পূর্ব্বে ঠাকুরের ভিতর স্ত্রীভাবের উদয়।

ঠাকুরের সাধনকালের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পাঠককে কল্পনাসহায়ে সর্ব্বাগ্রে অনুধ্যান করিয়া দেখিতে হইবে, তাঁহার মন জন্মাবধি কীদৃশ অসাধারণ ধাতুতে গঠিত থাকিয়া কিভাবে সংসারে নিত্য বিচরণ করিত এবং আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের প্রবল বাত্যাভিমুখে পতিত হইয়া বিগত আট বৎসরে উহাতে কিরূপ

ঠাকুরের মনের গঠন কিরূপ ছিল তদ্বিষয়ের আলোচনা।

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৭ম অধ্যায়।

পরিবর্ত্তনসকল উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি, ১২৬২ সালে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে যখন তিনি প্রথম পদার্পণ করেন এবং উহার পরেও কিছুকাল পর্য্যন্ত তিনি সরলভাবে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতৃপিতামহগণ যেরূপে সৎপথে থাকিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিয়া আসিয়াছেন, তিনিও ঐরূপ করিবেন। আজন্ম অভিমানরহিত তাঁহার মনে একথা একবারও উদয় হয় নাই যে, তিনি সংসারের অন্য কাহারও অপেক্ষা কোন অংশে বড় বা বিশেষগুণসম্পন্ন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অসাধারণ বিশেষত্ব প্রতি পদে প্রকাশিত হইয়া পড়িতে লাগিল। এক অপূর্ব্ব দৈব শক্তি যেন প্রতিক্ষণ তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া সংসারের রূপরসাদি প্রত্যেক বিষয়ের অনিত্যত্ব ও অকিঞ্চিৎকরত্ব উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া তাঁহার নয়নসম্মুখে ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে সর্ব্বদা বিপরীত পথে চালিত করিতে লাগিল। স্বার্থশূন্য সত্যমাত্রানুসন্ধিৎসু ঠাকুর উহার ইঙ্গিতে চলিতে ফিরিতে শীঘ্রই আপনাকে অভ্যস্ত করিয়া ফেলিলেন। পার্থিব ভোগ্যবস্তুসকলের কোনটী লাভ করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে প্রবল থাকিলে ঐরূপ করা তাঁহার যে সুকঠিন হইত, একথা বুঝিতে পারা যায়।

সর্ব্ব বিষয়ে ঠাকুরের আজীবন আচরণ স্মরণ করিলেই পূর্ব্বোক্ত কথা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে। সংসারে প্রচলিত বিদ্যাভ্যাসের উদ্দেশ্য, 'চাল কলা বাঁধা' বা অর্থোপার্জ্জন বুঝিয়া তিনি লেখাপড়া শিখিলেন না—সংসারযাত্রানির্ব্বাহে সাহায্য হইবে বলিয়া পূজকের পদ গ্রহণ করিয়া দেবোপাসনার অন্যোদ্দেশ্য বুঝিলেন এবং ঈশ্বরলাভের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন—সম্পূর্ণ সংযমেই ঈশ্বরলাভ হয়, একথা বুঝিয়া বিবাহিত হইলেও কখন স্ত্রী গ্রহণ করিলেন না—সঞ্চয়শীল ব্যক্তি

ঠাকুরের মনে সংস্কারবন্ধন কত অল্প ছিল।

ঈশ্বরে পূর্ণনির্ভরবান্ হয় না বুঝিয়া কাঞ্চনাদি দূরের কথা, সামান্য পদার্থসকল সঞ্চয়ের ভাবও মন হইতে এককালে উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন—ঐরূপ অনেক কথা ঠাকুরের সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়। ঐ সকল কথার অনুধাবনে বুঝিতে পারা যায়, ইতরসাধারণ জীবের মোহকর সংস্কারবন্ধনসকল তাঁহার মনে বাল্যাবধি কতদূর অল্প প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। উহাতে এই কথারও স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, তাঁহার ধারণাশক্তি এত প্রবল ছিল যে, মনের পূর্ব্বসংস্কার-সকল তাঁহার সম্মুখে মস্তকোত্তোলন করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করাইতে কখনও সমর্থ হইত না।

তদ্ভিন্ন আমরা দেখিয়াছি, বাল্যকাল হইতে ঠাকুর শ্রুতিধর ছিলেন। যাহা একবার শুনিতেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক আবৃত্তি করিতে পারিতেন এবং তাঁহার স্মৃতি উহা চিরকালের জন্য ধারণ করিয়া থাকিত। বাল্যকালে রামায়ণাদি কথা-গান এবং যাত্রা প্রভৃতি একবার শ্রবণ করিবার পরে বয়স্যগণকে লইয়া কামারপুকুরে গোঠে ব্রজে তিনি ঐ সকলের কিরূপে পুনরাবৃত্তি করিতেন, তদ্বিষয় পাঠকের জানা আছে। অতএব দেখা যাইতেছে, অদৃষ্টপূর্ব্ব সত্যানুরাগ, শ্রুতিধরত্ব এবং সম্পূর্ণ ধারণারূপ দৈবী সম্পত্তিনিচয় নিজস্ব করিয়া ঠাকুর সাধকজীবনে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। যে অনুরাগ, ধারণা প্রভৃতি গুণসমূহ আয়ত্ত করা সাধারণ সাধকের জীবনপাতী চেষ্টাতেও সুসাধ্য হয় না, তিনি সেই গুণসকলকে ভিত্তিরূপে অবলম্বন করিয়া সাধন-রাজ্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সুতরাং সাধনরাজ্যে স্বল্পকাল মধ্যে তাঁহার সর্ব্বাধিক ফললাভ করা বিচিত্র নহে। সাধনকালে কঠিন সাধনসমূহে তিনি তিন দিনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, একথা তাঁহার নিকটে শ্রবণ করিয়া অনেক সময়ে আমরা যে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়াছি,

সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ঠাকুরের মন কিরূপ গুণসম্পন্ন ছিল।

তাহার কারণ তাঁহার অসামান্য মানসিক গঠনের কথা আমরা তখন বিন্দুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই।

ঠাকুরের অসাধারণ মানসিক গঠনের দৃষ্টান্ত ও আলোচনা।

ঠাকুরের জীবনের কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিলে পাঠক আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত কথা বুঝিতে পারিবেন। সাধন কালের প্রথমে ঠাকুর নিত্যানিত্যবস্তু বিচারপূর্ব্বক 'টাকা মাটি—মাটি টাকা'—বলিতে বলিতে মৃত্তিকাসহ কয়েকখণ্ড মুদ্রা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন—অমনি তৎসহ যে কাঞ্চনাসক্তি মানবমনের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আপন অধিকার বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছে, তাহা চিরকালের নিমিত্ত তাঁহার মন হইতে সমূলে উৎপাটিত হইয়া গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জিত হইল। সাধারণে যে স্থানে গমনপূর্ব্বক স্নানাদি না করিলে আপনাদিগকে শুচি জ্ঞান করে না, সেই স্থান তিনি স্বহস্তে মার্জ্জনা করিলেন—অমনি তাঁহার মন, জন্মগত জাত্যভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক চিরকালের নিমিত্ত ধারণা করিয়া রাখিল, সমাজে অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত ব্যক্তিসমূহাপেক্ষা সে কোন অংশে বড় নহে। জগদম্বার সন্তান বলিয়া আপনাকে ধারণা পূর্ব্বক ঠাকুর যেমন শুনিলেন, তিনিই 'স্ত্রীয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু'—অমনি আর কখন স্ত্রীজাতির কাহাকেও ভোগলালসার চক্ষে দেখিয়া দাম্পত্য সুখ লাভে অগ্রসর হইতে পারিলেন না।—ঐ সকল বিষয়ের অনুধাবনে স্পষ্ট বুঝা যায়, অসামান্য ধারণাশক্তি না থাকিলে তিনি ঐরূপ ফলসকল কখন লাভ করিতে পারিতেন না। তাঁহার জীবনের ঐ সকল কথা শুনিয়া আমরা যে বিস্মিত হই, অথবা সহসা বিশ্বাস করিতে পারি না, তাহার কারণ—আমরা ঐ সময়ে আমাদিগের অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাই যে, ঐরূপে মৃত্তিকাসহ মুদ্রাখণ্ড সহস্রবার জলে বিসর্জ্জন করিলেও আমাদিগের কাঞ্চনাসক্তি যাইবে না—সহস্রবার কদর্য্য স্থান ধৌত করিলেও আমাদের মনের

অভিমান ধৌত হইবে না এবং জগজ্জননীর রমণীরূপে প্রকাশ হইয়া থাকিবার কথা আজীবন শুনিলেও কার্য্যকালে আমাদিগের রমণীমাত্রে মাতৃজ্ঞানের উদয় হইবে না! আমাদিগের ধারণাশক্তি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসংস্কারে নিতান্ত নিগড়বদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া, চেষ্টা করিয়াও আমরা ঐ সকল বিষয়ে ঠাকুরের ন্যায় ফললাভ করিতে পারি না। সংযমরহিত, ধারণাশূন্য, পূর্ব্বসংস্কারপ্রবল মন লইয়া আমরা ঈশ্বরলাভ করিতে সাধনরাজ্যে অগ্রসর হই—ফলও সুতরাং, তাঁহার ন্যায় লাভ করিতে পারি না!

ঠাকুরের ন্যায় অপূর্ব্ব শক্তিবিশিষ্ট মন সংসারে চারি পাঁচ শত বৎসরেও এক আধটা আসে কিনা সন্দেহ। সংযমপ্রবীণ, ধারণা-কুশল, পূর্ব্বসংস্কারনির্জীব সেই মন ঈশ্বরলাভের জন্য অদৃষ্টপূর্ব্ব অনুরাগ-ব্যাকুলতা-তাড়িত হইয়া আট বৎসর কাল আহারনিদ্রাত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূর্ণদর্শন লাভের জন্য সচেষ্ট থাকিয়া কতদূর শক্তিসম্পন্ন হইয়াছিল ও সূক্ষ্মদৃষ্টিসহায়ে কিরূপ প্রত্যক্ষসকল লাভ করিয়াছিল, তাহা আমাদের মত মনের কল্পনায় আনয়ন করাও অসম্ভব।

ঠাকুরের অনুজ্ঞায় মথুরের সাধুসেবা।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, রাণী রাসমণির মৃত্যুর পর দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে শ্রীশ্রীজগদম্বার সেবার কিছুমাত্র ত্রুটি পরিলক্ষিত হইত না। শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ মথুরামোহন ঐ সেবার জন্য নিয়মিত ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক, অনেক সময় ঠাকুরের নির্দ্দেশে ঐবিষয়ে তদপেক্ষা অধিক ব্যয় করিতেন। দেবদেবী সেবা ভিন্ন সাধুভক্তের সেবাতে তাঁহার বিশেষ প্রীতি ছিল। কারণ, ঠাকুরের শ্রীপদাশ্রয়ী মথুর তাঁহার শিক্ষায় সাধুভক্তগণকে ঈশ্বরের প্রতিরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। সে জন্য দেখা যায়, ঠাকুর যখন

এইকালে তাঁহাকে সাধুভক্তদিগকে অন্নদান ভিন্ন দেহরক্ষার উপযোগী বস্ত্র কম্বলাদিও নিত্যব্যবহার্য্য কমণ্ডলু প্রভৃতি জলপাত্র দানের ব্যবস্থা করিতে বলেন, তখন ঐ বিষয় সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি ঐ সকল পদার্থ ক্রয় করিয়া কালীবাটীর একটী গৃহ পূর্ণ করিয়া রাখেন এবং ঐ নূতন ভাণ্ডারের দ্রব্যসকল ঠাকুরের আদেশানুসারে বিতরিত হইবে, কর্ম্মচারীদিগকে এইরূপ বলিয়া দেন। আবার উহার কিছু-কাল পরে সকল সম্প্রদায়ের সাধুভক্তদিগকে সাধনার অনুকূল পদার্থ সকল দান করিয়া তাঁহাদিগের সেবা করিবার অভিপ্রায় ঠাকুরের মনে উদিত হইলে, মথুর তদ্বিষয় জানিতে পারিয়া, উহারও বন্দোবস্ত করিয়া দেন। * সম্ভবতঃ সন ১২৬৯—৭০ সালেই মথুরামোহন ঠাকুরের অভিপ্রায়ানুসারে ঐরূপে সাধুসেবার বহুল অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং ঐজন্য রাণী রাসমণির কালীবাটীর অদ্ভুত আতিথেয়তার কথা সাধুভক্তগণের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। রাণী রাসমণির জীবৎকাল হইতেই কালীবাটী তীর্থপর্য্যটনশীল সাধু-পরিব্রাজকগণের নিকটে পথিমধ্যে কয়েক দিন বিশ্রামলাভের স্থানবিশেষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকিলেও, এখন উহার সুনাম চারিদিকে সমধিক প্রসারিত হইয়া পড়ে এবং সর্ব্বসম্প্রদায়ভুক্ত সাধকাগ্রণী সকলে ঐ স্থানে উপস্থিত ও আতিথ্যগ্রহণে পরিতৃপ্ত হইয়া উহার সেবা-পরিচালককে আশীর্ব্বাদ-পূর্ব্বক গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। ঐরূপে সমাগত বিশিষ্ট সাধুদিগের কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে যতদূর শুনিয়াছি, তাহা অন্যত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছি। † এখানে তাহার পুনরুল্লেখ—'জটাধারী' নামক যে রামাইত সাধুর নিকট ঠাকুর রাম-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন ও 'শ্রীশ্রীরামলালা-নামক শ্রীরামচন্দ্রের বালবিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারই

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—২য় অধ্যায়।

† গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—৩য় অধ্যায়।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আগমনকাল পাঠককে জানাইবার জন্য। সম্ভবতঃ ১২৭০ সালে তিনি ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

জটাধারীর আগমন।

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি জটাধারীর অদ্ভুত অনুরাগ ও ভালবাসার কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে অনেকবার শ্রবণ করিয়াছি। বালক রামচন্দ্রের মূর্ত্তিই তাঁহার সমধিক প্রিয় ছিল। ঐ মূর্ত্তির বহুকাল সেবায় তাঁহার মন ভাবরাজ্যে আরূঢ় হইয়া এতদূর অন্তর্ম্মুখী ও তন্ময়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই তিনি দেখিতে পাইতেন, শ্রীরামচন্দ্রের জ্যোতিঃঘন বালবিগ্রহ সত্যসত্যই তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার ভক্তিপূত সেবা গ্রহণ করিতেছেন। প্রথমে ঐরূপ দর্শন মধ্যে মধ্যে ক্ষণকালের জন্য উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আনন্দে বিহ্বল করিত। কালে সাধনায় তিনি যত অগ্রসর হইয়াছিলেন, ঐ দর্শনও তত ঘনীভূত হইয়া বহুকালব্যাপী এবং ক্রমে নিত্য-পরিদৃষ্ট বিষয়সকলের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঐরূপে বাল শ্রীরামচন্দ্রকে তিনি একপ্রকার নিত্যসহচররূপে লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর যদবলম্বনে ঐরূপ পরম সৌভাগ্য—তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল সেই রামলালা বিগ্রহের সেবাতে আপনাকে নিত্য নিযুক্ত রাখিয়া, জটাধারী ভারতের নানা তীর্থ যদৃচ্ছাক্রমে পর্য্যটনপূর্ব্বক দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে এই সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

জটাধারীর সহিত ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

রামলালার সেবায় নিযুক্ত জটাধারী যে, বাল-রামচন্দ্রের ভাবঘন মূর্ত্তির সদা সর্ব্বদা দর্শন লাভ করেন, একথা তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। লোকে দেখিত, তিনি একটী ধাতুময় বালবিগ্রহের সেবা অপূর্ব্ব নিষ্ঠার সহিত সর্ব্বক্ষণ সম্পাদন করিয়া থাকেন, এই পর্য্যন্ত। ভাবরাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর ঠাকুরের দৃষ্টি কিন্তু তাঁহার

সহিত প্রথম সাক্ষাতেই স্থূল যবনিকার অন্তরাল ভেদ করিয়া অন্তরের গূঢ় রহস্য অবধারণ করিয়াছিল। ঐ জন্য প্রথম দর্শনেই তিনি জটাধারীর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল সাহ্লাদে প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে প্রতিদিন বহুক্ষণ অবস্থান করিয়া, তাঁহার সেবা ভক্তিভরে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। জটাধারী শ্রীরামচন্দ্রের যে ভাবঘন দিব্যমূর্ত্তির দর্শন সর্ব্বক্ষণ পাইতেন, সেই মূর্ত্তির দর্শন পাইয়াছিলেন বলিয়াই যে, ঠাকুর এখন ঐরূপ করিয়াছিলেন, একথা আমরা অন্যত্র বলিয়াছি।* ঐরূপে জটাধারীর সহিত ঠাকুরের সম্বন্ধ ক্রমে বিশেষ শ্রদ্ধাপূর্ণ ঘনিষ্ঠ ভাব ধারণ করিয়াছিল।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, ঠাকুর এই সময়ে আপনাকে রমণীজ্ঞানে তন্ময় হইয়া অনেক কাল অবস্থান করিতেছিলেন। হৃদয়ের প্রবল প্রেরণায় শ্রীশ্রীজগদম্বার নিত্যসঙ্গিনী জ্ঞানে অনেক সময় স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া থাকা, পুষ্পহারাদি রচনা করিয়া তাঁহার বেশভূষা করিয়া দেওয়া, গ্রীষ্মাপনোদনের জন্য বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে চামর ব্যজন করা, মথুরকে বলিয়া নূতন নূতন অলঙ্কার নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহাকে পরাইয়া দেওয়া এবং তাঁহার পরিতৃপ্তির জন্য তাঁহাকে নৃত্যগীতাদি শ্রবণ করান প্রভৃতি কার্য্যে তিনি এই সময়ে অনেক কাল অতিবাহিত করিতেছিলেন। জটাধারীর সহিত আলাপে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তিপ্রীতি পুনরুদ্দীপিত হইয়া তিনি এখন তাঁহার ভাবঘন শৈশবাবস্থার মূর্ত্তির দর্শন লাভ করিলেন, এবং প্রকৃতিভাবের প্রাবল্যে তাঁহার হৃদয় বাৎসল্যরসে পূর্ণ হইল। মাতা শিশুপুত্রকে দেখিয়া যে অপূর্ব্ব প্রীতি ও প্রেমাকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকেন, তিনি এখন ঐ শিশুমূর্ত্তির

স্ত্রীভাবের উদয়ে ঠাকুরের বাৎসল্যভাব সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া।

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—২য় অধ্যায়।

প্রতি সেইরূপ আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন। ঐ প্রেমাকর্ষণই তাঁহাকে এখন জটাধারীর বালবিগ্রহের পার্শ্বে বসাইয়া কিরূপে কোথা দিয়া সময় অতীত হইতেছে তাহা জানিতে দিত না। তাঁহার নিজ-মুখে শ্রবণ করিয়াছি, ঐ উজ্জ্বল দেবশিশু মধুময় বালচেষ্টায় ভুলাইয়া তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ নিজ সকাশে ধরিয়া রাখিতে নিত্য প্রয়াস পাইত, তাঁহার অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া পথ নিরীক্ষণ করিত এবং নিষেধ না শুনিয়া তাঁহার সহিত যথাতথা গমনে উদ্যত হইত!

ঠাকুরের উদ্যমশীল মন কখন কোন কার্য্যের অর্দ্ধেক নিষ্পন্ন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিত না। স্থূল কর্ম্মক্ষেত্রে প্রকাশিত তাঁহার ঐরূপ স্বভাব, সূক্ষ্ম ভাবরাজ্যের বিষয়সকলের অধিকারেও পরিদৃষ্ট হইত। দেখা যাইত, স্বাভাবিক প্রেরণায় ভাববিশেষ তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিলে, তিনি উহার চরম সীমা পর্য্যন্ত উপলব্ধি না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। তাঁহার ঐরূপ স্বভাবের অনুশীলন করিয়া কোন কোন পাঠক হয়ত ভাবিয়া বসিবেন,—'কিন্তু উহা কি ভাল?—যখন যে ভাব অন্তরে উদয় হইবে, তখনই তাহার হস্তের ক্রীড়াপুত্তলিস্বরূপ হইয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলে মানবের কখন কি কল্যাণ হইতে পারে? দুর্ব্বল মানবের অন্তরে সু এবং কু সকলপ্রকার ভাবই যখন অনুক্ষণ উদয় হইতেছে, তখন ঠাকুরের ঐ প্রকার স্বভাব তাঁহাকে কখন বিপথগামী না করিলেও, সাধারণের অনুকরণীয় হইতে পারে না। কেবলমাত্র সুভাবসকলই অন্তরে উদিত হইবে, আপনার প্রতি এতদূর বিশ্বাস স্থাপন করা মানবের কখনই কর্ত্তব্য নহে। অতএব সংযমরূপ রশ্মি দ্বারা ভাবরূপ অশ্বসকলকে সর্ব্বদা নিয়ত রাখাই মানবের লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য।'

কোন ভাবের উদয় হইলে উহার চরম উপলব্ধি করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টা, ঐরূপ করা কর্ত্তব্য কি না।

পূর্ব্বোক্ত কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াও, উত্তরে আমাদিগের কিছু বক্তব্য আছে। কামকাঞ্চন-নিবদ্ধ-দৃষ্টি ভোগলোলুপ মানব-মনের আপনার প্রতি অতদূর বিশ্বাস স্থাপন করা কখনও কর্ত্তব্য নহে,—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অতএব ইতরসাধারণ মানবের পক্ষে ভাবসংযমনের আবশ্যকতাবিষয়ে কোনরূপ সন্দেহের উত্থাপন করা নিতান্ত অদূর-দৃষ্টি ব্যক্তিরই সম্ভবপর। কিন্তু বেদাদি শাস্ত্রে আছে, ঈশ্বরকৃপায় বিরল কোন কোন সাধকের নিকট সংযম নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহাদিগের মন তখন কাম-কাঞ্চনের আকর্ষণ হইতে এককালে মুক্তিলাভ করিয়া কেবলমাত্র সুভাবসমূহের নিবাসভূমিতে পরিণত হয়। ঠাকুর বলিতেন—শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ঐরূপ মানবের মনে তখন তাঁহার কৃপায় কোন কুভাব মস্তকোত্তোলনপূর্ব্বক প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হয় না—"মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) তাহার পা কখনও বেতালে পড়িতে দেন না।" ঐরূপ অবস্থাপন্ন মানব তৎকালে অন্তরের প্রত্যেক মনোভাবকে বিশ্বাস করিলে তাহার দ্বারা কিছুমাত্র অনিষ্ট হওয়া দূরে থাকুক অপরের বিশেষ কল্যাণই সংসাধিত হয়। কারণ, দেহাভিমানবিশিষ্ট যে ক্ষুদ্র আমিত্বের প্রেরণায় আমরা স্বার্থপর হইয়া জগতের সমগ্র ভোগসুখাধিকারলাভকেও পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচনা করি না, অন্তরের সেই ক্ষুদ্র আমিত্ব ঈশ্বরের বিরাট আমিত্বে চিরকালের মত বিসর্জ্জিত হওয়ায়, ঐরূপ মানবের পক্ষে স্বার্থসুখান্বেষণ তখন এককালে অসম্ভব হইয়া উঠে। বিরাট্ ঈশ্বরের সর্ব্বকল্যাণকরী ইচ্ছাই সুতরাং ঐ মানবের অন্তরে তখন অপরের কল্যাণসাধনের জন্য বিবিধ মনোভাবরূপে সমুদিত হইয়া থাকে। অথবা ঐরূপ অবস্থাপন্ন

ঠাকুরের ন্যায় নির্ভরশীল সাধকের ভাব-সংযমের আবশ্যকতা নাই—উহার কারণ।

সাধক তখন 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী' একথা প্রাণে প্রাণে অনুক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া নিজ মনোগত ভাবসকলকে বিরাট্ পুরুষ ঈশ্বরেরই অভিপ্রায় বলিয়া স্থিরনিশ্চয় করিয়া উহাদিগের প্রেরণায় কার্য্য করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। ফলেও দেখা যায়, তাঁহাদিগের ঐরূপ অনুষ্ঠানে অপরের মহৎ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। ঠাকুরের ন্যায় অলোক-সামান্য মহাপুরুষদিগের উক্তবিধ অবস্থা জীবনের অতি প্রত্যুষেই আসিয়া উপস্থিত হয়। সেইজন্য ঐরূপ পুরুষদিগের জীবনেতিহাসে আমরা তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র যুক্তি তর্ক না করিয়া নিজ নিজ মনোগত ভাবসকলকে পূর্ণভাবে বিশ্বাসপূর্ব্বক অনেক সময়ে কার্য্যে অগ্রসর হইতে দেখিতে পাইয়া থাকি। বিরাট ইচ্ছাশক্তির সহিত নিজ ক্ষুদ্র ইচ্ছাকে সর্ব্বদা অভিন্ন রাখিয়া, তাঁহারা মানবসাধারণের মন-বুদ্ধির অবিষয়ীভূত বিষয়সকল তখন সর্ব্বদা ধরিতে বুঝিতে সক্ষম হয়েন। কারণ, বিরাট্ মনে সূক্ষ্ম ভাবাকারে ঐসকল বিষয় পূর্ব্ব হইতেই প্রকাশিত থাকে। আবার বিরাটেচ্ছার সর্ব্বদা সম্পূর্ণ অনুগত থাকায়, তাঁহারা এতদূর স্বার্থ ও ভয়শূন্য হয়েন যে, কি ভাবে কাহার দ্বারা তাঁহাদিগের ক্ষুদ্র শরীর মন ধ্বংস হইবে তদ্বিষয় পর্য্যন্ত পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিয়া, ঐ বস্তু, ব্যক্তি ও বিষয়সকলের প্রতি কিছুমাত্র বিরাগসম্পন্ন না হইয়া পরম প্রীতির সহিত ঐ কার্য্য সম্পাদনে তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন। কয়েকটি দৃষ্টান্তের এখানে উল্লেখ করিলেই আমাদের কথা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে। দেখ—শ্রীরামচন্দ্র জনকতনয়া সীতাকে নিষ্পাপা জানিয়াও ভবিতব্য বুঝিয়া, তাঁহাকে বনে বিসর্জ্জন করিলেন। আবার, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়ানুজ লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিলে নিজ লীলাসম্বরণ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়াও ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠান করি-

ঐরূপ সাধক নিজ শরীরত্যাগের কথা জানিতে পারিয়াও উদ্বিগ্ন হন না—ঐবিষয়ে দৃষ্টান্ত।

লেন। শ্রীকৃষ্ণ 'যদুবংশ ধ্বংস হইবে', পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিয়াও তৎপ্রতিরোধে বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া যাহাতে ঐ ঘটনা যথাকালে উপস্থিত হয়, তাহারই অনুষ্ঠান করিলেন। অপর ব্যাধহস্তে আপনার নিধন জানিয়াও ঐ কাল উপস্থিত হইলে বৃক্ষ-পত্রান্তরালে সর্ব্বশরীর লুক্কায়িত রাখিয়া নিজ আরক্তিম চরণ-যুগল এমনভাবে ধারণ করিয়া রহিলেন, যাহাতে ব্যাধ উহা দেখিবামাত্র পক্ষিভ্রমে শাণিত শর নিক্ষেপ করিল। তখন নিজ ভ্রমের জন্ম অনুতপ্ত ব্যাধকে আশীর্ব্বাদ ও সান্ত্বনাপূর্ব্বক তিনি যোগাবলম্বনে শরীর রক্ষা করিলেন।

মহামহিম বুদ্ধ, চণ্ডালের আতিথ্যগ্রহণে পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্তির কথা পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিয়াও উহা স্বীকারপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ ও সান্ত্বনার দ্বারা তাহাকে অপরের ঘৃণা ও নিন্দাবাদের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া উক্ত পদবীতে আরূঢ় হইলেন। আবার স্ত্রীজাতিকে সন্ন্যাসগ্রহণে অনুমতি প্রদান করিলে তৎ-প্রচারিত ধর্ম্ম শীঘ্র কলুষিত হইবে জানিতে পারিয়াও, মাতৃস্বসা আর্য্যা গৌতমীকে প্রব্রজ্যাগ্রহণে আদেশ করিলেন।

ঈশ্বরাবতার ঈশা, 'তাঁহার শিষ্য যূদা তাঁহাকে অর্থলোভে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে এবং তাহাতেই তাঁহার শরীর ধ্বংস হইবে' একথা জানিতে পারিয়াও, তাহার প্রতি সমভাবে স্নেহপ্রদর্শন করিয়া আজীবন তাহার কল্যাণ-চেষ্টায় আপনাকে নিযুক্ত রাখিলেন।

অবতারপুরুষদিগের ত কথাই নাই, সিদ্ধ জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের জীবনালোচনা করিয়াও আমরা ঐরূপ অনেক ঘটনা অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। অবতার পুরুষসকলের জীবনে একপক্ষে অসাধারণ উদ্যমশীলতার এবং অন্যপক্ষে বিরাটেচ্ছায় সম্পূর্ণ নির্ভরতার সামঞ্জস্য করিতে হইলে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, বিরাটেচ্ছার

অনুমোদনেই তাঁহাদিগের মধ্য দিয়া উদ্যমের প্রকাশ হইয়া থাকে, নতুবা নহে। অতএব দেখা যাইতেছে, ঈশ্বরেচ্ছার সম্পূর্ণ অনুগামী পুরুষসকলের অন্তর্গত স্বার্থ-সংস্কার-সমূহ এককালে বিনষ্ট হইয়া মন, এমন এক পবিত্রভূমিতে উপনীত হয়, যেখানে উহাতে শুদ্ধ ভিন্ন স্বার্থ-দুষ্ট ভাবসমূহের কখনও উদয় হয় না এবং ঐরূপ অবস্থাসম্পন্ন সাধকেরা নিশ্চিন্তমনে আপন মনোভাবসমূহে বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক উহাদিগের প্রেরণায় কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া দোষভাগী হয়েন না। ঠাকুরের ঐরূপ অনুষ্ঠানসমূহ ইতরসাধারণ মানবের পক্ষে অনুকরণীয় না হইলেও, পূর্ব্বোক্ত প্রকার অসাধারণ অবস্থাসম্পন্ন সাধককে নিজ জীবন পরিচালনে বিশেষালোক প্রদান করিবে, সন্দেহ নাই। ঐরূপ অবস্থাসম্পন্ন পুরুষদিগের আহারবিহারাদি সামান্য স্বার্থবাসনাকে শাস্ত্র ভৃষ্টবীজের সহিত তুলনা করিয়াছেন। অর্থাৎ বৃক্ষলতাদির বীজসমূহ উত্তাপদগ্ধ হইলে তাহাদের জীবনী-শক্তি অন্তর্হিত হইয়া সমজাতীয় বৃক্ষলতাদি যেমন উৎপন্ন করিতে পারে না, পুরুষদিগের সংসারবাসনা তদ্রূপ সংযম ও জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধীভূত হওয়ায়, উহারা তাঁহাদিগকে আর কখন ভোগতৃষ্ণায় আকৃষ্ট করিয়া বিপথগামী করিতে পারে না। ঠাকুর ঐ বিষয় আমাদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত বলিতেন, স্পর্শমণির সহিত সঙ্গত হইয়া লৌহের তরবারি স্বর্ণময় হইয়া যাইলে, উহার হিংসাক্ষম আকার মাত্রই বর্ত্তমান থাকে, উহা দ্বারা হিংসাকার্য্য আর করা চলে না।

ঐরূপ সাধকের মনে স্বার্থ-দুষ্ট বাসনা উদয় হয় না।

উপনিষদ্কার ঋষিগণ বলিয়াছেন, ঐ প্রকার অবস্থাসম্পন্ন সাধকেরা সত্যসঙ্কল্প হয়েন। অর্থাৎ তাঁহাদিগের অন্তরে উদিত সঙ্কল্প সকল সত্য ভিন্ন মিথ্যা কখনও হয় না। ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুরের মনে উদিত ভাবসকলকে বারংবার পরীক্ষার দ্বারা সত্য

বলিয়া না দেখিতে পাইলে, আমরা ঋষিদিগের পূর্ব্বোক্ত কথায় কখনও বিশ্বাসবান্ হইতে পারিতাম না। আমরা দেখিয়াছি, কোনরূপ আহার্য্য গ্রহণ করিতে যাইয়া ঠাকুরের মন সঙ্কুচিত হইলে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে তাহা ইতিপূর্ব্বে বাস্তবিকই দোষদুষ্ট হইয়াছে—কোন ব্যক্তিকে ঈশ্বরীয় কথা বলিতে যাইয়া তাঁহার মুখ বন্ধ হইয়া যাইলে প্রমাণিত হইয়াছে, বাস্তবিকই ঐ ব্যক্তি ঐ বিষয়ের সম্পূর্ণ অনধিকারী—কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে ইহজীবনে ধর্ম্মলাভ হইবে বলিয়া অথবা অত্যল্পমাত্র ধর্ম্ম লাভ হইবে বলিয়া তাঁহার উপলব্ধি হইলে, বাস্তবিকই তাহা সিদ্ধ হইয়াছে—কাহাকেও দেখিয়া তাঁহার মনে বিশেষ কোন ভাব বা দেবদেবীর কথা উদিত হইলে, উক্ত ব্যক্তি ঐ ভাবের বা ঐ দেবীর অনুগত সাধক বলিয়া জানা গিয়াছে—অন্তরের ভাব-প্রেরণায় সহসা কাহাকেও কোন কথা তিনি বলিলে, ঐ কথায় বিশেষালোক প্রাপ্ত হইয়া তাহার জীবন এককালে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ঐরূপ কত কথাই না তাঁহার সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়।

ঐরূপ সাধক সত্য-সঙ্কল্প হন, ঠাকুরের জীবনে ঐ বিষয়ের দৃষ্টান্ত সকল।

আমরা বলিয়াছি, জটাধারীর আগমনকালে ঠাকুর অন্তরের ভাব-প্রেরণায় অনেক সময় আপনাকে ললনাজনোচিত দেহ-মন-সম্পন্ন বলিয়া ধারণাপূর্ব্বক তদনুরূপ কার্য্য-সকলের অনুষ্ঠান করিতেন এবং শ্রীরামচন্দ্রের মধুময় বালারূপের দর্শনলাভে তৎপ্রতি বাৎসল্য-ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। কুলদেবতা ৺রঘুবীরের পূজা ও সেবাদি যথারীতি সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি বহুপূর্ব্বে রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও তাঁহার প্রতি সেব্য প্রভু ভিন্ন অন্য কোনভাবে তিনি আকৃষ্ট হয়েন নাই। বর্ত্তমানে ঐ দেবতার প্রতি পূর্ব্বোক্ত নবীন ভাব উপলব্ধি

জটাধারীর নিকটে ঠাকুরের দীক্ষা গ্রহণ-পূর্ব্বক বাৎসল্যভাব সাধন ও সিদ্ধি।

করায়, তিনি এখন গুরুমুখে যথাশাস্ত্র, ঐ ভাবসাধনোচিত মন্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক উহার চরমোপলব্ধি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। গোপালমন্ত্রে সিদ্ধকাম জটাধারী তাঁহার ঐরূপ আগ্রহ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সাহ্লাদে নিজ ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন এবং ঠাকুর ঐ মন্ত্রসহায়ে তৎপ্রদর্শিত পথে সাধনায় নিমগ্ন হইয়া কয়েক দিনের মধ্যেই শ্রীরামচন্দ্রের বালগোপালমূর্ত্তির দিব্যদর্শন অনুক্ষণ লাভে সমর্থ হইলেন। বাৎসল্যভাবসহায়ে ঐ দিব্যমূর্ত্তির অনুধ্যানে তন্ময় হইয়া তিনি অচিরে প্রত্যক্ষ করিলেন—

> "যো রাম দশরথকি বেটা,
> ওহি রাম ঘট্‌-ঘট্‌মে লেটা।
> ওহি রাম জগৎ পশেরা,
> ওহি রাম সব্‌সে নেয়ারা।"

অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র কেবলমাত্র দশরথের পুত্র নহেন, কিন্তু প্রতি শরীর আশ্রয় করিয়া জীবভাবে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন। আবার ঐরূপে অন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক জগদ্রূপে নিত্য-প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও তিনি জগতের যাবতীয় পদার্থ হইতে পৃথক, মায়ারহিত নির্গুণ স্বরূপে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত হিন্দি দোঁহাটি আমরা ঠাকুরকে অনেক সময়ে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি।

শ্রীগোপালমন্ত্রে দীক্ষাপ্রদান ভিন্ন, জটাধারী, 'রামলালা'-নামক যে বালগোপালবিগ্রহের এতকাল পর্য্যন্ত নিষ্ঠার সহিত সেবা করিতে-ছিলেন তাহা ঠাকুরকে দিয়া গিয়াছিলেন। কারণ, ঐ জীবন্ত বিগ্রহ, এখন হইতে ঠাকুরের নিকটে অবস্থান করিবেন বলিয়া স্বীয় অভিপ্রায় তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। জটাধারী ও ঠাকুরকে লইয়া ঐ বিগ্রহের অপূর্ব্ব লীলাবিলাসের কথা আমরা অন্যত্র সবিস্তারে

ঠাকুরকে জটাধারীর 'রামলীলা' বিগ্রহ দান।

উল্লেখ করিয়াছি, * এজন্য তৎপ্রসঙ্গের এখানে পুনরায় উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন।

বৈষ্ণবমত সাধনকালে ঠাকুর ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কতদূর সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন।

বাৎসল্যভাবের পরিপুষ্টি ও চরমোৎকর্ষলাভের জন্য ঠাকুর যখন পূর্ব্বোক্তরূপে সাধনায় মনোনিবেশ করেন, তখন যোগেশ্বরী নাম্নী ভৈরবী ব্রহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন, একথা আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠককে বলিয়াছি। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত পঞ্চভাবাশ্রিত সাধনে তিনিও বিশেষ অভিজ্ঞা ছিলেন। বাৎসল্য ও মধুরভাব সাধন-কালে ঠাকুর তাঁহার নিকট হইতে বিশেষ কোন সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি না, ঐ বিষয়ে কোন কথা আমরা তাঁহার নিকটে স্পষ্ট শ্রবণ করি নাই। তবে, বাৎসল্য-ভাবে আরূঢ়া হইয়া ব্রাহ্মণী অনেক সময় ঠাকুরকে গোপালরূপে দর্শন-পূর্ব্বক সেবা করিতেন, একথা ঠাকুরের শ্রীমুখে ও হৃদয়ের নিকটে শুনিয়া অনুমিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের বালগোপালমূর্ত্তিতে বাৎসল্যভাব আরোপিত করিয়া উহার চরমোপলব্ধি করিবার কালে এবং মধুর-ভাব সাধনকালে ঠাকুর তাঁহার নিকট হইতে কিছু না কিছু সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিশেষ কোন প্রকার সাহায্য না পাইলেও, ব্রাহ্মণীকে ঐরূপ সাধনসমূহে নিরতা দেখিয়া এবং তাঁহার মুখে ঐ সকলের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া, ঠাকুরের মনে ঐ সকল ভাব-সাধনের ইচ্ছা যে বলবতী হইয়া উঠে, একথা অন্ততঃ স্বীকার করিতে পারা যায়।

---

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—২য় অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মধুরভাবের সারতত্ত্ব।

সাধক না হইলে সাধকজীবনের ইতিহাস বুঝা সুকঠিন। কারণ, সাধনা সূক্ষ্ম ভাবরাজ্যের কথা। সেখানে রূপরসাদি বিষয়সমূহের মোহনীয় স্থূল মূর্ত্তিসকল নয়নগোচর হয় না, বাহ্যবস্তু ও ব্যক্তিসকলের অবলম্বনে ঘটনাবলীর বিচিত্র সমাবেশপারম্পর্য্য দেখা যায় না, অথবা রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্বসমাকুল মানবমন প্রবৃত্তির প্রেরণায় অস্থির হইয়া ভোগসুখ করায়ত্ত করিবার নিমিত্ত অপরকে পশ্চাৎপদ করিতে যেরূপ উদ্যম প্রয়োগ করে এবং বিষয়বিমুগ্ধ সংসার যাহাকে বীরত্ব ও মহত্ত্ব বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে—সেরূপ উন্মাদ উদ্যমাদির বিন্দুমাত্র প্রকাশ নাই। সেখানে আছে কেবল সাধকের নিজ অন্তর ও তন্মধ্যস্থ জন্মজন্মান্তরাগত অনন্ত সংস্কারপ্রবাহ। আছে কেবল, বাহ্যবস্তু বা ব্যক্তিবিশেষের সংঘর্ষে আসিয়া সাধকের উচ্চভাব ও লক্ষ্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, এবং তদ্ভাবে মনের একতানতা আনয়ন করিবার ও তল্লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য নিজ প্রতিকূল সংস্কারসমূহের সহিত দৃঢ় সংকল্পপূর্ব্বক অনন্ত সংগ্রাম। আছে কেবল, বাহ্যবিষয়সমূহ হইতে সাধক মন ক্রমে এককালে বিমুখ হইয়া নিজাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক আপনাতে আপনি ডুবিয়া যাওয়া, অন্তররাজ্যের গভীর গভীরতর প্রদেশসমূহে অবতীর্ণ হইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর ভাবস্তরসমূহের উপলব্ধি করা, এবং পরিশেষে নিজাস্তিত্বের গভীরতম প্রদেশে উপস্থিত হইয়া

সাধকের কঠোর অন্তঃসংগ্রাম এবং লক্ষ্য।

যদবলম্বনে সর্ব্বভাবের এবং অহংজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে এবং যদাশ্রয়ে উহারা নিত্য অবস্থান করিতেছে, সেই 'অশব্দমস্পর্শম রূপমব্যয়মেকমেবাদ্বিতীয়ম্' বস্তুর উপলব্ধি ও তাহার সহিত একীভূত হইয়া অবস্থিতি। পরে, সংস্কারসমূহ এককালে পরিক্ষীণ হইয়া মনের সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক ধর্ম্ম চিরকালের মত যতদিন নাশ না হয় ততদিন পর্য্যন্ত, যে পথাবলম্বনে সাধক-মন পূর্ব্বোক্ত অদ্বয় বস্তুর উপলব্ধিতে উপস্থিত হইয়াছিল, বিলোমভাবে সেই পথ দিয়া সমাধি অবস্থা হইতে পুনরায় বহির্জ্জগতের উপলব্ধিতে উহার উপস্থিত হওয়া। ঐরূপে সমাধি হইতে বাহ্য জগতের উপলব্ধিতে এবং উহা হইতে সমাধি অবস্থায় সাধক-মনের গতাগতি পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে। জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাস আবার সৃষ্টির প্রাচীনতম যুগ হইতে অদ্যাবধি এমন কয়েকটি সাধকমনের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছে, যাহাদের পূর্ব্বোক্ত সমাধি অবস্থাই যেন স্বাভাবিক অবস্থান ভূমি—ইতরসাধারণ মানবের কল্যাণের জন্য কোনরূপে জোর করিয়া তাঁহারা কিছু কালের জন্য আপনাদিগকে সংসারে, বাহ্য জগৎ উপলব্ধি করিবার ভূমিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনেতিহাস আমরা যত অবগত হইব, ততই বুঝিব—তাঁহার মন পূর্ব্বোক্তশ্রেণীভুক্ত ছিল। তাঁহার লীলাপ্রসঙ্গ আলোচনায় যদি আমাদের ঐরূপ ধারণা উপস্থিত না হয়, তবে বুঝিতে হইবে, উহার জন্য লেখকের ত্রুটিই দায়ী। কারণ, তিনি আমাদিগকে বারম্বার বলিয়া গিয়াছেন, 'ছোট ছোট এক আধটা বাসনা জোর করিয়া রাখিয়া তদবলম্বনে মনটাকে তোদের জন্য নীচে নামাইয়া রাখি!—নতুবা উহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অখণ্ডে মিলিত ও একীভূত হইয়া, অবস্থানের দিকে।'

অসাধারণ সাধকদিগের নির্বিকল্প সমাধিতে অবস্থানের স্বতঃপ্রবৃত্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঐ শ্রেণীভুক্ত সাধক।

সমাধিকালে উপলব্ধ অখণ্ড অদ্বয় বস্তুকে প্রাচীন ঋষিগণের কেহ কেহ—সর্ব্বভাবের অভাব বা 'শূন্য' বলিয়া, আবার কেহ কেহ—সর্ব্বভাবের সম্মিলনভূমি, 'পূর্ণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ফলে কিন্তু সকলে এক কথাই বলিয়াছেন। কারণ, সকলেই উহাকে সর্ব্বভাবের উৎপত্তি এবং লয়ভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবান্ বুদ্ধ যাহাকে সর্ব্বভাবের নির্ব্বাণভূমি, শূন্য বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ভগবান্ শঙ্কর তাহাকেই সর্ব্বভাবের মিলনভূমি, পূর্ণ বস্তু বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। পরবর্ত্তী বৌদ্ধাচার্য্যগণের মতামত ছাড়িয়া দিয়া উভয়ের কথা আলোচনা করিলে ঐরূপ প্রতিপন্ন হয়।

'শূন্য' এবং 'পূর্ণ' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট বস্তু এক পদার্থ।

শূন্য বা পূর্ণ বলিয়া উপলক্ষিত অদ্বৈতভাবভূমিই উপনিষৎ ও বেদান্তে ভাবাতীত অবস্থা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কারণ, উহাতে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধকের মন সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সৃজন, পালন ও নিধনাদি লীলাপ্রসূত সমগ্র ভাবভূমির সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক সমরসমগ্ন হইয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে, সসীম মানবমন আধ্যাত্মিকরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শান্তদাস্যাদি যে পঞ্চভাবাবলম্বনে ঈশ্বরের সহিত নিত্য সম্বন্ধ হয় সে সকল হইতে অদ্বৈতভাব একটি পৃথক অপার্থিব বস্তু। পৃথিবীর মানুষ, ইহপরকালে প্রাপ্ত সকল প্রকার ভোগসুখে এককালে উদাসীন হইয়া পবিত্রতাবলে দেবতাগণাপেক্ষা উচ্চ পদবী লাভ করিলে তবেই ঐভাব উপলব্ধি করে এবং সমগ্র সংসার ও উহার সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা ঈশ্বর যাহাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, উক্ত ভাবসহায়ে সেই নির্গুণ ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষলাভে কৃতকৃতার্থ হয়।

অদ্বৈতভাবের স্বরূপ।

অদ্বৈতভাব এবং উহা দ্বারা উপলব্ধ নির্গুণব্রহ্মের কথা

ছাড়িয়া দিলে আধ্যাত্মিকরাজ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররূপ পঞ্চভাব-প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের প্রত্যেকটিরই সাধ্যবস্তু ঈশ্বর বা সগুণব্রহ্ম। অর্থাৎ সাধক মানব, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাববান্, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের প্রতি ঐসকল ভাবের অন্যতমের আরোপ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হয়, এবং সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বভাবাধার ঈশ্বরও তাহার মনের ঐকান্তিকতা ও একনিষ্ঠা দেখিয়া তাহার ভাবপরি-পুষ্টির জন্য ঐ ভাবানুরূপ তনু ধারণপূর্ব্বক তাহাকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। ঐরূপেই ভিন্ন ভিন্ন যুগে ঈশ্বরের নানা ভাবময় চিদ্‌ঘন মূর্ত্তি ধারণ এবং এমন কি, স্থূল মনুষ্যবিগ্রহে পর্য্যন্ত অবতীর্ণ হইয়া সাধকের অভীষ্টপূর্ণ করণের কথা শাস্ত্রপাঠে অবগত হওয়া যায়।

শান্তাদি ভাবপঞ্চ এবং উহাদিগের সাধ্য বস্তু ঈশ্বর।

সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া মানব, অন্য সকল মানবের সহিত যে সকল ভাব লইয়া নিত্য সম্বন্ধ থাকে, শান্ত দাস্যাদি পঞ্চভাব সেই পার্থিব ভাবসমূহেরই সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ প্রতিকৃতিস্বরূপ। দেখা যায়, সংসারে আমরা পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, সখা, সখী, প্রভু, ভৃত্য, পুত্র, কন্যা, রাজা, প্রজা, গুরু, শিষ্য প্রভৃতির সহিত এক একটা বিশেষ সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া থাকি এবং শত্রু না হইলে ইতরসকলের সহিত শ্রদ্ধাসংযুক্ত শান্ত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করি। ভক্ত্যাচার্য্যগণ ঐ সম্বন্ধসকলকেই শান্তাদি পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন এবং অধিকারিভেদে উহাদিগের অন্যতমকে মুখ্যরূপে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরে আরোপ করিতে উপদেশ করিয়াছেন। কারণ, শান্তাদি পঞ্চভাবের সহিত জীব নিত্য পরিচিত

শান্তাদি ভাবপঞ্চের স্বরূপ। উহারা জীবকে কিরূপে উন্নত করে।

খাকার তদবলম্বনে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে সুগম হইবে। শুধু তাহাই নহে, প্রবৃত্তিমূলক ঐসকল সম্বন্ধাশ্রিত ভাবের প্রেরণায় রাগদ্বেষাদি যে সকল বৃত্তি তাহার মনে উদিত হইয়া তাহাকে সংসারে ইতিপূর্ব্বে নানা কুকর্ম্মে রত করাইতেছিল, ঈশ্বরার্পিত সম্বন্ধাশ্রয়ে সেই সকল বৃত্তি তাহার মনে উত্থিত হইলেও উহাদিগের প্রবল বেগ তাহাকে ঈশ্বরদর্শনরূপ লক্ষ্যাভিমুখেই অগ্রসর করাইয়া দিবে। যথা—সকল দুঃখের কারণস্বরূপ হৃদ্‌রোগ কাম তাহাকে ঈশ্বরদর্শন কামনায় নিযুক্ত রাখিবে, ঐ দর্শনপথের প্রতিকূল বস্তু ও ব্যক্তিসকলের উপরেই তাহার ক্রোধ প্রযুক্ত হইবে, সাধ্যবস্তু ঈশ্বরের অপূর্ব্ব প্রেম-সৌন্দর্য্য সম্ভোগলোভেই সে উন্মত্ত ও মোহিত হইবে এবং ঈশ্বরের পুণ্যদর্শনলাভে কৃতকৃতার্থ ব্যক্তিসকলের অপূর্ব্ব ধর্ম্মশ্রী দেখিয়া তল্লাভের জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিবে।

প্রেমই ভাবসাধনার উপায় এবং ঈশ্বরের সাকার ব্যক্তিত্বই উহার অবলম্বন।

শান্তদাস্যাদি ভাবপঞ্চক ঐরূপে ঈশ্বরে প্রয়োগ করিতে জীব এক সময়ে বা একজনের নিকটে শিক্ষা করে নাই। যুগে যুগে নানা মহাপুরুষ সংসারে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক ঐ সকল ভাবের এক দুই বা ততোধিক অবলম্বনে ঈশ্বরলাভের জন্য নিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রেমে আপনার করিয়া লইয়া তাহাকে ঐরূপ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। ঐ সকল আচার্য্যগণের অলৌকিক জীবনালোচনায় একথার স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, একমাত্র প্রেমই ভাবসাধনার মূলে অবস্থিত এবং ঈশ্বরের উচ্চাবচ কোন প্রকার সাকার ব্যক্তিত্বের উপরেই ঐ প্রেম সর্ব্বদা প্রযুক্ত হইয়াছে। কারণ, দেখা যায়, অদ্বৈতভাবের উপলব্ধি মানব যতদিন না করিতে পারে, ততদিন পর্য্যন্ত সে, ঈশ্বরের কোন না কোন প্রকার সসীম সাকার ব্যক্তিত্বেরই কল্পনা ও উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়।

প্রেমের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিয়া একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উহা প্রেমিকদ্বয়ের ভিতরে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমূলক ভেদোপলব্ধি ক্রমশঃ তিরোহিত করিয়া দেয়। ভাবসাধনায় নিযুক্ত সাধকের মন হইতেও উহা ক্রমে ঈশ্বরের অসীম ঐশ্বর্য্যজ্ঞান তিরোহিত করিয়া তাঁহাকে তাহার ভাবানুরূপ প্রেমাস্পদমাত্র বলিয়া গণনা করিতে সর্ব্বথা নিযুক্ত করে। দেখা যায়, ঐজন্য ঐ পথের সাধক প্রেমে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণভাবে আপনার জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতি নানা আবদার, অনুরোধ, অভিমান, তিরস্কারাদি করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। সাধককে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ভুলাইয়া কেবলমাত্র তাঁহার প্রেম ও মাধুর্য্যের উপলব্ধি করাইতে পূর্ব্বোক্ত ভাবপঞ্চকের মধ্যে যেটি যতদূর সক্ষম সেটি ততদূর উচ্চভাব বলিয়া ঐপথে পরিগণিত হয়। শাস্ত্রাদি ভাবপঞ্চকের উচ্চাবচ তারতম্য নির্ণয় করিয়া মধুরভাবকে সর্ব্বোচ্চ পদবী প্রদান ভক্তাচার্য্যগণ ঐরূপেই করিয়াছেন। নতুবা উহাদিগের প্রত্যেকটিই যে, সাধককে ঈশ্বরলাভ করাইতে সক্ষম, একথা তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

> প্রেমে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের লোপসিদ্ধি—উহাই ভাব সকলের পরিমাপক।

ভাবপঞ্চকের প্রত্যেকটির চরম পরিপুষ্টিতে সাধক যে, আপনাকে বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র তাহার প্রেমাস্পদের সুখে সুখী হইয়া থাকে এবং বিরহকালে তাঁহার চিন্তায় তন্ময় হইয়া সময়ে সময়ে আপনার অস্তিত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত হারাইয়া বসে, একথা আধ্যাত্মিক ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থ পাঠে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রজগোপিকাগণ ঐরূপে আপনাদিগের অস্তিত্বজ্ঞান কেবলমাত্র বিস্মৃত হইতেন না কিন্তু সময়ে সময়ে আপনাদিগকে নিজ প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াও উপলব্ধি করিয়া বসিতেন। জীবের কল্যাণার্থ শরীরত্যাগফলে ঈশাকে যে উৎকট দুঃখভোগ করিতে হইয়াছিল,

তাহার কথা চিন্তা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া কোন কোন সাধক-সাধিকার অনুরূপ অঙ্গসংস্থান হইতে রক্তনির্গমের কথা খৃষ্টানসম্প্রদায়ের ভক্তিগ্রন্থে প্রসিদ্ধ আছে।* অতএব বুঝা যাইতেছে—শান্তাদি ভাবপঞ্চকের প্রত্যেকটির চরম পরিপুষ্টিতে সাধক প্রেমাস্পদের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে তন্ময় হইয়া যায় এবং প্রেমের প্রাবল্যে তাঁহার সহিত মিলিত ও একীভূত হইয়া অদ্বৈত-ভাব উপলব্ধি করিয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলোকসামান্য সাধকজীবন ঐ বিষয়ে আমাদিগকে অদ্ভুত আলোক প্রদান করিয়াছে। ভাবসাধনে অগ্রসর হইয়া তিনি প্রত্যেক ভাবের চরম পরিপুষ্টিতেই প্রেমাস্পদের সহিত প্রেমে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন এবং নিজাস্তিত্ব এককালে বিস্মৃত হইয়া অদ্বৈতভাবের উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

শান্তাদি ভাবের প্রত্যেকের সহায়ে চরমে অদ্বৈতভাব উপলব্ধি বিষয়ে ভক্তি-শাস্ত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের শিক্ষা।

প্রশ্ন হইতে পারে, শান্ত, দাস্যাদি ভাবাবলম্বনে মানবমন কেমন করিয়া সর্ব্বভাবাতীত অদ্বয় বস্তুর উপলব্ধি করিবে? কারণ, অন্ততঃ দুই ব্যক্তির উপলব্ধি ব্যতীত উহাতে কোন প্রকার ভাবের উদয়, স্থিতি ও পরিপুষ্টি কুত্রাপি দেখা যায় না।

সত্য। কিন্তু কোনও ভাব যত পরিপুষ্ট হয়, ততই উহা আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া সাধক মন হইতে অপর সকল বিরোধী ভাবকে ক্রমে তিরোহিত করে। আবার যখন উহার চরম পরিপুষ্টি হয়, তখন সাধকের সমাহিত অন্তঃকরণ, ধ্যানকালে পূর্ব্বপরিদৃষ্ট 'তুমি' (সেব্য), 'আমি' (সেবক) এবং তদুভয়ের মধ্যগত দাস্যাদি সম্বন্ধ, সময়ে সময়ে বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র 'তুমি' শব্দ-নির্দ্দিষ্ট সেব্য বস্তুতে প্রেমে এক হইয়া অচলভাবে অবস্থিতি করিতে থাকে।

---

*Vide Life of St. Francois of Assisi and St Catharine of Sienna.

ভারতের বিশিষ্ট আচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, মানবমন কখনই যুগপৎ 'তুমি,' 'আমি' ও তদুভয়ের মধ্যগত ভাবসম্বন্ধ উপলব্ধি করে না। উহা একক্ষণে 'তুমি'-শব্দনির্দিষ্ট বস্তুর এবং পরক্ষণে 'আমি' শব্দাভিধেয় পদার্থের প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে; এবং ঐ উভয় পদার্থের মধ্যে সর্ব্বদা দ্রুত পরিভ্রমণ করিবার জন্য উহাদিগের মধ্যে একটা ভাবসম্বন্ধ তাহার বুদ্ধিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তখন মনে হয়, যেন উহা উহাদিগকে এবং উহাদিগের মধ্যগত ঐ সম্বন্ধকে যুগপৎ প্রত্যক্ষ করিতেছে। পরিপুষ্ট ভাবের প্রভাবে মনের চঞ্চলতা নষ্ট হইয়া যায় এবং উহা ক্রমে পূর্ব্বোক্ত কথা ধরিতে সক্ষম হয়। ধ্যান-কালে মন ঐরূপে যত বৃত্তিহীন হয় ততই সে ক্রমে বুঝিতে পারে যে, এক অদ্বয় পদার্থকে দুই দিক হইতে দুই ভাবে দেখিয়া 'তুমি' ও 'আমি' রূপ দুই পদার্থের কল্পনা করিয়া আসিয়াছে।

শান্তাদি ভাবপঞ্চকের দ্বারা অদ্বৈতভাব লাভ বিষয়ে আপত্তি ও মীমাংসা।

শান্ত-দাস্যাদি ভাবের প্রত্যেকটি পূর্ণ-পরিপুষ্ট হইয়া মানবমনকে পূর্ব্বোক্তরূপে অদ্বয় বস্তুর উপলব্ধি করাইতে কত সাধকের কতকালব্যাপী চেষ্টার যে প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। শাস্ত্রকার আধ্যাত্মিক ইতিহাস পাঠে বুঝা যায়, এক এক যুগে ঐ সকল ভাবের এক একটী, মানবমনের উপাসনার প্রধান অবলম্বনীয় হইয়াছিল এবং উহা দ্বারাই ঐ যুগের বিশিষ্ট সাধককুল ঈশ্বরের, ও তাঁহাদিগের মধ্যে বিরল কেহ কেহ, অখণ্ড অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুর উপলব্ধি করিয়াছিলেন। দেখা যায়, বৈদিক ও বৌদ্ধযুগে প্রধানতঃ শান্তভাবের, ঔপনিষদিক যুগে শান্তভাবের চরম পরিপুষ্টিতে অদ্বৈতভাবের এবং দাস্য ও ঈশ্বরের পিতৃভাবের, রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে শান্ত ও নিষ্কামকর্ম্মসংযুক্ত দাস্যভাবের, তান্ত্রিক-

ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ভাবসাধনার প্রাবল্যনির্দ্দেশ।

যুগে ঈশ্বরের মাতৃভাব ও মধুরভাবসম্বন্ধের কিয়দংশের এবং বৈষ্ণবযুগে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবের চরম প্রকাশ উপস্থিত হইয়াছিল।

শান্তাদি ভাবপঞ্চের পূর্ণ পরিপুষ্টিবিষয়ে ভারত এবং ভারতেতর দেশে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে ঐরূপে অদ্বৈতভাবের সহিত শান্তাদি পঞ্চভাবের পূর্ণ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যাইলেও, ভারতেতর দেশীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়সকলে কেবলমাত্র শান্ত, দাস্য ও ঈশ্বরের পিতৃভাব সম্বন্ধেরই প্রকাশ দেখা যায়। য়াহুদি, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলে রাজর্ষি সোলে-মানের সখ্য ও মধুরভাবাত্মক গীতাবলী প্রচলিত থাকিলেও, উহারা ঐ সকলের ভাব গ্রহণে অসমর্থ হইয়া ভিন্নার্থ কল্পনা করিয়া থাকে। মুসলমান ধর্ম্মের সুফি সম্প্রদায়ের ভিতর সখ্য ও মধুর ভাবের অনেকটা প্রচলন থাকিলেও, মুসলমান জনসাধারণ ঐরূপে ঈশ্বরোপাসনা কোরাণবিরোধী বলিয়া বিবেচনা করে। আবার ক্যাথলিক খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশামাতা মেরীর প্রতিমাবলম্বনে ও জগন্মাতৃত্বের পূজা প্রকারান্তরে প্রচলিত থাকিলেও, উহা ঈশ্বরের মাতৃভাবের সহিত প্রকাশ্যরূপে সংযুক্ত না থাকায়, ভারতে প্রচলিত জগজ্জননীর পূজার ন্যায় ফলদ হইয়া সাধককে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের উপলব্ধি করাইতে ও রমণীমাত্রে ঈশ্বরীয় বিকাশ প্রত্যক্ষ করাইতে সক্ষম হয় নাই। ক্যাথলিক সম্প্রদায়গত মাতৃভাবের ঐ প্রবাহ ফল্গুনদীর ন্যায় অর্দ্ধপথে অন্তর্হিত হইয়াছে।

সাধকের ভাবের গভীরত্ব যাহা দেখিয়া বুঝা যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কোন প্রকার ভাবসম্বন্ধাবলম্বনে সাধক-মন ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হইলে উহা ক্রমে ঐ ভাবে তন্ময় হইয়া বাহ্য জগৎ হইতে বিমুখ হয় এবং আপনাতে আপনি ডুবিয়া যায়; ঐরূপে মগ্ন হইবার কালে মনের পূর্ব্বসংস্কারসমূহ ঐ পথে বাধাপ্রদান করিয়া, তাহাকে

ভাসাইয়া পুনরায় বহির্ম্মুখ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে। ঐজন্য প্রবল পূর্ব্বসংস্কারবিশিষ্ট সাধারণ মানবমনের একটিমাত্র ভাবে তন্ময় হওয়াও অনেক সময় এক জীবনের চেষ্টাতে হইয়া উঠে না। ঐরূপ স্থলে সে প্রথমে নিরুৎসাহ, পরে হতোদ্যম এবং তৎপরে সাধ্যবস্তুতে বিশ্বাস হারাইয়া, বাহ্যজগতের রূপরসাদি ভোগকেই সার ভাবিয়া বসে ও তল্লাভে পুনরায় ধাবিত হয়। অতএব বাহ্যবিষয়বিমুখতা, প্রেমাস্পদের ধ্যানে তন্ময়ত্ব এবং ভাবপ্রসূত উল্লাসই সাধকের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইবার একমাত্র পরিমাপক বলিয়া ভাবাধিকারে পরিগণিত হইয়াছে।

কোন এক ভাবে তন্ময়ত্বলাভে অগ্রসর হইয়া যিনি কখন অন্তর্নিহিত পূর্ব্বসংস্কারসমূহের প্রবল বাধা উপলব্ধি করেন নাই, সাধকমনের অন্তঃসংগ্রামের কথা তিনি কিছুমাত্র বুঝিতে পারিবেন না। যিনি উহা করিয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন—কত দুঃখে মানবজীবনে ভাবতন্ময়ত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্বল্পকালে একের পর এক করিয়া সকল প্রকার ভাবে অদৃষ্টপূর্ব্ব তন্ময়ত্ব লাভ করিতে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া ভাবিবেন, ঐরূপ হওয়া মনুষ্যশক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে।

ঠাকুরকে সর্ব্বভাবে সিদ্ধিলাভ করিতে দেখিয়া যাহা মনে হয়।

ভাবরাজ্যের সূক্ষ্ম তত্ত্বসকল সাধারণ মানবমন বুঝিতে সক্ষম হয় নাই বলিয়াই কি অবতারপ্রথিত ধর্ম্মবীরদিগের সাধনেতিহাস সম্যক্ লিপিবদ্ধ হয় নাই? কারণ তৎপাঠে দেখা যায়, তাঁহাদিগের সাধনপথে প্রবেশকালে বিষয়বৈরাগ্য ও তত্ত্যাগের কথা এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভের পরে তাঁহাদিগের ভিতর দিয়া বিষয়বিমুগ্ধ মানবমনের কল্যাণের জন্য যে অদ্ভুত শক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল,

ধর্ম্মবীরগণের সাধনেতিহাস লিপিবদ্ধ না থাকা সম্বন্ধে আলোচনা।

সেই কথারই সবিস্তার আলোচনা বিদ্যমান। দেখা যায়, অন্তরের পূর্ব্বসংস্কারসমূহকে বিধ্বস্ত ও সমূলে উৎপাটিত করিয়া আপনার উপর সম্যক্ প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য তাঁহারা সাধনকালে যে অপূর্ব্ব অন্তঃসংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার আভাসমাত্রই কেবল উহাতে আলোচিত হইয়াছে। অথবা রূপক এবং অতিরঞ্জিত বাক্যসহায়ে ঐ সংগ্রামের কথা এমন ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, তদ্বিবরণের মধ্য হইতে সত্য বাহির করিয়া লওয়া আমাদিগের পক্ষে এখন সুকঠিন হইয়াছে। কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদিগের কথা বুঝিতে পারিবেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লোককল্যাণসাধনোদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ শক্তি-লাভের জন্য অনেক সময় তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, একথা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে তিনি কিছুকাল জল বা পবনাহারপূর্ব্বক একপদে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন ইত্যাদি কথা ভিন্ন বিরোধী ভাবসকলের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহার অন্তঃসংগ্রামের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে ঐকথা।

ভগবান্ বুদ্ধের সংসারবৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া অভিনিষ্ক্রমণ ও পরে ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনের যতদূর বিশদেতিহাস পাওয়া যায়, তাঁহার সাধনেতিহাস ততদূর পাওয়া যায় না। তবে অন্যান্য ধর্ম্মবীরগণের ভাবেতিহাসের যেমন কিছুই পাওয়া যায় না, তাঁহার সম্বন্ধে তদ্রূপ না হইয়া ঐ বিষয়ের অল্প স্বল্প কিছু পাওয়া গিয়া থাকে। দেখা যায়—সিদ্ধিলাভে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া আহার সংযম-পূর্ব্বক তিনি দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল একাসনে ধ্যান-তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন এবং অন্তঃপবন নিরোধপূর্ব্বক, 'আস্ফানক' নামক ধ্যানাভ্যাসে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে ঐ কথা।

কিন্তু চিত্তের পূর্ব্বসংস্কারসমূহ বিনষ্ট করিতে তাঁহার মানসিক সংগ্রামের কথা লিপিবদ্ধ করিবার কালে গ্রন্থকার স্থূল বাহ্য ঘটনার ন্যায় 'মারের' সহিত তাঁহার সংগ্রামকাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন।

ভগবান্ ঈশার সাধনেতিহাসের কোন কথাই একপ্রকার লিপিবদ্ধ নাই। তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়সের কয়েকটি ঘটনামাত্র লিপিবদ্ধ করিয়াই গ্রন্থকার, ত্রিংশ বৎসরে জন্ নামক সিদ্ধ সাধুর নিকট হইতে তাঁহার অভিষেক গ্রহণপূর্ব্বক বিজন মেরুপ্রদেশে চল্লিশদিনব্যাপী ধ্যানতপস্যার কথার, এবং ঐ মেরুপ্রদেশে 'শয়তান' কর্ত্তৃক প্রলোভিত হইয়া জয়লাভপূর্ব্বক তথা হইতে প্রত্যাগমন ও লোককল্যাণসাধনে নিযুক্ত হইবার কথার অবতারণা করিয়াছিলেন। উহার পরে তিনি তিন বৎসর মাত্র স্থূল শরীরে অবস্থান করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ হইতে ত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি যে কি ভাবে কালযাপন করিয়াছিলেন, তাহার কোন সংবাদই নাই।

ঈশার সম্বন্ধে ঐ কথা।

ভগবান্ শঙ্করের জীবনে ঘটনাবলীর পারম্পর্য্য অনেকটা পাওয়া যাইলেও তাঁহার অন্তরের ভাবেতিহাস অনেক স্থলে অনুমান করিয়া লইতে হয়।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের সাধনেতিহাসের অনেক কথা লিপিবদ্ধ পাওয়া যাইলেও, তাঁহার কামগন্ধহীন উচ্চ ঈশ্বরপ্রেমের কথা শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রণয়বিহারাদি অবলম্বনে রূপকচ্ছলে বর্ণিত হওয়ায়, মানব-সাধারণে উহা অনেক সময় যথাযথভাবে বুঝিতে পারে না। একথা কিন্তু অবশ্য স্বীকার্য্য যে ধর্ম্মবীর শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার প্রধান প্রধান সাঙ্গোপাঙ্গেরা সখ্য, বাৎসল্য এবং বিশেষতঃ মধুরভাবের আরম্ভ হইতে প্রায় চরম পরিস্ফূর্ত্তি পর্য্যন্ত সাধকমনে

শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে ঐ কথা এবং মধুর ভাবের চরম তত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

যে যে অবস্থা ক্রমশঃ উপস্থিত হইয়া থাকে সে সকল, রূপকের ভাষায় যতদূর বলিতে পারা যায়, ততদূর অতি বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কেবল, ঐ ভাবত্রয়ের প্রত্যেকটির সর্ব্বোচ্চ পরিণতিতে সাধকমন প্রেমাস্পদের সহিত একত্ব অনুভবপূর্ব্বক অদ্বয় বস্তুতে লীন হইয়া থাকে, এই চরম তত্ত্বটি তাঁহারা প্রকাশ করেন নাই—অথবা উহার সামান্য ইঙ্গিত প্রদান করিলেও উহাকে হীনাবস্থা বলিয়া সাধককে উহা হইতে সতর্ক থাকিতে উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলোকসামান্য জীবন এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব সাধনেতিহাস বর্ত্তমান যুগে আমাদিগকে ঐ চরম তত্ত্ব বিশদভাবে শিক্ষা দিয়া জগতের যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যাবতীয় ধর্ম্মভাব যে, সাধকমনকে একই লক্ষ্যে আনয়ন করিয়া থাকে, এ বিষয় সম্যক্ বুঝিতে সক্ষম করিয়াছে। তাঁহার জীবন হইতে শিক্ষিতব্য অন্য সকল কথা গণনায় না আনিলেও তাঁহার কৃপায় কেবলমাত্র পূর্ব্বোক্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়া আমাদিগের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি যে প্রসারতা এবং সমন্বয়াভাস প্রাপ্ত হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকটে চিরকালের জন্য নিঃসংশয়ে ঋণী হইয়াছি।

মধুরভাব ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মধুরভাবই শ্রীচৈতন্যপ্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আধ্যাত্মিক জগতে প্রধান দান। তাঁহারা পথ প্রদর্শন না করিলে, কখনই উহা ঈশ্বরলাভের জন্য এত লোকের অবলম্বনীয় হইয়া তাহাদিগকে শান্তি ও বিমলানন্দের অধিকারী করিত না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জীবনে বৃন্দাবনলীলা যে নিরর্থক অনুষ্ঠিত হয় নাই, একথা তাঁহারাই প্রথমে বুঝিয়া অপরকে বুঝাইতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অভ্যুদয় না হইলে, শ্রীবৃন্দাবন সামান্য বনমাত্র বলিয়া পরিগণিত হইত।

পাশ্চাত্যের অনুকরণে বাহ্য ঘটনাবলীমাত্র লিপিবদ্ধ করিতে যত্নশীল বর্ত্তমান যুগের ঐতিহাসিকগণ বলিবেন, বৃন্দাবনলীলা তোমরা যেরূপ বলিতেছ, সেরূপ বাস্তবিক যে হইয়াছিল, তদ্বিষয়ের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না ; অতএব তোমাদের এতটা হাসি-কান্না, ভাব-মহাভাব সব যে শূন্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ! বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তদুত্তরে বলিতে পারেন, পুরাণদৃষ্টে আমরা যেরূপ বলিতেছি, উহা যে তদ্রূপ হয় নাই, তদ্বিষয়ে তুমিই বা এমন কি নিঃসংশয় প্রমাণ উপস্থিত করিতে পার ? তোমার ইতিহাস সেই বহু প্রাচীন যুগের দ্বার নিঃসংশয় উদ্ঘাটিত করিয়াছে, এ বিষয়ে যত দিন না প্রমাণ পাইব, ততদিন আমরা বলিব, তোমার সন্দেহই শূন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এক কথা, যদিই কখন তুমি ঐরূপ প্রমাণ উপস্থিত করিতে পার, তাহা হইলেও আমাদের বিশ্বাসের এমন কি হানি হইবে ? নিত্যবৃন্দাবনে শ্রীভগবানের নিত্যলীলাকে উহা কিছুমাত্র স্পর্শ করিবে না। ভাবরাজ্যে ঐ রহস্যলীলা চিরকাল সমান সত্য থাকিবে। চিন্ময় ধামে চিন্ময় রাধাশ্যামের ঐরূপ অপূর্ব্ব প্রেমলীলা যদি দেখিতে চাও, তবে প্রথমে কায়মনোবাক্যে কামগন্ধহীন হও এবং শ্রীমতীর সখীদিগের অন্যতমের পদানুগ হইয়া নিঃস্বার্থ সেবা করিতে শিক্ষা কর। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তোমার হৃদয়ে শ্রীহরির লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবন চির-প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং তোমাকে লইয়া ঐরূপ লীলার নিত্য অভিনয় হইতেছে।

বৃন্দাবনলীলার ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে আপত্তি ও মীমাংসা।

ভাবরাজ্যকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়া যিনি বাহ্যঘটনারূপ আলম্বন ভুলিতে এবং শুদ্ধ ভাবেতিহাসের আলোচনা করিতে শিখেন নাই, তিনি শ্রীবৃন্দাবনলীলার সত্যতা ও মাধুর্য্যের উপভোগে কখন সক্ষম হইবেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঐ লীলার কথা সোৎসাহে বলিতে

বলিতে যখন দেখিতেন, উহা তাঁহার সমীপাগত ইংরাজীশিক্ষিত নব্য-যুবকদলের রুচিকর হইতেছে না, তখন বলিতেন, "তোরা ঐ লীলার ভিতর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর মনের টানটাই শুধু দেখ্ না, ধর্ না—ঈশ্বরে মনের ঐরূপ টান হইলে তবে তাঁহাকে পাওয়া যায়। দেখ দেখি, গোপীরা স্বামী পুত্র কুলশীল, মান অপমান, লজ্জা ঘৃণা লোক-ভয়, সমাজ-ভয়—সব ছাড়িয়া শ্রীগোবিন্দের জন্য কতদূর উন্মত্তা হইয়া উঠিয়াছিল।—ঐরূপ করিতে পারিলে, তবে ভগবান লাভ হয়।' আবার বলিতেন,—"কামগন্ধহীন না হইলে মহাভাবময়ী শ্রীরাধার ভাব বুঝা যায় না। সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেই গোপীদের মনে কোটী কোটী রমণসুখের অধিক আনন্দ উপস্থিত হইয়া দেহবুদ্ধির লোপ হইত—তুচ্ছ দেহের রমণ কি আর তখন তাহাদের মনে উদয় হইতে পারে রে! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের দিব্য জ্যোতিঃ তাহাদের শরীরকে স্পর্শ করিয়া প্রতি রোমকূপে যে তাহাদের রমণসুখের অধিক আনন্দ অনুভব করাইত।"

বৃন্দাবনলীলা বুঝিতে হইলে ভাবেতিহাস বুঝিতে হইবে—এ বিষয়ে ঠাকুর যাহা বলিতেন।

স্বামী বিবেকানন্দ এক সময়ে ঠাকুরের নিকট শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার ঐতিহাসিকত্বসম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়া উহার মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুর তাহাতে তাঁহাকে বলেন, "আচ্ছা, ধরিলাম যেন শ্রীমতী রাধিকা বলিয়া কেহ কখন ছিলেন না—কোন প্রেমিক সাধক রাধাচরিত্র কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত চরিত্র কল্পনাকালে ঐ সাধককে শ্রীরাধার ভাবে এককালে তন্ময় হইতে হইয়াছিল, একথা ত মানিস? তাহা হইলে উক্ত সাধকই সে কালে আপনাকে ভুলিয়া রাধা হইয়াছিল, এবং বৃন্দাবনলীলার অভিনয় যে ঐরূপে স্থূলভাবেও হইয়াছিল, একথা প্রমাণিত হয়।"

বাস্তবিক, শ্রীবৃন্দাবনে ভগবানের প্রেমলীলাসম্বন্ধে শত সহস্র আপত্তি উত্থাপিত হইলেও শ্রীচৈতন্যপ্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের দ্বারা প্রথমাবিষ্কৃত এবং তাঁহাদিগের শুদ্ধ পবিত্র জীবনাবলম্বনে প্রকাশিত মধুরভাবসম্বন্ধ চিরকালই সত্য থাকিবে চিরকালই ঐ বিষয়ের অধিকারী সাধক আপনাকে স্ত্রী ভাবিয়া এবং শ্রীভগবানকে নিজ পতিস্বরূপে দেখিয়া, তাঁহার পুণ্যদর্শনলাভে ধন্য হইবে, এবং ঐ ভাবের চরম পরিপুষ্টিতে শুদ্ধাদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শ্রীভগবানে পতিভাবারোপ করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হওয়া স্ত্রীজাতির পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য হইলেও, পুংশরীরধারীদিগের নিকট উহা অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতএব একথা সহজে মনে উদিত হয় যে, ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব এরূপ বিসদৃশ সাধন-পথ কেন লোকে প্রবর্ত্তিত করিলেন? তদুত্তরে বলিতে হয়, যুগাবতারগণের সকল কার্য্য লোককল্যাণের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সাধনপথের প্রবর্ত্তন ঐজন্যই হইয়াছিল। সাধকগণ তৎকালে আধ্যাত্মিক রাজ্যে যেরূপ আদর্শ উপলব্ধি করিবার জন্য বহুকাল হইতে ব্যগ্র হইয়াছিল, তদ্বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহাদিগকে মধুরভাবরূপ পথে অগ্রসর করিতেছিলেন। নতুবা ঈশ্বরাবতার নিত্যমুক্ত শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজ কল্যাণের নিমিত্ত যে, ঐ ভাবসাধনে নিযুক্ত হইয়া উহার পূর্ণাদর্শ জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা নহে।

শ্রীচৈতন্যের পুরুষজাতিকে মধুরভাব-সাধনে প্রবৃত্ত করিবার কারণ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "হাতীর বাহিরের দাঁত যেমন শত্রুকে আক্রমণের জন্য এবং ভিতরের দাঁত খাদ্য চর্ব্বণ করিয়া নিজ শরীর পোষণের জন্য থাকে, তদ্রূপ শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরে ও বাহিরে দুইপ্রকার ভাবের প্রকাশ ছিল। বাহিরের মধুরভাবসহায়ে তিনি

লোক-কল্যাণ সাধন করিতেন এবং অন্তরের অদ্বৈতভাবে প্রেমের চরম পরিপুষ্টিতে ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বয়ং ভূমানন্দ অনুভব করিতেন।”

তৎকালে দেশের আধ্যাত্মিক অবস্থা ও শ্রীচৈতন্য কিরূপে উহার উন্নীত করেন।

পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, বৌদ্ধযুগের অবসানকালে দেশে বজ্রযানরূপ মার্গ এবং ঐ মতের আচার্য্যগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। তাঁহারা প্রচার করিয়াছিলেন—নির্ব্বাণপ্রয়াসী মানবমন বাসনাসমূহের হস্ত হইতে মুক্তপ্রায় হইয়া ধ্যানসহায়ে যখন মহাশূন্যে লীন হইতে অগ্রসর হয়, তখন ‘নিরাত্মা’ নামক দেবী তাহার সম্মুখীন হইয়া তাহাকে ঐরূপ হইতে না দিয়া নিজাঙ্গে সংযুক্ত করিয়া রাখেন, এবং সাধকের স্থূল শরীররূপ ভোগায়তনের উপলব্ধি তখন না থাকিলেও সূক্ষ্মশরীরবিশিষ্ট তাহাকে ইন্দ্রিয়জ সর্ব্ব ভোগসুখের সারসমষ্টি নিত্য উপভোগ করাইয়া থাকেন। স্থূলবিষয়ভোগত্যাগে ভাব-রাজ্যের সূক্ষ্ম নিরবচ্ছিন্ন ভোগসুখপ্রাপ্তিরূপ তাঁহাদিগের প্রচারিত মত, কালে বিকৃত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন স্থূলভোগসুখপ্রাপ্তিকে ধর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য করিয়া তুলিবে এবং দেশে ব্যভিচারের মাত্রা বৃদ্ধি করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণ ঐ সকল বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মমত অবলম্বন করিয়া নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। উচ্চবর্ণদিগের অধিকাংশের মধ্যে তন্ত্রোক্ত বামাচার বিকৃত হইয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার সকাম পূজা ও উপাসনা দ্বারা অসাধারণ বিভূতি ও ভোগসুখলাভরূপ মতের প্রচলন হইয়াছিল। আবার, এই কালের যথার্থ সাধককুল আধ্যাত্মিক রাজ্যে ভাবসহায়ে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভে প্রয়াসী হইয়া পথের সন্ধান পাইতেছিলেন না। ভগবান্ শ্রীচৈতন্য নিজ জীবনে অনুষ্ঠান করিয়া অদ্ভুত ত্যাগ-বৈরাগ্যের আদর্শ ঐ সকল সাধকদিগের সম্মুখে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত

করিলেন। পরে, শুদ্ধ পবিত্র হইয়া আপনাকে প্রকৃতি ভাবিয়া ঈশ্বরকে পতিরূপে ভজনা করিলে জীব যে, সূক্ষ্ম ভাবরাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন দিব্যানন্দলাভে সত্য সত্য সমর্থ হয়, তাহা তাহাদিগকে দেখাইয়া গেলেন, এবং স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন সাধারণ জনগণের নিকটে ঈশ্বরের নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া তাহাদিগকে নাম জপ ও উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে নিযুক্ত করিলেন। ঐরূপে পথভ্রষ্ট লক্ষ্যবিচ্যুত বহুল বিকৃত বৌদ্ধসম্প্রদায় সকল তাঁহার কৃপায় পুনরায় আধ্যাত্মিক পথে উন্নীত হইয়াছিল। বিকৃত বামাচার অনুষ্ঠানকারীর দলসকল প্রথম প্রথম প্রকাশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেও পরে তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব জীবনাদর্শের অদ্ভুত আকর্ষণে ত্যাগশীল হইয়া, নিষ্কামভাবে পূজা করিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার দর্শন লাভ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিতে যাইয়া সেইজন্য কোন কোন গ্রন্থকার স্পষ্ট লিখিয়াছেন, তিনি অবতীর্ণ হইবার কালে শূন্যবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়সকলও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।*

মধুরভাবের স্থূল কথা।

সচ্চিদানন্দ-ঘন পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ—এবং জগতের স্থূল সূক্ষ্ম যাবতীয় পদার্থ ও জীবগণের প্রত্যেকেই তাঁহার মহাভাবময়ী প্রকৃতির অংশসম্ভূত—অতএব, তাঁহার স্ত্রী। সেজন্য শুদ্ধ পবিত্র হইয়া জীব তাঁহাকে পতিরূপে সর্ব্বান্তঃকরণে ভজনা করিলে, তাঁহার কৃপায় তাহার গতি-মুক্তি ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দপ্রাপ্তি হয়—ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-কর্তৃক প্রচারিত মধুরভাবের স্থূল কথা। মহাভাবে সর্ব্বভাবের একত্র সমাবেশ। প্রধানা গোপী শ্রীরাধা সেই মহাভাবস্বরূপিণী এবং অন্য গোপিকাগণের প্রত্যেকে মহাভাবান্তর্গত অন্তর্ভাবসকলের এক দুই বা ততোধিক ভাবস্বরূপিণী। সুতরাং ব্রজগোপিকাগণের

* চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ দেখ।

ভাবানুকরণে সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া সাধক ঐ সকল অন্তর্ভাব নিজায়ত্ত করিতে সমর্থ হয় এবং পরিশেষে মহাভাবোত্থ মহানন্দের আভাস প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়া থাকে। ঐরূপে মহাভাবস্বরূপিণী* শ্রীরাধিকার ভাবানুধ্যানে নিজ সুখবাঞ্ছা এতকালে পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সুখে সুখী হওয়াই এই পথে সাধকের চরম লক্ষ্য।

স্বাধীনা নায়িকার সর্ব্বগ্রাসী প্রেম ঈশ্বরে আরোপ করিতে হইবে।

সামাজিক বিধানে বিবাহিত নায়ক নায়িকার পরস্পরের প্রতি প্রেম—জাতি, কুল, শীল, লোকভয়, সমাজভয় প্রভৃতি নানা বিষয়ের দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। ঐরূপ নায়ক নায়িকা ঐ সকলের সীমার ভিতরে অবস্থানপূর্ব্বক নানা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, পরস্পরের সুখসম্পাদনে যথাসম্ভব ত্যাগস্বীকার করিয়া থাকে। বিবাহিতা নায়িকা সামাজিক কঠোর নিয়মবন্ধনসকল যথাযথ পালন করিতে যাইয়া অনেক সময় নায়কের প্রতি নিজ প্রেমসম্বন্ধ ভুলিতে বা হ্রাস করিতে সঙ্কুচিত হয় না। স্বাধীনা নায়িকার প্রেমের আচরণ কিন্তু অন্যরূপ। প্রেমের প্রাবল্যে ঐরূপ নায়িকা অনেক সময় ঐ সকল নিয়মবন্ধনকে পদদলিত করিতে এবং সমাজপ্রদত্ত নিজ সামাজিক অধিকারের সর্ব্বস্ব ত্যাগপূর্ব্বক নায়কের সহিত সংযুক্তা হইতে কুণ্ঠিত হয় না। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ঐরূপ সর্ব্বগ্রাসী প্রেমসম্বন্ধ ঈশ্বরে আরোপ করিতে সাধককে উপদেশ করিয়াছেন,

* কৃষ্ণস্য সুখে পীড়াশঙ্কয়া নিমিষমপি অসহিষ্ণুতাদিকং যস্মিন স রূঢ়ো মহাভাবঃ। কোটিব্রহ্মাণ্ডগতং সমস্তসুখং যস্য সুখস্য লেশোঽপি ন ভবতি, সমস্তবৃশ্চিকসর্পাদিদংশকৃতদুঃখমপি যস্য দুঃখস্য লেশো ন ভবতি, এবম্ভূতে কৃষ্ণসংযোগবিয়োগয়োঃ সুখদুঃখে যাভ্যাং ভবতঃ সঃ অধিরূঢ়ো মহাভাবঃ। অধিরূঢ়স্যৈব মোহন মাদন ইতি দ্বৌ রূপৌ ভবতঃ; ইত্যাদি—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাবলী।

এবং বৃন্দাবনাধিশ্বরী শ্রীরাধা সেজন্যই আয়ান ঘোষের বিবাহিতা পত্নী হইয়াও, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সর্ব্বস্বত্যাগিনী বলিয়া বর্ণিতা হইয়াছেন।

মধুরভাব অন্য সকল ভাবের সমষ্টি ও অধিক।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ মধুরভাবকে শান্তাদি অন্য চারিপ্রকার ভাবের সারসমষ্টি এবং ততোধিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ, প্রেমিকা নায়িকা ক্রীতদাসীর ন্যায় প্রিয়ের সেবা করেন, সখীর ন্যায় সর্ব্বাবস্থায় তাঁহাকে সুপরামর্শ দানপূর্ব্বক তাঁহার আনন্দে উল্লসিতা ও দুঃখে সমবেদনাযুক্তা হয়েন, মাতার ন্যায় সতত তাঁহার শরীরমনের পোষণে এবং কল্যাণকামনায় নিযুক্তা থাকেন এবং ঐরূপে সর্ব্বপ্রকারে আপনাকে ভুলিয়া প্রিয়তমের কল্যাণসাধন ও চিত্তবিনোদনপূর্ব্বক তাঁহার মন অপূর্ব্ব শান্তিতে আপ্লুত করিয়া থাকেন। যে নায়িকা ঐরূপে প্রেমপ্রভাবে আত্মবিস্মৃতা হইয়া প্রিয়ের কল্যাণ ও সুখের দিকে সর্ব্বতোভাবে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকেন, তাঁহার প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনিই সমর্থা প্রেমিকা বলিয়া ভক্তিগ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। স্বার্থগন্ধদুষ্ট অন্য সকল প্রকার প্রেম সমঞ্জসা ও সাধারণী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সমঞ্জসা শ্রেণীভুক্তা নায়িকা প্রিয়ের সুখের ন্যায় আত্মসুখের দিকেও সমভাবে লক্ষ্য রাখে এবং সাধারণী শ্রেণীভুক্তা নায়িকা কেবলমাত্র আত্মসুখের জন্য নায়ককে প্রিয় জ্ঞান করে।

শ্রীচৈতন্য মধুরভাব সহায়ে বিরূপে লোককল্যাণ করিয়াছিলেন।

বিষয়সুখ বিষবৎ পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবন নিয়মিত করিতে এবং প্রেমে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ার স্থলে দণ্ডায়মান হইতে সাধকগণকে শিক্ষা প্রদান করিয়া ও নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব তৎকালে দেশের ব্যভিচারনিবারণে ও কল্যাণসাধনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ফলে তৎকালে তদীয় ভাব ও উপদেশ পথ-ভ্রষ্টকে পথ দেখাইয়া,

সমাজচ্যুতদিগকে নবীন সমাজবন্ধনে আনিয়া, জাতিবহির্ভূতদিগকে ভগবদ্ভক্তরূপ জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া এবং সর্ব্বসম্প্রদায়ের গোচরে ত্যাগবৈরাগ্যের পবিত্র উচ্চাদর্শ ধারণ করিয়া, অশেষ লোককল্যাণ সাধিত করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে—সাধারণ নায়ক-নায়িকার প্রণয় ও মিলনসম্ভূত 'অষ্ট সাত্ত্বিকবিকার' * নামক মানসিক ও শারীরিক বিকারসমূহ শ্রীশ্রীজগৎস্বামীর তীব্র ধ্যানানুচিন্তনে পবিত্র-চেতা সাধকের সত্যসত্যই উপস্থিত হইয়া থাকে, শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক জীবনসহায়ে একথা নিঃসংশয় প্রমাণিত করিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রচারিত মধুরভাব তৎকালে অলঙ্কারশাস্ত্রকে আধ্যাত্মিক শাস্ত্রসকলের অঙ্গীভূত করিয়াছিল, কুকাব্যসকলকে উচ্চ আধ্যাত্মিক-ভাবে রঞ্জিত করিয়া সাধকমনের উপভোগ্য ও উন্নতিবিধায়ক করিয়াছিল, এবং শান্তভাবানুষ্ঠানে অবশ্য-পরিহর্ত্তব্য কামক্রোধাদি ইতর ভাবসমূহ, শ্রীভগবানকে আপনার করিয়া লইয়া তন্নিমিত্ত এবং তাঁহারই উপর সাধককে প্রয়োগ করিতে শিখাইয়া তাহার সাধনপথ সুগম করিয়া দিয়াছিল।

বেদান্তবিৎ মধুরভাব-সাধনকে যে ভাবে সাধকের কল্যাণকর বলিয়া গ্রহণ করেন।

পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত বর্ত্তমান যুগের নব্য সম্প্রদায়ের চক্ষে মধুর-ভাব, পুংশরীরধারীদিগের পক্ষে অস্বাভাবিক ও বিসদৃশ বলিয়া প্রতীত হইলেও, বেদান্তবাদীর নিকটে উহার সমুচিত মূল্য নির্দ্ধারিত হইতে বিলম্ব হয় না। তিনি দেখেন, ভাবসমূহই বহু-কালাভ্যাসে মানব-মনে দৃঢ়সংস্কাররূপে পরিণত হয় এবং জন্মজন্মাগত ঐরূপ সংস্কারসকলের জন্যই মানব এক

* যে চিত্তং তনুঞ্চ ক্ষোভয়ন্তি তে সাত্ত্বিকাঃ। তে স্তম্ভ স্বেদঃ রোমাঞ্চ-স্বরভেদ-বেপথু-বৈবর্ণ্যাশ্রুপ্রলয়াঃ ইতি। তে ধূমায়িতা জ্বলিতা দীপ্তা উদ্দীপ্তা সুদীপ্তা ইতি পঞ্চবিধা যথোত্তরসুখদাঃ স্যুঃ।—আকরগ্রন্থ।

অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুর স্থলে এই বিচিত্র জগৎ দেখিতে পাইয়া থাকে। ঈশ্বরানুগ্রহে এই মুহূর্ত্তে যদি সে জগৎ নাই বলিয়া ঠিক্ ঠিক্ ভাবনা করিতে পারে, তবে তদ্দণ্ডেই উহা তাহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গণের সম্মুখ হইতে কোথায় অন্তর্হিত হইবে। জগৎ আছে, ভাবে বলিয়াই মানবের নিকট জগৎ বর্ত্তমান। আমি পুরুষ বলিয়া আপনাকে ভাবি বলিয়াই পুরুষভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছি এবং অন্যে স্ত্রী বলিয়া ভাবে বলিয়াই স্ত্রীভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছে। আবার, মানবহৃদয়ে এক ভাব প্রবল হইয়া অপর সকল বিপরীত ভাবকে যে সমাচ্ছন্ন এবং ক্রমে বিনষ্ট করে, ইহাও নিত্য-পরিদৃষ্ট। অতএব ঈশ্বরের প্রতি মধুরভাবসম্বন্ধের আরোপ করিয়া উহার প্রাবল্যে সাধকের নিজ মনের অন্য সকল ভাবকে সমাচ্ছন্ন এবং ক্রমে উৎসাদিত করিবার চেষ্টাকে বেদান্তবিৎ অন্য কণ্টকের সাহায্যে পদবিদ্ধ কণ্টকের অপনয়নের চেষ্টার ন্যায় বিবেচনা করিয়া থাকেন। মানবমনের অন্য সকল সংস্কারের অবলম্বনস্বরূপ 'আমি দেহী' বলিয়া বোধ এবং তদ্দেহসংযোগে 'আমি পুরুষ বা স্ত্রী' বলিয়া সংস্কারই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। শ্রীভগবানে পতিভাবারোপ করিয়া 'আমি স্ত্রী' বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে সাধক-পুরুষ আপনার পুংস্ত্ব ভুলিতে সক্ষম হইবার পরে, 'আমি স্ত্রী' এ ভাবকেও অতি সহজে নিক্ষেপ করিয়া ভাবাতীত অবস্থায় উপনীত হইতে পারিবেন, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব মধুরভাবে সিদ্ধ হইলে সাধক যে ভাবাতীত ভূমির অতি নিকটেই উপস্থিত হইবেন বেদান্তবাদী দার্শনিকের চক্ষে ইহাই সর্ব্বথা প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি রাধাভাব প্রাপ্ত হওয়াই সাধকের চরম লক্ষ্য? উত্তরে বলিতে হয়, বৈষ্ণব গোস্বামিগণ বর্ত্তমানে উহা অস্বীকারপূর্ব্বক সখীভাবপ্রাপ্তিই সাধ্য এবং মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার

ভাবলাভ সাধকের পক্ষে অসাধ্য বলিয়া প্রচার করিলেও, উহাই সাধকের চরম লক্ষ্য বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ, দেখা যায়, সখীদিগের ও শ্রীমতীর ভাবের মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান নাই, কেবলমাত্র পরিমাণ গত পার্থক্যই বর্ত্তমান। দেখা যায়, শ্রীমতীর ন্যায় সখীগণও সচ্চিদানন্দ ঘন শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে ভজনা করিতেন এবং শ্রীরাধার সহিত সম্মিলনে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ দেখিয়া, তাঁহাকে সুখী করিবার জন্যই শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলন সম্পাদনে সর্ব্বদা যত্নবতী। আবার দেখা যায়, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব প্রভৃতি প্রাচীন গোস্বামিপাদগণের প্রত্যেকে মধুরভাব-পরিপুষ্টির জন্য পৃথক পৃথক শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের সেবায় শ্রীবৃন্দাবনে জীবন অতিবাহিত করিলেও, সংসঙ্গে শ্রীরাধিকার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবা করিবার প্রয়াস পান নাই—আপনাদিগকে রাধাস্থানীয় ভাবিতেন বলিয়াই যে, তাঁহারা ঐরূপ করেন নাই, একথাই উহাতে অনুমিত হয়।

শ্রীমতীর ভাব প্রাপ্ত হওয়াই মধুরভাব সাধনের চরম লক্ষ্য।

বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত মধুরভাবের যাঁহারা বিস্তারিত আলোচনা করিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীবাদি প্রাচীন গোস্বামি-পাদগণের গ্রন্থসমূহের এবং শ্রীবিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবি-কুলের পূর্ব্বরাগ, দান, মান ও মাথুর-সম্বন্ধীয় পদাবলীনিচয়ের আলো-চনা করিবেন। মধুরভাব সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুর উহাতে কি অপূর্ব্ব চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে সুগম হইবে বলিয়াই আমরা উহার সারাংশের এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ঠাকুরের মধুরভাব সাধন।

ঠাকুরের একাগ্রমনে যখন যে ভাবের উদয় হইত, তাহাতে তিনি কিছুকালের জন্য তন্ময় হইয়া যাইতেন। ঐ ভাব তখন তাঁহার মনে পূর্ণাধিকার স্থাপনপূর্ব্বক অন্য সকল ভাবের লোপ করিয়া দিত এবং তাঁহার শরীরকে পরিবর্ত্তিত করিয়া উহার প্রকাশানুরূপ যন্ত্র করিয়া তুলিত। বাল্যকাল হইতে তাঁহার ঐরূপ স্বভাবের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, এবং দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন করিবার কালে আমরা ঐ বিষয়ের নিত্য পরিচয় পাইতাম। দেখিতাম, সঙ্গীতাদি শ্রবণে বা অন্য কোন উপায়ে তাঁহার মন ভাববিশেষে মগ্ন হইলে যদি কেহ সহসা অন্য ভাবের সঙ্গীত বা কথা আরম্ভ করিত, তাহা হইলে তিনি বিষম যন্ত্রণা অনুভব করিতেন। এক লক্ষ্যে প্রবাহিত চিত্তবৃত্তিসকলের সহসা গতিরোধ হওয়াতেই যে তাঁহার ঐরূপ কষ্ট উপস্থিত হইত, একথা বলা বাহুল্য। মহামুনি পতঞ্জলি, এক ভাবে তরঙ্গিত চিত্তবৃত্তিযুক্ত মনকে সবিকল্প সমাধিস্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং ভক্তিগ্রন্থসকলে ঐ সমাধি ভাব-সমাধি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, ঠাকুরের মন ঐরূপ সমাধিতে অবস্থান করিতে আজীবন সমর্থ ছিল।

বাল্যকাল হইতে ঠাকুরের মনের ভাব-তন্ময়তার আচরণ।

সাধনায় প্রবর্ত্তিত হইবার কাল হইতে তাঁহার মনের পূর্ব্বোক্ত স্বভাব এক অপূর্ব্ব বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিল। কারণ, দেখা যায়,—ঐকালে তাঁহার মন পূর্ব্বের ন্যায় কোন ভাবে কিছুক্ষণ মাত্র অবস্থান

করিয়াই অন্য ভাববিশেষ অবলম্বন করিতেছে না; কিন্তু কোন এক ভাবে আবিষ্ট হইলে, যতক্ষণ না ঐ ভাবের চরম সীমায় উপনীত হইয়া অদ্বৈতভাবের আভাস পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতেছে, ততক্ষণ উহাকে অবলম্বন করিয়াই সর্ব্বক্ষণ অবস্থান করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, দাস্যভাবের চরম সীমায় উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি মাতৃভাবোপলব্ধি করিতে অগ্রসর হন নাই; আবার মাতৃভাবসাধনার চরমোপলব্ধি না করিয়া বাৎসল্যাদি ভাব সাধনে প্রবৃত্ত হন নাই। তাঁহার সাধনকালের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ঐরূপ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়।

সাধনকালে তাঁহার মনের উক্ত স্বভাবের কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়।

ব্রাহ্মণীর আগমনকালে ঠাকুরের মন ঈশ্বরের মাতৃভাবের অনুধ্যানে পূর্ণ ছিল। জগতের যাবতীয় প্রাণী ও পদার্থে, বিশেষতঃ স্ত্রীমূর্ত্তিসকলে তখন তিনি শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রকাশ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। অতএব ব্রাহ্মণীকে দর্শনমাত্র তিনি কেন মাতৃসম্বোধন করিয়াছিলেন এবং সময় সময় বালকের ন্যায় ক্রোড়ে উপবেশনপূর্ব্বক তাঁহার হস্তে আহার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ স্পষ্ট বুঝা যায়। হৃদয়ের মুখে শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণী এই কালে কখন কখন ব্রজগোপিকাগণের ভাবে আবিষ্টা হইয়া মধুররসাত্মক সঙ্গীত সকল আরম্ভ করিলে, ঠাকুর বলিতেন, ঐ ভাব তাঁহার ভাল লাগে না, এবং ঐ ভাব সম্বরণপূর্ব্বক মাতৃভাবের ভজনসকল গাহিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতেন। ব্রাহ্মণীও উহাতে ঠাকুরের মানসিক অবস্থা যথাযথ বুঝিয়া, তাঁহার প্রীতির জন্য তৎক্ষণাৎ শ্রীশ্রীজগদম্বার দাসীভাবে সঙ্গীত আরম্ভ করিতেন, অথবা ব্রজগোপালের প্রতি নন্দরাণী শ্রীমতী যশোদার হৃদয়ের গভীরোচ্ছ্বাসপূর্ণ সঙ্গীতের অবতারণা করিতেন।

সাধনকালের পূর্ব্বে ঠাকুরের মধুরভাব ভাল লাগিত না।

ঘটনা অবশ্য, ঠাকুরের মধুরভাব সাধনে প্রবৃত্ত হইবার বহু পূর্ব্বের কথা। মনে 'ভাবের ঘরে চুরি' যে তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র কোন কালে ছিল না, একথা উহাতে বুঝিতে পারা যায়।

উহার কয়েক বৎসর পরে ঠাকুরের মন কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া বাৎসল্যভাব সাধনে অগ্রসর হইয়াছিল, সেকথা আমরা পাঠককে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। অতএব মধুরভাব সাধনে অগ্রসর হইয়া তিনি যে সকল অনুষ্ঠানে রত হইয়াছিলেন সেই সকল কথা আমরা এখন বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ঠাকুরের সাধনসকল কখন শাস্ত্রবিরোধী হয় নাই। উহাতে যাহা প্রমাণিত হয়।

ঠাকুরের জীবনালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—আমরা যাহাকে 'নিরক্ষর' বলি, তিনি প্রায় পূর্ণমাত্রায় তদ্রূপ অবস্থাপন্ন হইলেও—কেমন করিয়া আজীবন শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। গুরুগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কেবলমাত্র নিজ হৃদয়ের প্রেরণায় তিনি যে সকল সাধনানুষ্ঠানে রত হইয়াছিলেন, সে সকলও কখনও শাস্ত্রবিরোধী না হইয়া উহার অনুগামী হইয়াছিল। 'ভাবের ঘরে চুরি' না রাখিয়া শুদ্ধ পবিত্র হৃদয়ে ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল হইলে ঐরূপ হইয়া থাকে, একথার পরিচয় উহাতে স্পষ্ট পাওয়া যায়। ঘটনা ঐরূপ হওয়া বিচিত্র নহে; কারণ, শাস্ত্রসমূহ ঐ ভাবেই যে প্রণীত হইয়াছে একথা স্বল্প চিন্তার ফলে বুঝিতে পারা যায়। কারণ, মহাপুরুষদিগের সত্যলাভের চেষ্টা ও উপলব্ধি-সকল লিপিবদ্ধ হইয়া পরে 'শাস্ত্র' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। সে যাহা হউক, নিরক্ষর ঠাকুরের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপলব্ধিসকলের যথাযথ অনুভূতি হওয়ায় শাস্ত্রসমূহের সত্যতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ ঐকথা নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—ঠাকুরের এবার নিরক্ষর হইয়া আগমনের কারণ, শাস্ত্রসকলকে সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্য।

তাঁহার স্বভাবতঃ শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষার দৃষ্টান্ত—সাধনকালে নামভেদ ও বেশ গ্রহণ।

শাস্ত্রমর্য্যাদা স্বভাবতঃ রক্ষা করিবার দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা এখানে বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রেরণায় ঠাকুরের নানা বেশ গ্রহণের কথার উল্লেখ করিতে পারি। উপনিষদ্মুখে ঋষিগণ বলিয়াছেন,—'তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ'*, সিদ্ধ হওয়া যায় না। ঠাকুরের জীবনেও দেখিতে পাওয়া যায়,—তিনি যখন যে ভাবসাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন হৃদয়ের প্রেরণায় প্রথমেই সেই ভাবানুকূল বেশভূষা বা বাহ্য চিহ্নসকল ধারণ করিয়াছিলেন। যথা—তন্ত্রোক্ত মাতৃভাবে সিদ্ধিলাভের জন্য তিনি রক্তাম্বর বিভূতি, সিন্দূর ও রুদ্রাক্ষাদি ধারণ করিয়াছিলেন, বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত ভাবসমূহের সাধনকালে গুরুপরম্পরাপ্রসিদ্ধ ভেক বা উপযুক্ত বেশ গ্রহণ করিয়া শ্বেতবস্ত্র, শ্বেতচন্দন, তুলসী-মাল্যাদিতে নিজাঙ্গ ভূষিত করিয়াছিলেন। বেদান্তোক্ত অদ্বৈতভাবে সিদ্ধ হইবেন বলিয়া শিখাসূত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কাষায় ধারণ করিয়াছিলেন—ইত্যাদি। আবার পুংভাব-সমূহের সাধনকালে তিনি যেমন বিবিধ পুরুষবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ স্ত্রীজনোচিত ভাবসমূহের সাধনকালে রমণীর বেশভূষায় আপনাকে সজ্জিত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। ঠাকুর আমাদিগকে বারংবার শিক্ষা দিয়াছেন, লজ্জা ঘৃণা ভয় এবং জন্মজন্মাগত জাতি-কুল-শীলাদি অষ্টপাশ ত্যাগ না করিলে, কেহ কখন ঈশ্বরলাভ করিতে পারে না। ঐ শিক্ষা তিনি স্বয়ং আজীবন, কায়মনোবাক্যে, কতদূর পালন করিয়াছিলেন, তাহা সাধনকালে তাঁহার বিবিধ বেশধারণাদি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি কার্য্যকলাপের অনুশীলনে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

---

* মুণ্ডকোপনিষদ্, ৩।২।৪—অর্থ—সন্ন্যাসের লিঙ্গ বা চিহ্ন (যথা, গৈরিকাদি) ধারণ না করিয়া কেবলমাত্র তপস্যা দ্বারা আত্মদর্শন হয় না।

মধুরভাব সাধনে প্রবৃত্ত ঠাকুরের স্ত্রীবেশ গ্রহণ।

মধুরভাব সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুর স্ত্রীজনোচিত বেশভূষা ধারণের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং পরমভক্ত মথুরামোহন তাঁহার ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া কখন বহুমূল্য বারাণসী সাড়ী এবং কখন ঘাগ্‌রা, ওড়্‌না কাঁচুলি প্রভৃতির দ্বারা তাঁহাকে সজ্জিত করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। আবার, 'বাবা'র রমণীবেশ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীভক্ত মথুর চাঁচর কেশপাশ (পরচুলা) এবং এক সুট্ স্বর্ণালঙ্কারেও তাঁহাকে ভূষিত করিয়াছিলেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শ্রবণ করিয়াছি, ভক্তিমান্ মথুরের ঐরূপ দান, ঠাকুরের কঠোর ত্যাগে কলঙ্কার্পণ করিতে ছিদ্রচিন্তদিগকে অবসর দিয়াছিল, কিন্তু ঠাকুর ও মথুরামোহন সে সকল কথায় কিছুমাত্র মনোযোগী না হইয়া আপন আপন লক্ষ্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। মথুরামোহন, "বাবা"র পরিতৃপ্তিতে এবং তিনি যে উহা নিরর্থক করিতেছেন না—এই বিশ্বাসে পরম সুখী হইয়াছিলেন; এবং ঠাকুর ঐরূপ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া শ্রীহরির প্রেমৈকলোলুপা ব্রজরমণীর ভাবে ক্রমে এতদূর মগ্ন হইয়াছিলেন যে তাঁহার আপনাতে পুরুষবোধ এককালে অন্তর্হিত হইয়া প্রতি চিন্তা, চেষ্টা ও বাক্য রমণীর ন্যায় হইয়া গিয়াছিল ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি, মধুরভাব সাধনকালে তিনি ছয়মাসকাল রমণীর বেশ ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিয়াছিলেন।

স্ত্রীবেশ গ্রহণে ঠাকুরের প্রত্যেক আচরণ স্ত্রী-জাতির ন্যায় হওয়া।

ঠাকুরের ভিতর স্ত্রী ও পুরুষ—উভয় ভাবের বিচিত্র সমাবেশের কথা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। অতএব স্ত্রীবেশের উদ্দীপনায় তাঁহার মনে যে এখন রমণীভাবের উদয় হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু ঐ ভাবের প্রেরণায় তাঁহার চলন, বলন, হাস্য, কটাক্ষ, অঙ্গভঙ্গী এবং শরীর ও মনের প্রত্যেক চেষ্টা যে, এককালে

ললনা-সুলভ হইয়া উঠিবে, একথা কেহ কখন কল্পনা করিতে পারে নাই। কিন্তু ঐরূপ অসম্ভব ঘটনা যে এখন বাস্তবিক হইয়াছিল, একথা আমরা ঠাকুর এবং হৃদয়—উভয়ের নিকটে বহুবার শ্রবণ করিয়াছি। দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমনকালে আমরা অনেকবার তাঁহাকে রঙ্গচ্ছলে স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় করিতে দেখিয়াছি। তখন উহা এতদূর সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইত যে, রমণীগণও উহা দেখিয়া আশ্চার্য্যবোধ করিতেন।

মথুর বাবুর বাটীতে রমণীগণের সহিত ঠাকুরের সখীভাবে আচরণ।

ঠাকুর এই সময়ে কখন কখন রাণী রাসমণির জানবাজারস্থ বাটীতে যাইয়া শ্রীযুক্ত মথুরামোহনের পুরাঙ্গনাদিগের সহিত বাস করিয়াছিলেন। অন্তঃপুরবাসিনীরা তাঁহার কামগন্ধহীন চরিত্রের সহিত পরিচিত থাকিয়া তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বেই দেবতা-সদৃশ জ্ঞান করিতেন। এখন, তাঁহার স্ত্রীসুলভ আচার-ব্যবহারে এবং অকৃত্রিম স্নেহ ও পরিচর্য্যায় মুগ্ধা হইয়া, তাঁহাকে তাঁহারা আপনাদিগের অন্যতম বলিয়া এতদূর নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে লজ্জাসঙ্কোচাদি ভাব রক্ষা করিতে সমর্থা হয়েন নাই।* ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, শ্রীযুক্ত মথুরের কন্যাগণের মধ্যে কাহারও স্বামী ঐকালে জানবাজার ভবনে উপস্থিত হইলে, তিনি ঐ কন্যার কেশবিন্যাস ও বেশভূষাদি নিজ হস্তে সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং স্বামীর চিত্তরঞ্জনের নানা উপায় তাহাকে শিক্ষাপ্রদানপূর্ব্বক সখীর ন্যায় তাহার হস্তধারণ করিয়া লইয়া যাইয়া স্বামীর পার্শ্বে দিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, 'তাহারা তখন আমাকে তাহাদিগের সখী বলিয়া বোধ করিয়া কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইত না!'

হৃদয় বলিত,—ঐরূপে রমণীগণপরিবৃত হইয়া থাকিবার কালে

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৭ম অধ্যায়।

ঠাকুরকে সহসা চিনিয়া লওয়া তাঁহার নিত্যপরিচিত আত্মীয়দিগের পক্ষেও দুরূহ হইত। মথুর বাবু ঐকালে একসময়ে আমাকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'বল দেখি, উহাদিগের মধ্যে তোমার মামা কোন্‌টি?' এতকাল একসঙ্গে বাস ও নিত্য সেবাদি করিয়াও তখন আমি তাঁহাকে সহসা চিনিতে পারি নাই। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে মামা তখন প্রতিদিন প্রত্যূষে সাজি হস্তে লইয়া বাগানে পুষ্পচয়ন করিতেন—আমরা ঐ সময়ে বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি, চলিবার সময় রমণীর ন্যায় তাঁহার 'বামপদ প্রতিবার স্বতঃ অগ্রসর হইতেছে। ব্রাহ্মণী বলিতেন,—তাঁহার ঐরূপে পুষ্পচয়ন করিবার কালে তাঁহাকে (ঠাকুরকে) দেখিয়া আমার সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ শ্রীমতী রাধারাণী বলিয়া ভ্রম হইয়াছে।' পুষ্পচয়ন-পূর্ব্বক বিচিত্র মালা গাঁথিয়া তিনি এই কালে প্রতিদিন শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দজীউকে সজ্জিত করিতেন এবং কখন কখন শ্রীশ্রীজগদম্বাকে ঐরূপে সাজাইয়া ৺কাত্যায়নীর নিকটে ব্রজগোপিকাগণের ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণকে স্বামিরূপে পাইবার নিমিত্ত সকরুণ প্রার্থনা করিতেন।"

রমণীবেশ গ্রহণে ঠাকুরকে পুরুষ বলিয়া চেনা দুঃসাধ্য হইত।

ঐরূপে শ্রীশ্রীজগদম্বার সেবা-পূজাদি সম্পাদনপূর্ব্বক, শ্রীকৃষ্ণদর্শন ও তাঁহাকে স্বীয় বল্লভরূপে প্রাপ্ত হইবার মানসে ঠাকুর এখন অনন্যচিত্তে শ্রীশ্রীযুগল পাদপদ্মসেবায় রত হইয়া-ছিলেন এবং সাগ্রহ প্রার্থনা ও প্রতীক্ষার দিনের পর দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। দিবা কিম্বা রাত্রি—কোনকালেই তাঁহার হৃদয়ে সে আকুল প্রার্থনার বিরাম হইত না এবং দিন, পক্ষ মাসান্তেও অবিশ্বাসপ্রসূত নৈরাশ্য আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে সে প্রতীক্ষা হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিত না। ক্রমে ঐ প্রার্থনা আকুল ক্রন্দনে এবং ঐ প্রতীক্ষা উন্মত্তের

মধুরভাব সাধনে নিযুক্ত ঠাকুরের আচরণ ও শারীরিক বিকারসমূহ।

ন্যায় উৎকণ্ঠা ও চঞ্চলতায় পরিণত হইয়া তাঁহার আহারনিদ্রাদির লোপসাধন করিয়াছিল। আর, বিরহ?—নিতান্ত প্রিয়জনের সহিত সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সম্মিলিত হইবার অসীম লালসা নানা বিঘ্ন বাধায় প্রতিরুদ্ধ হইলে মানবের হৃদয়-মন-মথনকরী শরীরেন্দ্রিয়-বিকলকরী যে অবস্থা আনয়ন করে, সেই বিরহ? উহা, তাঁহাতে অশেষ যন্ত্রণার নিদান মানসিক বিকাররূপে কেবলমাত্র প্রকাশিত হইয়াই উপশান্ত হয় নাই, কিন্তু সাধনকালের পূর্ব্বাবস্থায় অনুভূত নিদারুণ শারীরিক উত্তাপ ও জ্বালারূপে পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছিল। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি,—শ্রীকৃষ্ণবিরহের প্রবল প্রভাবে এইকালে তাঁহার শরীরের লোমকূপ দিয়া সময়ে সময়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত নির্গমন হইত, দেহের গ্রন্থিসকল ভগ্নপ্রায় শিথিল লক্ষিত হইত এবং হৃদয়ের অসীম যন্ত্রণায় ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্য হইতে এককালে বিরত হওয়ায় দেহ কখন কখন মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিত।

ঠাকুরের অতীন্দ্রিয় প্রেমের সহিত আমাদের ঐ বিষয়ক ধারণার তুলনা।

দেহের সহিত নিত্যসম্বদ্ধ মানব আমরা, প্রেম বলিতে এক দেহের প্রতি অন্য দেহের আকর্ষণই বুঝিয়া থাকি। অথবা বহু চেষ্টার ফলে স্থূল দেহবুদ্ধি হইতে কিঞ্চিন্মাত্র ঊর্দ্ধে উঠিয়া যদি উহাকে দেহ-বিশেষাশ্রয়ে প্রকাশিত গুণসমষ্টির প্রতি আকর্ষণ বলিয়া অনুভব করি, তবে 'অতীন্দ্রিয় প্রেম' বলিয়া উহার আখ্যা প্রদানপূর্ব্বক উহার কত যশোগান করি। কিন্তু কবিকুলবন্দিত আমাদিগের ঐ অতীন্দ্রিয় প্রেম যে স্থূল দেহবুদ্ধি এবং সূক্ষ্ম ভোগলালসাপরিশূন্য নহে, একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ঠাকুরের জীবনে প্রকাশিত যথার্থ অতীন্দ্রিয় প্রেমের তুলনায় উহা কি তুচ্ছ, হেয় এবং অন্তঃসারশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়!

ভক্তিগ্রন্থসকলে লিখিত আছে, ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণীই কেবলমাত্র যথার্থ অতীন্দ্রিয় প্রেমের পরাকাষ্ঠা জীবনে প্রত্যক্ষপূর্ব্বক উহার পূর্ণাদর্শ জগতে রাখিয়া গিয়াছেন। লজ্জা ঘৃণা ভয় ছাড়িয়া, লোকভয় সমাজভয় পরিত্যাগ করিয়া, জাতি কুল শীল পদমর্য্যাদা এবং নিজ দেহ মনের ভোগসুখের কথা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সুখেই কেবলমাত্র আপনাকে সুখী অনুভব করিতে তাঁহার ন্যায় দ্বিতীয় দৃষ্টান্তস্থল ভক্তিশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। শাস্ত্র সেজন্য বলেন, শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপাকটাক্ষ ভিন্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ জগতে কখন সম্ভবপর নহে। কারণ, সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতীর প্রেমে চিরকাল সর্ব্বতোভাবে আবদ্ধ থাকিয়া তাঁহারই ইঙ্গিতে ভক্তসকলের মনোভিলাষ পূর্ণ করিতেছেন। শ্রীমতীর কামগন্ধহীন প্রেমের অনুরূপ বা তজ্জাতীয় প্রেমলাভ না হইলে, কেহ কখন ঈশ্বরকে পতিভাবে লাভ করিতে এবং মধুরভাবের পূর্ণ মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবে না, ভক্তিশাস্ত্রের পূর্ব্বোক্ত কথার ইহাই অভিপ্রায়, একথা বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীমতীর অতীন্দ্রিয় প্রেম সম্বন্ধে ভক্তিশাস্ত্রের কথা।

ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমের দিব্য মহিমা, মায়ারহিতবিগ্রহ পরমহংসাগ্রণী শ্রীশুকদেবপ্রমুখ আত্মারাম মুনিসকলের দ্বারা বহুশঃ গীত হইলেও, ভারতের জনসাধারণ, উহা কিরূপে জীবনে উপলব্ধি করিতে হইবে তাহা বহুকাল পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে নাই। গৌড়ীয় গোস্বামিপাদগণ বলেন, উহা বুঝাইবার জন্য শ্রীভগবানকে শ্রীমতীর সহিত মিলিত হইয়া একাধারে বা একশরীরাবলম্বনে পুনরায় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌররূপে প্রকাশিত শ্রীগৌরাঙ্গদেবই মধুরভাবের প্রেমাদর্শ

শ্রীমতীর অতীন্দ্রিয় প্রেমের কথা বুঝাইবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আগমন।

প্রতিষ্ঠা করিতে আবির্ভূত শ্রীভগবানের ঐ অপূর্ব্ব বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে রাধারাণীর শরীরমনে যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইত, পুংশরীরধারী হইলেও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেই সমস্ত লক্ষণ ঈশ্বরপ্রেমের প্রাবল্যে আবির্ভূত হইতে দেখিয়াই গোস্বামিগণ তাঁহাকে শ্রীমতী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে অতীন্দ্রিয় প্রেমাদর্শের দ্বিতীয় দৃষ্টান্তস্থল, একথা বুঝা যায়।

ঠাকুরের শ্রীমতী রাধিকার উপাসনা ও দর্শনলাভ।

শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপা ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণদর্শন অসম্ভব জানিয়া, ঠাকুর এখন তদ্গতচিত্তে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রেমঘনমূর্ত্তির স্মরণ মনন ও ধ্যানে নিরন্তর মগ্ন হইয়া, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে হৃদয়ের আকুল আবেগ অবিরাম নিবেদন করিয়াছিলেন। ফলে, অচিরেই তিনি শ্রীমতী রাধারাণীর দর্শন লাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। অন্যান্য দেবদেবীসকলের দর্শনকালে ঠাকুর ইতিপূর্ব্বে যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এই দর্শনকালেও সেইরূপে ঐ মূর্ত্তি নিজাঙ্গে সম্মিলিত হইয়া গেল, এইরূপ অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সর্ব্বস্ব-হারা সেই নিরুপম পবিত্রোজ্জ্বল মূর্ত্তির মহিমা ও মাধুর্য্য বর্ণনা করা অসম্ভব। শ্রীমতীর অঙ্গকান্তি নাগকেশরপুষ্পের কেশরসকলের ন্যায় গৌরবর্ণ দেখিয়াছিলাম।"

ঠাকুরের আপনাকে শ্রীমতী বলিয়া অনুভব ও তাহার কারণ।

উক্ত দর্শনের পর হইতে ঠাকুর কিছুকালের জন্য আপনাকে শ্রীমতী বলিয়া নিরন্তর উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীমতী রাধারাণীর শ্রীমূর্ত্তি ও চরিত্রের গভীর অনুধ্যানে আপন পৃথগস্তিত্ব বোধ এককালে হারাইয়াই তাঁহার ঐরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং একথা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় যে, তাঁহার মধুরভাবোত্থ

ঈশ্বরপ্রেম এখন পরিবর্দ্ধিত হইয়া শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমানুরূপ সুগভীর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফলেও ঐরূপ দেখা গিয়াছিল। কারণ, পূর্ব্বোক্ত দর্শনের পর হইতে শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের ন্যায় তাঁহাতেও মধুরভাবের পরাকাষ্ঠাপ্রসূত মহাভাবের সর্ব্বপ্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল। গোস্বামিপাদগণের গ্রন্থে মহাভাবে প্রকাশিত শারীরিক লক্ষণসকলের কথা লিপিবদ্ধ আছে। বৈষ্ণবতন্ত্রনিপুণা ভৈরবী ব্রাহ্মণী এবং পরে বৈষ্ণবচরণাদি শাস্ত্রজ্ঞ সাধকেরা ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে মহাভাবের প্রেরণায় ঐ সকল লক্ষণের আবির্ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও পূজা অর্পণ করিয়াছিলেন। মহাভাবের উল্লেখ করিয়া ঠাকুর আমাদিগকে বহুবার বলিয়াছিলেন,—উনিশ প্রকারের ভাব একাধারে প্রকাশিত হইলে, তাহাকে মহাভাব বলে—একথা ভক্তিশাস্ত্রে আছে। সাধন করিয়া এক একটা ভাবে সিদ্ধ হইতেই লোকের জীবন কাটিয়া যায়। (নিজ শরীর দেখাইয়া) এখানে একাধারে একত্র ঐ প্রকার উনিশটী ভাবের পূর্ণ প্রকাশ।"*

---

* শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ রাগাত্মিকা ভক্তির নিম্নলিখিত বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—
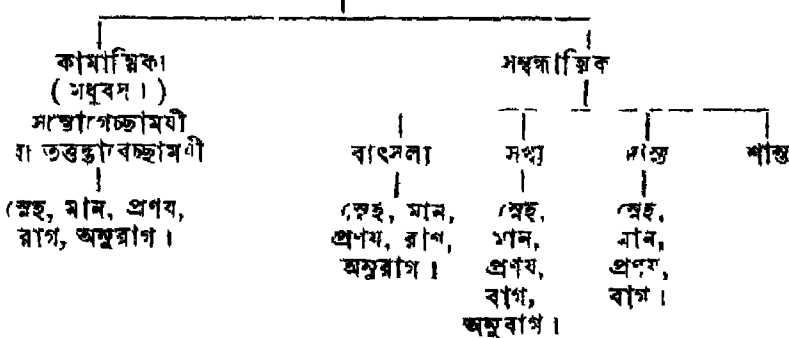
মহাভাব কামাত্মিকা এবং সম্বন্ধাত্মিকা উভয় প্রকার ভক্তির পূর্ব্বোল্লিখিত উনবিংশ প্রকার অন্তর্ভাবের একত্র সমাবেশ হয়। ঠাকুর এখানে উহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রকৃতিভাবে ঠাকুরের শরীরের অদ্ভুত পরিবর্তন।

শ্রীকৃষ্ণবিরহের দারুণ যন্ত্রণায় ঠাকুরের শরীরের প্রতি লোমকূপ হইতে রক্তনির্গমনের কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি—উহা মহাভাবের পরাকাষ্ঠায় এই কালেই সংঘটিত হইয়াছিল। প্রকৃতি ভাবিতে ভাবিতে তিনি এইকালে এতদূর তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, স্বপ্নে বা ভ্রমেও কখন আপনাকে পুরুষ বলিয়া ভাবিতে পারিতেন না এবং স্ত্রীশরীরের ন্যায় কার্যকলাপে তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয় স্বতঃই প্রবৃত্ত হইত। আমরা তাঁহার নিজমুখে শ্রবণ করিয়াছি,—স্বাধিষ্ঠানচক্রের অবস্থান-প্রদেশের রোমকূপসকল হইতে তাঁহার এইকালে প্রতিমাসে নিয়মিত সময়ে বিন্দু বিন্দু শোণিত-নির্গমন হইত এবং স্ত্রীশরীরের ন্যায় প্রতিবারই উপর্যুপরি দিবসত্রয় ঐরূপ হইত। তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়নাথ আমাদিগকে বলিয়াছিলেন,—তিনি উহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন এবং পরিহিত বস্ত্র দুষ্ট হইবার আশঙ্কায় ঠাকুরকে উহার জন্য এইকালে কৌপীন ব্যবহার করিতেও দেখিয়াছেন।

মানসিক ভাবের প্রাবল্য তাঁহার শারীরিক ঐরূপ পরিবর্তন দেখিয়া বুঝা যায়, 'মন সৃষ্টি করে এ শরীর।'

বেদান্তশাস্ত্রের শিক্ষা—মানবের মন তাহার শরীরকে বর্তমান আকারে পরিণত করিয়াছে—'মন সৃষ্টি করে এ শরীর'—এবং তীব্র ইচ্ছা বা বাসনা-সহায়ে তাহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত উহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতনভাবে গঠিত করিতেছে। শরীরের উপর মনের ঐরূপ প্রভুত্বের কথা শুনিলে, আমরা বুঝিতে ও ধারণা করিতে সমর্থ হই না। কারণ, যেরূপ তীব্র বাসনা উপস্থিত হইলে মন অন্য সকল বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিষয়-বিশেষে কেন্দ্রীভূত হয় ও অপূর্ব শক্তি প্রকাশ করে, সেইরূপ তীব্র বাসনা আমরা কোন বিষয় লাভ করিবার জন্যই অনুভব করি না।

বিষয়বিশেষ উপলব্ধি করিবার তীব্র বাসনায় ঠাকুরের শরীর স্বল্পকালে, ঐরূপে পরিবর্তিত হওয়ায়, বেদান্তের পূর্ব্বোক্ত কথা সবিশেষ প্রমাণিত হইতেছে, একথা বলা বাহুল্য। পদ্মলোচনাদি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরা ঠাকুরের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকল শ্রবণপূর্ব্বক বেদপুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের সিদ্ধ ঋষিকুলের উপলব্ধিসকলের সহিত মিলাইতে যাইয়া বলিয়াছিলেন, "আপনার উপলব্ধিসকল বেদপুরাণকে অতিক্রম করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে।" মানসিক ভাবের প্রাবল্যে ঠাকুরের শারীরিক পরিবর্ত্তনসকলের অনুশীলনে তদ্রূপ স্তম্ভিত হইয়া বলিতে হয়,—তাঁহার শারীরিক বিকারসমূহ শারীরিক জ্ঞান-রাজ্যের সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক উহাতে অপূর্ব্ব যুগান্তর উপস্থিত করিবার সূচনা করিয়াছে।

সে যাহা হউক, ঠাকুরের পতিভাবে ঈশ্বরপ্রেম এখন পরিশুদ্ধ ও ঘনীভূত হওয়াতেই, তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপা অনুভব করিয়াছিলেন এবং ঐ প্রেমের প্রভাবে স্বল্পকাল পরেই সচ্চিদানন্দ-ঘনবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। দৃষ্ট মূর্ত্তি অন্য সকলের ন্যায় তাঁহার শ্রীঅঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। ঐ দর্শন লাভের দুই তিন মাস পরে পরমহংস শ্রীমৎ তোতাপুরী আসিয়া তাঁহাকে বেদান্তপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতভাব সাধনায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অতএব বুঝা যাইতেছে,—মধুরভাব সাধনায় সিদ্ধ হইয়া ঠাকুর কিছুকাল ঐ ভাবসহায়ে ঈশ্বরসম্ভোগে কালযাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি,—ঐকালে শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় এককালে তন্ময় হইয়া তিনি নিজ পৃথক অস্তিত্ববোধ হারাইয়া কখন আপনাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন, আবার কখন বা আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সকলকে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ বলিয়া দর্শন

ঠাকুরের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ।

করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে তাহার নিকটে যখন আমরা গমনাগমন করিতেছি তখন তিনি একদিন বাগান হইতে একটি ঘাসফুল সংগ্রহ করিয়া হর্ষোৎফুল্লবদনে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"তখন তখন (মধুরভাব-সাধনকালে) যে কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিতাম, তাঁহার অঙ্গের এই রকম রং ছিল।"

অন্তরস্থ প্রকৃতিভাবের প্রেরণায় যৌবনের প্রারম্ভে ঠাকুরের মনে এক প্রকার বাসনার উদয় হইত। ব্রজগোপীগণ স্ত্রীশরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া প্রেমে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন জানিয়া ঠাকুরের মনে হইত, তিনি যদি স্ত্রীশরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে গোপিকাদিগের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা ও লাভ করিয়া ধন্য হইতেন। ঐরূপে নিজ পুরুষশরীরকে শ্রীকৃষ্ণলাভের পথের অন্তরায় বলিয়া বিবেচনা করিয়া, তিনি তখন কল্পনা করিতেন যে, যদি আবার ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে ব্রাহ্মণের ঘরের পরমাসুন্দরী দীর্ঘকেশা বাল-বিধবা হইবেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও পতি বলিয়া জানিবেন না। মোটা ভাত কাপড়ের মত কিছু সংস্থান থাকিবে, কুঁড়ে ঘরের পার্শ্বে দুই এক কাঠা জমী থাকিবে—যাহাতে নিজ হস্তে দুই পাঁচ প্রকার শাকসবজী উৎপন্ন করিতে পারিবেন, এবং তৎসঙ্গে একজন বৃদ্ধা অভিভাবিকা, একটী গাভী—যাহাকে তিনি স্বহস্তে দোহন করিতে পারিবেন এবং একখানি সূতা কাটিবার চরকা থাকিবে। বালকের কল্পনা আরও অধিক অগ্রসর হইয়া ভাবিত, দিনের বেলা গৃহকর্ম্ম সমাপন করিয়া ঐ চরকায় সূতা কাটিতে কাটিতে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত করিবে এবং সন্ধ্যার পর ঐ গাভীর দুগ্ধে প্রস্তুত মোদকাদি গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্বহস্তে খাওয়াইবার নিমিত্ত গোপনে ব্যাকুল ক্রন্দন করিতে থাকিবে।

যৌবনের প্রারম্ভে ঠাকুরের মনে প্রকৃতি হইবার বাসনা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও উহাতে প্রসন্ন হইয়া গোপবালকবেশে সহসা আগমন করিয়া ঐ সকল গ্রহণ করিবেন এবং অপরের অগোচরে ঐরূপে তাঁহার নিকটে নিত্য গমনাগমন করিতে থাকিবেন। ঠাকুরের মনের ঐ বাসনা ঐ ভাবে পূর্ণ না হইলেও, মধুর ভাব সাধনকালে পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে সিদ্ধ হইয়াছিল।

'ভাগবত, ভক্ত, ভগবান—তিন এক, এক তিন' রূপ দর্শন।

মধুরভাবে অবস্থানকালে ঠাকুরের আর একটী দর্শনের কথা এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা বর্ত্তমান বিষয়ের উপসংহার করিব। ঐকালে বিষ্ণুমন্দিরের সম্মুখস্থ দালানে বসিয়া তিনি একদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শুনিতেছিলেন। শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির সন্দর্শন লাভ করিলেন। পরে দেখিতে পাইলেন, ঐ মূর্ত্তির পাদপদ্ম হইতে দড়ার মত একটা জ্যোতি বহির্গত হইয়া প্রথমে ভাগবত গ্রন্থকে স্পর্শ করিল এবং পরে তাঁহার নিজ বক্ষঃস্থলে সংলগ্ন হইয়া ঐ তিন বস্তুকে একত্র কিছুকাল সংযুক্ত করিয়া রাখিল।

ঠাকুর বলিতেন,—ঐরূপ দর্শন করিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান্ তিন প্রকার ভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও এক পদার্থ বা এক পদার্থের প্রকাশসম্ভূত। "ভাগবত (শাস্ত্র) ভক্ত ও ভগবান্, তিন এক, এক তিন।"

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ঠাকুরের বেদান্তসাধন।

মধুরভাবসাধনে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুর এখন ভাবসাধনের চরম ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। অতএব তাঁহার অপূর্ব্ব সাধনকথা অতঃপর লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে, তাঁহার এই কালের মানসিক অবস্থার কথা একবার আলোচনা করা ভাল।

আমরা দেখিয়াছি, কোনরূপ ভাবসাধনে সিদ্ধ হইতে হইলে, সাধককে সংসারের রূপরসাদি ভোগ্যবিষয়সমূহকে দূরে পরিহার করিয়া উহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সিদ্ধ ভক্ত তুলসীদাস যে বলিয়াছেন—যাঁহা রাম তাঁহা কাম * নেহি ;— একথা বাস্তবিকই সত্য। ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব সাধনেতিহাস ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ লক্ষ্য প্রদান করে। কামকাঞ্চনত্যাগরূপ ভিত্তির উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি ভাবসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ঐ ভিত্তি কখনও তিলমাত্র পরিত্যাগ করেন নাই বলিয়া, তিনি যখন যে ভাবসাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, অতি স্বল্পকালেই তাহা নিজ জীবনে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব কামকাঞ্চনের প্রলোভন-

ঠাকুরের এই কালের মানসিক অবস্থার আলোচনা— (১) কাম-কাঞ্চনত্যাগে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠা।

---

* সকাম ধর্ম্ম।

যাঁহা রাম তাঁহা কাম নেহি,
যাঁহা কাম তাঁহা নেহি রাম।
দুহুঁ একসাথ মিলত নেহি,
রবি রজনী এক ঠাম॥
তুলসীদাস-কৃত দোঁহা।

ভূমির সীমা বহুদূর পশ্চাতে রাখিয়া তাঁহার মন যে এখন নিরন্তর অবস্থান করিত, একথা স্পষ্ট বুঝা যায়।

(২) নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক ও ইহামুত্রফল-ভোগবিরাগ।

বিষয়কামনা ত্যাগপূর্ব্বক নয় বৎসর নিরন্তর ঈশ্বরলাভে সচেষ্ট থাকায় অভ্যাসযোগে তাঁহার মন এখন এমন এক অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল যে, ঈশ্বর ভিন্ন অপর কোন বিষয়ের স্মরণ মনন করা উহার নিকট বিষবৎ বলিয়া প্রতীত হইত। কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরকেই সারাৎসার পরাৎপর বস্তু বলিয়া সর্ব্বতোভাবে ধারণা করায় উহা ইহকালে বা পরকালে তদতিরিক্ত অপর কোন বস্তুলাভে এককালে উদাসীন ও স্পৃহাশূন্য হইয়াছিল।

(৩) শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি ও মুমুক্ষুতা।

রূপরসাদি বাহ্য বিষয়সকল এবং শরীরের সুখদুঃখাদি বিস্মৃত হইয়া অভীষ্ট বিষয়ের একাগ্র ধ্যানে তাঁহার মন এখন এতদূর অভ্যস্ত হইয়াছিল যে, সামান্য আয়াসেই উহা সম্পূর্ণরূপে সমাহিত হইয়া, লক্ষ্য বিষয়ে তন্ময় হইয়া আনন্দানুভব করিত। দিন, মাস এবং বৎসর একে একে অতিক্রান্ত হইলেও উহার ঐ আনন্দের কিছু মাত্র বিরাম হইত না এবং ঈশ্বর ভিন্ন জগতে অপর কোন লব্ধব্য বস্তু আছে বা থাকিতে পারে, এ চিন্তার উদয় উহাতে ক্ষণেকের জন্যও উপস্থিত হইত না।

(৪) ঈশ্বরনির্ভরতা ও দর্শনজন্য ভয়শূন্যতা।

পরিশেষে ঠাকুরের মনে জগৎকারণের প্রতি, 'গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ' বলিয়া একান্ত অনুরাগ বিশ্বাস ও নির্ভরতার এখন সীমা ছিল না। উহাদিগের সহায়ে তিনি যে এখন আপনাকে তাঁহার সহিত সপ্রেম সম্বন্ধে কেবলমাত্র নিত্যযুক্ত দেখিতেন, তাহা নহে—কিন্তু মাতার প্রতি বালকের ন্যায় ঈশ্বরের প্রতি একান্ত অনুরাগে সাধক যে তাঁহাকে সর্ব্বদা নিজ সকাশে দেখিতে পায়,

তাঁহার মধুর বাণী সর্ব্বদা কর্ণগোচর করিয়া কৃতকৃতার্থ হয় এবং তাঁহার প্রবল হস্ত দ্বারা রক্ষিত হইয়া সংসারপথে সতত নির্ভয়ে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়—একথার বহুশঃ প্রমাণ পাইয়া তাঁহার মন জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্য শ্রীশ্রীজগদম্বার আদেশে ও ইঙ্গিতে নির্ভয়ে অনুষ্ঠান করিতে এখন সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত হইয়াছিল।

ঈশ্বর-দর্শনের পরেও ঠাকুর কেন সাধন করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে তাঁহার কথা।

প্রশ্ন উঠিতে পারে,—জগৎকারণকে ঐরূপে স্নেহময়ী মাতার ন্যায় সর্ব্বদা নিজ সমীপে পাইয়া ঠাকুর আবার সাধনপথে নিযুক্ত হইয়াছিলেন কেন? যাহাকে লাভ করিবার জন্য সাধকের যোগ-তপস্যাদি সাধনের অনুষ্ঠান, তাঁহাকেই যদি পরম আত্মীয়রূপে প্রাপ্ত হইলাম, তবে আবার সাধন কিসের জন্য? ঐ কথার উত্তর আমরা পূর্ব্বে একভাবে করিয়া আসিলেও তৎসম্বন্ধে অন্য একভাবে এখন দুই চারিটী কথা বলিব। ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার সাধনেতিহাস শুনিতে শুনিতে আমাদিগের মনে একদিন ঐরূপ প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল এবং উহা প্রকাশ করিতেও সঙ্কুচিত হই নাই। তদুত্তরে তিনি তখন আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এখানে বলিব। ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—"সমুদ্রের তীরে যে ব্যক্তি সর্ব্বদা বাস করে, তাহার মনে যেমন কখন কখন বাসনার উদয় হয়, রত্নাকরের গর্ভে কত প্রকার রত্ন আছে তাহা দেখি, তেমনি মাকে পাইয়া ও মার কাছে সর্ব্বদা থাকিয়াও আমার তখন মনে হইত, অনন্তভাবময়ী অনন্তরূপিণী তাঁহাকে নানা-ভাবে ও নানারূপে দেখিব। বিশেষ কোনভাবে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইলে উহার জন্য তাঁহাকে ব্যাকুল হইয়া ধরিতাম। কৃপাময়ী মাও তখন, তাঁহার ঐভাব দেখিতে বা উপলব্ধি করিতে যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা যোগাইয়া এবং আমার দ্বারা করাইয়া লইয়া সেই

ভাবে দেখা দিতেন। ঐরূপেই ভিন্ন ভিন্ন মতের সাধন করা হইয়াছিল।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মধুরভাবে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুর ভাবসাধনের চরম ভূমিতে উপনীত হইয়াছিলেন। উহার পরেই ঠাকুরের মনে সর্ব্ব-ভাবাতীত বেদান্ত-প্রসিদ্ধ অদ্বৈতভাবসাধনে প্রবল প্রেরণা আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীশ্রীজগদম্বার ইঙ্গিতে ঐ প্রেরণা তাঁহার জীবনে কিরূপে উপস্থিত হইয়াছিল এবং কিরূপেই বা তিনি এখন শ্রীশ্রীজগন্মাতার নির্গুণ নিরাকার নির্ব্বিকল্প তুরীয় রূপের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাই এখন আমরা পাঠককে বলিতে প্রবৃত্ত হইব।

ঠাকুর যখন অদ্বৈতভাবসাধনে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার বৃদ্ধা মাতা দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটীতে অবস্থান করিতেছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র

ঠাকুরের জননীর গঙ্গাতীরে বাস করিবার সংকল্প এবং দক্ষিণেশ্বরে আগমন।

রামকুমারের মৃত্যু হইলে, শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা অপর দুইটি পুত্রের মুখ চাহিয়া কোনরূপে বুক বাঁধিয়া ছিলেন। কিন্তু অনতিকাল পরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র গদাধর পাগল হইয়াছে বলিয়া লোকে যখন রটনা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার দুঃখের আর অবধি রহিল না। পুত্রকে গৃহে আনাইয়া নানা চিকিৎসা ও শান্তিস্বস্ত্যয়নাদির অনুষ্ঠানে তাঁহার ঐ ভাবের যখন কথঞ্চিৎ উপশম হইল, তখন বৃদ্ধা আবার আশায় বুক বাঁধিয়া তাহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু বিবাহের পরে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিয়া গদাধরের ঐ অবস্থা আবার যখন উপস্থিত হইল, তখন বৃদ্ধা আর আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না—পুত্রের আরোগ্য কামনায় হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন। পরে মহাদেবের প্রত্যাদেশে পুত্র দিব্যোন্মাদ হইয়াছে জানিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইলেও, তিনি উহার অনতিকাল পরে সংসারে বীতরাগ হইয়া দক্ষিণেশ্বরে পুত্রের নিকটে

উপস্থিত হইলেন এবং জীবনের অবশিষ্টকাল ভাগীরথীতীরে যাপন করিবেন বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। কারণ, যাহাদের জন্য এবং যাহাদের লইয়া তাঁহার সংসার করা, তাহারাই যদি একে একে সংসার ও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিল, তবে বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার আর উহাতে লিপ্ত থাকিবার প্রয়োজন কি? শ্রীযুত মথুরের অন্নমেরু অনুষ্ঠানের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠককে বলিয়াছি। ঠাকুরের মাতা ঐ সময়ে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং এখন হইতে দ্বাদশ বৎসরান্তে তাঁহার শরীরত্যাগের কালের মধ্যে তিনি কামারপুকুরে পুনর্ব্বার আগমন করেন নাই। অতএব ঠাকুরের জটাধারী বাবাজীর নিকট হইতে 'রাম'-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ এবং মধুরভাব ও বেদান্তভাব প্রভৃতির সাধন যে তাঁহার মাতার দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ঠাকুরের মাতার উদার হৃদয়ের পরিচায়ক একটি ঘটনা আমরা পাঠককে এখানে বলিতে চাহি। ঘটনাটি তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে আগমনের স্বল্পকাল পরেই উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঐকালে কালীবাটীতে মথুরবাবুর অক্ষুণ্ণ প্রভাব ছিল এবং মুক্তহস্ত হইয়া তিনি নানা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান ও প্রভূত অন্নদান করিতেছিলেন। ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও ভক্তির অবধি না থাকায়, তিনি ঠাকুরের শারীরিক সেবার যাহাতে কোনকালে ত্রুটি না হয়, তদ্বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য ভিতরে ভিতরে সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন; কিন্তু ঠাকুরের কঠোর ত্যাগশীলতা দেখিয়া তাঁহাকে ঐ কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে এপর্য্যন্ত সাহসী হন নাই। তাঁহার শ্রবণগোচর হয়, এরূপ স্থলে দাঁড়াইয়া তিনি ইতিপূর্ব্বে একদিন ঠাকুরের নামে একখানি তালুক লেখাপড়া করিয়া দিবার পরামর্শ

ঠাকুরের জননীর লোভরাহিত্য।

হৃদয়ের সহিত করিতে যাইয়া বিষম অনর্থে পতিত হইয়াছিলেন। কারণ, ঐ কথা কর্ণগোচর হইবামাত্র ঠাকুর উন্মত্তপ্রায় হইয়া 'শালা, তুই আমাকে বিষয়ী করিতে চাস' বলিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে ধাবিত হইয়াছিলেন। সুতরাং মনে জাগরূক থাকিলেও মথুর নিজ অভিপ্রায় সম্পাদনের কোনরূপ সুযোগ লাভ করেন নাই। ঠাকুরের মাতার আগমনে তিনি এখন সুযোগ বুঝিয়া, বৃদ্ধা চন্দ্রাদেবীকে পিতামহী সম্বোধনে আপ্যায়িত করিলেন এবং প্রতিদিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিলেন। পরে অবসর বুঝিয়া একদিন তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন—'ঠাকুরমা, তুমি ত আমার নিকট হইতে কখন কিছু সেবা গ্রহণ করিলে না? তুমি যদি যথার্থই আমাকে আপনার বলিয়া ভাব, তাহা হইলে আমার নিকট হইতে তোমার যাহা ইচ্ছা, চাহিয়া লও।' সরলহৃদয়া বৃদ্ধা মথুরের ঐরূপ কথায় বিশেষ বিপন্না হইলেন। কারণ, ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন বিষয়ের অভাব অনুভব করিলেন না, সুতরাং কি চাহিয়া লইবেন, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অগত্যা তাঁহাকে বলিতে হইল;—"বাবা, তোমার কল্যাণে আমার ত এখন কোন বিষয়ের অভাব নাই, যখন কোন জিনিষের আবশ্যক বুঝিব, তখন চাহিয়া লইব।" এই, বলিয়া বৃদ্ধা আপনার পেঁট্‌রা খুলিয়া মথুরকে বলিলেন,—"দেখিবে, এই দেখ, আমার এত পরিবার কাপড় রহিয়াছে; আর তোমার কল্যাণে এখানে খাবার ত কোন কষ্টই নাই, সকল বন্দোবস্তই ত তুমি করিয়া দিয়াছ ও দিতেছ, তবে আর কি চাহি, বল?" মথুর কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন, 'যাহা ইচ্ছা কিছু লও' বলিয়া বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন ঠাকুরের জননীর একটি

অভাবের কথা মনে পড়িল; তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—'যদি নেহাৎ দেবে, তবে আমার এখন মুখে দিবার গুলের অভাব, এক আনার দোক্তা তামাক কিনিয়া দাও।' বিষয়ী মথুরের ঐকথায় চক্ষে জল আসিল। তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—'এমন মা না হইলে কি অমন ত্যাগশীল পুত্র হয়।' এই বলিয়া বৃদ্ধার অভিপ্রায়মত দোক্তা তামাক আনাইয়া দিলেন।

ঠাকুরের বেদান্তসাধনে নিযুক্ত হইবার কালে তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র হলধারী দক্ষিণেশ্বর-দেবালয়ে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দজীউএর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া এবং ভাগবতাদি গ্রন্থে তাঁহার সামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল বলিয়া তিনি অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কখন কখন ঠাকুরকে কিরূপে শ্লেষ করিতেন ও তাঁহার আধ্যাত্মিক দর্শন ও অবস্থাসমূহকে মস্তিষ্কের বিকারপ্রসূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন এবং ঠাকুর তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকে ঐ কথা নিবেদন করিয়া কিরূপে বারম্বার আশ্বস্ত হইতেন—সে সকল কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠককে বলিয়াছি। হলধারীর তীব্র শ্লেষপূর্ণ বাক্যে তিনি একসময়ে বিষণ্ণ হইলে ভাবাবেশে এক সৌম্য মূর্ত্তির দর্শন ও 'ভাবমুখে থাক' বলিয়া প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, ঐ দর্শন ঠাকুরের বেদান্তসাধনে নিযুক্ত হইবার কিছু পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল এবং মধুরভাব সাধনের সময় তাঁহাকে স্ত্রীবেশ ধারণপূর্ব্বক রমণীর ন্যায় থাকিতে দেখিয়াই হলধারী তাঁহাকে আত্মজ্ঞানবিহীন বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমদাচার্য্য তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও অবস্থানের সময় হলধারী কালীবাটীতে ছিলেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত একত্রে শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন, একথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি।

হলধারীর কর্ম্মত্যাগ ও অক্ষয়ের আগমন।

শ্রীমৎ তোতা ও হলধারীর ঐরূপে অধ্যাত্মরামায়ণ-চর্চ্চাকালে ঠাকুর এক দিন জায়া ও অনুজ লক্ষ্মণ সহ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের দিব্যদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমৎ তোতা সম্ভবতঃ সন ১২৭১ সালের শেষভাগে দক্ষিণেশ্বরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ঐ ঘটনার কয়েক মাস পরে শারীরিক অসুস্থতাদি নিবন্ধন হলধারী কালীবাটীর কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ঠাকুরের ভাতুষ্পুত্র অক্ষয় তাঁহার স্থলে নিযুক্ত হয়েন।

ভাবসমাধিতে সিদ্ধ ঠাকুরের অদ্বৈতভাব সাধনে প্রবৃত্তি হইবার কারণ।

ভক্তের স্বভাব—তাঁহারা সাযুজ্য বা নির্ব্বাণ মুক্তি লাভে কখন প্রয়াসী হন না। শান্তদাস্যাদি ভাববিশেষ অবলম্বনপূর্ব্বক ঈশ্বরের প্রেমের মহিমা ও মাধুর্য্য সম্ভোগ করিতেই তাঁহারা সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকেন। দেবীভক্ত শ্রীরাম, প্রসাদের 'চিনি হওয়া ভাল নয় মা, চিনি খেতে ভালবাসি'-রূপ কথা ভক্তহৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস বলিয়া সর্ব্বকালপ্রসিদ্ধ আছে। অতএব ভাবসাধনের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়া ঠাকুরের ভাবাতীত অদ্বৈতাবস্থা লাভের জন্য প্রযাস অনেকের বিসদৃশ ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ ভাবিবার পূর্ব্বে আমাদিগের স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, ঠাকুর স্বপ্রনোদিত হইয়া এখন আর কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ ছিলেন না। জগদম্বার বালক ঠাকুর, এখন তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, তাঁহারই মুখ চাহিয়া সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছিলেন এবং তিনি তাঁহাকে যে ভাবে যখন ঘুরাইতে ফিরাইতেছিলেন, সেই ভাবেই তখন পরমানন্দে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতাও ঐ কারণে তাঁহার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণপূর্ব্বক নিজ উদ্দেশ্যবিশেষ সাধনের জন্য ঠাকুরের অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে অদৃষ্টপূর্ব্বক অভিনব আদর্শে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। সর্ব্বপ্রকার সাধনের অন্তে ঠাকুর জগদম্বার ঐ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং উহা বুঝিয়া জীবনের

অবশিষ্টকাল মাতার সহিত প্রেমে এক হইয়া লোককল্যাণসাধনরূপ তাঁহার সুমহৎ দায়িত্ব আপনার বলিয়া অনুভবপূর্ব্বক সানন্দে বহন করিয়াছিলেন।

ভাবসাধনের চরমে অদ্বৈতভাবলাভের চেষ্টায় যুক্তিযুক্ততা।

মধুরভাব সাধনের পরে ঠাকুরের অদ্বৈতভাব সাধনের যুক্তি-যুক্ততা আর এক দিক দিয়া দেখিলে বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। ভাব ও ভাবাতীত রাজ্য পরস্পর কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধে সর্ব্বদা অবস্থিত। কারণ, ভাবাতীত অদ্বৈতরাজ্যের ভূমানন্দই সীমাবদ্ধ হইয়া ভাব-রাজ্যের দর্শন-স্পর্শনাদি সম্ভোগানন্দরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে। অতএব মধুরভাবে পরাকাষ্ঠালাভে ভাবরাজ্যের চরমভূমিতে উপনীত হইবার পরে ভাবাতীত অদ্বৈত-ভূমি ভিন্ন অন্য কোথায় আর তাঁহার মন অগ্রসর হইবে?

শ্রীশ্রীজগদম্বার ইঙ্গিতেই যে, ঠাকুর এখন অদ্বৈতভাবসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, একথা আমরা নিম্নলিখিত ঘটনায় সম্যক্ বুঝিতে পারিব—

শ্রীমৎ তোতাপুরীর আগমন।

সাগরসঙ্গমে স্নান ও পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সাক্ষাৎ প্রকাশ দর্শন করিবেন বলিয়া, পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ তোতা এইকালে মধ্যভারত হইতে যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে করিতে বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হন। পুণ্যতোয়া নর্ম্মদাতীরে বহুকাল একান্তবাসপূর্ব্বক সাধন-ভজনে নিমগ্ন থাকিয়া তিনি ইতিপূর্ব্বে নির্ব্বিকল্প সমাধিপথে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, একথার পরিচয় তথাকার প্রাচীন সাধুরা এখনও প্রদান করিয়া থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞ হইবার পরে তাঁহার মনে কিছুকাল যদৃচ্ছা পরিভ্রমণের সংকল্প উদিত হয় এবং উহার প্রেরণায় তিনি পূর্ব্বভারতে আগমনপূর্ব্বক তীর্থান্তরে ভ্রমণ করিতে থাকেন।

আত্মারাম পুরুষদিগের সমাধি-ভিন্ন-কালে বাহ্যজগতের উপলব্ধি হইলেও উহাকে ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব হইয়া থাকে। মায়াকল্পিত জগদন্তর্গত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি, দেশ, কাল ও পদার্থে উচ্চাবচ ব্রহ্ম-প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা ঐকালে দেবস্থান, তীর্থ ও সাধু-দর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। অতএব ব্রহ্মজ্ঞ তোতার তীর্থদর্শনে প্রবৃত্ত হওয়া বিচিত্র নহে। পূর্ব্বোক্ত তীর্থদ্বয়-দর্শনান্তে ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ফিরিবার কালে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন। তিন দিবসের অধিক কাল একস্থানে যাপন করা তাঁহার নিয়ম ছিল না। ঐজন্য কালীবাটীতে তিনি দিবসত্রয় মাত্র অতিবাহিত করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহার জ্ঞানের মাত্রা সম্পূর্ণ করিয়া দিবেন বলিয়া এবং তাঁহার দ্বারা নিজ বালককে বেদান্ত সাধন করাইবেন বলিয়া যে, তাঁহাকে এখানে আনয়ন করিয়াছেন, একথা তাঁহার তখন হৃদয়ঙ্গম হয় নাই।

ঠাকুর ও তোতাপুরীর প্রথম সম্ভাষণ এবং ঠাকুরের বেদান্তসাধন-বিষয়ে প্রত্যাদেশ-লাভ।

কালীবাটীতে আগমন করিয়া তোতাপুরী প্রথমেই ঘাটের সুবৃহৎ চাঁদনীতে আসিয়া উপস্থিত হন। ঠাকুর তখন তথায় অন্যমনে এক পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তাঁহার তপোদীপ্ত ভাবোজ্জ্বল বদনের প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র শ্রীমৎ তোতা আকৃষ্ট হইলেন এবং প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, ইনি সামান্য পুরুষ নহেন—বেদান্তসাধনের এরূপ উত্তমাধিকারী বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। তন্ত্রপ্রাণ বঙ্গে বেদান্তের এরূপ অধিকারী আছে ভাবিয়া, তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন এবং ঠাকুরকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণপূর্ব্বক স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে উত্তম অধিকারী বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি বেদান্ত সাধন করিবে ?"

জটাজুটধারী দীর্ঘবপুঃ উলঙ্গ সন্ন্যাসীর ঐ প্রশ্নে ঠাকুর উত্তর

করিলেন,—"কি করিব না করিব, আমি কিছুই জানি না—আমার মা সব জানেন, তিনি আদেশ করিলে করিব।"

শ্রীমৎ তোতা—"তবে যাও, তোমার মাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। কারণ, আমি এখানে দীর্ঘকাল থাকিব না।"

ঠাকুর ঐ কথায় আর কোন উত্তর না করিয়া ধীরে ধীরে ৺জগদম্বার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার বাণী শুনিতে পাইলেন,—"যাও শিক্ষা কর, তোমাকে শিখাইবার জন্যই সন্ন্যাসীর এখানে আগমন হইয়াছে।"

শ্রীশ্রীজগদম্বা সম্বন্ধে শ্রীমৎ তোতার যেরূপ ধারণা ছিল।

অর্দ্ধবাহ্যভাবাবিষ্ট ঠাকুর তখন হর্ষোৎফুল্লবদনে তোতাপুরী গোস্বামীর সমীপে আসিয়া তাঁহার মাতার ঐরূপ প্রত্যাদেশ নিবেদন করিলেন। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিতা ৺দেবীকেই ঠাকুর প্রেমে ঐরূপে মাতৃসম্বোধন করিতেছেন বুঝিয়া শ্রীমৎ তোতা তাঁহার বালকের ন্যায় সরল ভাবে মুগ্ধ হইলেও তাঁহার ঐপ্রকার আচরণ অজ্ঞতা ও কুসংস্কারনিবন্ধন বলিয়া ধারণা করিলেন। ঐরূপ সিদ্ধান্তে তাঁহার অধরপ্রান্তে করুণা ও ব্যঙ্গমিশ্রিত হাস্যের ঈষৎ রেখা দেখা দিয়াছিল, এ কথা আমরা অনুমান করিতে পারি। কারণ, শ্রীমৎ তোতার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বেদান্তোক্ত কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর ভিন্ন অপর কোন দেব দেবীর নিকট মস্তক অবনত করিত না এবং ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ সংযত সাধকের ঐরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্বমাত্রে শ্রদ্ধাপূর্ণ বিশ্বাস ভিন্ন কৃপাপ্রার্থী হইয়া তাঁহাকে ভক্তি ও উপাসনাদি করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিত না। আর, ত্রিগুণময়ী ব্রহ্মশক্তি মায়া?—গোস্বামীজী উহাকে ভ্রমমাত্র বলিয়া ধারণা করিয়া উহার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব স্বীকারের বা উহার প্রসন্নতার জন্য উপাসনার কোনরূপ আবশ্যকতা অনুভব করিতেন না। ফলতঃ অজ্ঞানবন্ধন

হইতে মুক্তিলাভের জন্য সাধকের পুরুষকার অবলম্বন ভিন্ন ঈশ্বর বা শক্তিসংযুক্ত ব্রহ্মের করুণা ও সহায়তা প্রার্থনায় কিঞ্চিন্মাত্র সাফল্য তিনি প্রাণে অনুভব করিতেন না, এবং যাহারা ঐরূপ করে, তাহারা শাস্ত্র সংস্কারবশতঃ করিয়া থাকে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন।

ঠাকুরের গুপ্তভাবে সন্ন্যাস গ্রহণের অভিপ্রায় ও উহার কারণ।

সে যাহা হউক, তাঁহার নিকটে দীক্ষিত হইয়া জ্ঞানমার্গের সাধনে প্রবৃত্ত হইলে, ঠাকুরের মনের পূর্ব্বোক্ত সংস্কার অচিরে দূর হইবে ভাবিয়া তোতা তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে আর কিছু এখন না বলিয়া অন্য কথার অবতারণা করিলেন এবং বলিলেন—বেদান্ত সাধনে উপদিষ্ট ও প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে শিখাসূত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক যথাশাস্ত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে। ঠাকুর উহাতে স্বীকৃত হইতে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—গোপনে করিলে যদি হয় তাহা হইলে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে তাঁহার কিছু মাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু প্রকাশ্যে ঐরূপ করিয়া তাঁহার শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা জননীর প্রাণে বিষমাঘাত প্রদান করিতে তিনি কিছুতেই সমর্থ হইবেন না। গোস্বামীজি উহাতে ঠাকুরের ঐরূপ অভিপ্রায়ের কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং "উত্তম কথা, শুভমুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে তোমাকে গোপনেই দীক্ষিত করিব" বলিয়া পঞ্চবটীতলে আগমনপূর্ব্বক আসন বিস্তীর্ণ করিলেন।

ঠাকুরের সন্ন্যাসদীক্ষা-গ্রহণের পূর্ব্বকার্য্য-সকল সম্পাদন।

অনন্তর শুভদিনের উদয় জানিয়া শ্রীমৎ তোতা ঠাকুরকে পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে আদেশ করিলেন এবং ঐ কার্য্য সমাধা হইলে শিষ্যের নিজ আত্মার তৃপ্তির জন্য যথাবিধানে পিণ্ডপ্রদান করাইলেন। কারণ, সন্ন্যাসদীক্ষাগ্রহণের সময় হইতে সাধক ভূরাদি সমস্ত লোকপ্রাপ্তির

আশা ও অধিকার নিঃশেষে বর্জ্জন করেন বলিয়া শাস্ত্র তাঁহাকে তৎপূর্ব্বে আপন প্রেত-পিণ্ড আপনি প্রদান করিতে বলিয়াছেন।

ঠাকুর যখন যাহাকে গুরুপদে বরণ করিয়াছেন তখন নিঃসঙ্কোচে তাঁহাকে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক তিনি যেরূপ করিতে আদেশ করিয়াছেন, অসীম বিশ্বাসের সহিত তাহা অনুষ্ঠান করিয়াছেন। অতএব শ্রীমৎ তোতা তাঁহাকে এখন যেরূপ করিতে বলিতেছিলেন তাহাই তিনি বর্ণে বর্ণে অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, একথা বলা বাহুল্য। শ্রাদ্ধাদি পূর্ব্বক্রিয়া সমাপন করিয়া তিনি সংযত হইয়া রহিলেন এবং পঞ্চবটীস্থ নিজ সাধনকুটীরে গুরুনির্দ্দিষ্ট দ্রব্যসকল আহরণ করিয়া সানন্দে শুভমুহূর্ত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাত্রি অবসানে শুভ-ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তের উদয় হইলে, গুরু ও শিষ্য উভয়ে কুটীরে সমাগত হইলেন। পূর্ব্বকৃত্য সমাপ্ত হইল, হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল এবং ঈশ্বরার্থে সর্ব্বস্ব-ত্যাগরূপ যে ব্রত সনাতন কাল হইতে গুরুপরম্পরাগত হইয়া ভারতকে এখনও ব্রহ্মজ্ঞ পদবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, সেই ত্যাগব্রতাবলম্বনের পূর্ব্বোচ্চার্য্য মন্ত্র-সকলের পূত-গম্ভীর ধ্বনিতে পঞ্চবটী উপবন মুখরিত হইয়া উঠিল। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর স্নেহসম্পূর্ণ বক্ষস্থিতবায়ু সেই ধ্বনির সুখস্পর্শে যেন নূতন জীবনের সঞ্চার আনয়ন করিল, এবং যুগযুগান্তরের অলৌকিক সাধক বহুকাল পরে আবার ভারতের এবং সমগ্র জগতের বহুজনহিতার্থ সর্ব্বস্বত্যাগরূপ ব্রতাবলম্বন করিতেছেন, ঐ সংবাদ জানাইতেই তিনি যেন আনন্দকলগানে দিগন্তে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন।

গুরু মন্ত্রপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন; শিষ্য অবহিতচিত্তে তাঁহাকে অনুসরণপূর্ব্বক সেই সকল কথা উচ্চারণ করিয়া সমিদ্ধ হুতাশনে আহুতি প্রদানে প্রস্তুত হইলেন। "প্রথমে প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারিত হইল—

"পরব্রহ্মতত্ত্ব আমাকে প্রাপ্ত হউক। পরমানন্দলক্ষণোপেত বস্তু আমাকে প্রাপ্ত হউক। অখণ্ডৈকরস মধুময় ব্রহ্মবস্তু আমাতে প্রকাশিত হউক। হে ব্রহ্মবিদ্যাসহ নিত্য বর্ত্তমান পরমাত্মন্, দেব-মনুষ্যাদি তোমার সমগ্র সন্তানগণের মধ্যে আমি তোমার বিশেষ করুণাযোগ্য বালক সেবক। হে সংসারদুঃস্বপ্নহারিন্ পরমেশ্বর, দ্বৈতপ্রতিভাকপ আমার যাবতীয় দুঃস্বপ্ন বিনাশ কর। হে পরমাত্মন্, আমার যাবতীয় প্রাণবৃত্তি আমি নিঃশেষে তোমাতে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়সকলকে নিরুদ্ধ করিয়া ত্বদেকচিত্ত হইতেছি। হে সর্ব্বপ্রেরক দেব, জ্ঞানপ্রতিবন্ধক যাবতীয় মলিনতা আমা হইতে বিদূরিত করিয়া অসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনাদিরহিত তত্ত্বজ্ঞান যাহাতে আমাতে উপস্থিত হয় তাহাই কর। সূর্য্য, বায়ু, নদীসকলের স্নিগ্ধ নির্ম্মল বারি, ব্রীহি-যবাদি শস্য, বনস্পতিসমূহ, জগতের সকল পদার্থ তোমার নিদেশে অনুকূল প্রকাশযুক্ত হইয়া আমাকে তত্ত্বজ্ঞানলাভে সহায়তা করুক। হে ব্রহ্মন্, তুমিই জগতে বিশেষ শক্তিমান্ নানারূপে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছ। শরীর মন শুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানধারণের যোগ্যতা লাভের জন্য আমি অগ্নিস্বরূপ তোমাতে আহুতি প্রদান করিতেছি—প্রসন্ন হও।" *

সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্ব প্রার্থনামন্ত্র।

অনন্তর বিরজা হোম আরম্ভ হইল—"পৃথ্বী, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশরূপে আমাতে অবস্থিত ভূতপঞ্চ শুদ্ধ হউক, আহুতি প্রভাবে রজোগুণপ্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্ব সম্পাদ্য বিরজা হোমের সংক্ষেপ সারার্থ।

"প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যানাদি আমাতে অবস্থিত বায়ু-

* ত্রিসুপর্ণ মন্ত্রের ভাবার্থ।

সকল শুদ্ধ হউক, আহুতি প্রভাবে রজোগুণপ্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় নামক আমার কোষ-পঞ্চ শুদ্ধ হউক; আহুতি প্রভাবে রজোগুণপ্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধপ্রসূত আমাতে অবস্থিত বিষয়সংস্কার সমূহ শুদ্ধ হউক, আহুতি প্রভাবে রজোগুণপ্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"আমার মন, বাক্য, কায়, কর্ম্মাদি শুদ্ধ হউক; আহুতি প্রভাবে রজোগুণপ্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"হে অগ্নিশরীরে শয়ান, জ্ঞান-প্রতিবন্ধ-হরণ-কুশল, লোহিতাক্ষ পুরুষ, জাগরিত হও, হে অভীষ্টপূরণকারিন, তত্ত্বজ্ঞান লাভের পথে আমার যত কিছু প্রতিবন্ধক আছে সেই সকলের নাশ কর এবং চিত্তের সমগ্র সংস্কার সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হইয়া যাহাতে গুরুমুখে শ্রুত জ্ঞান আমার অন্তরে সম্যক্ উদিত হয় তাহা করিয়া দাও, আহুতি দ্বারা রজোগুণ প্রসূত মলিনতা বিদূরিত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"চিদাভাস ব্রহ্মস্বরূপ আমি, দারা, পুত্র সম্পৎ, লোকমান্য, সুন্দর শরীরাদি লাভের সমস্ত বাসনা অগ্নিতে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক নিঃশেষে ত্যাগ করিতেছি—স্বাহা।"

ঐরূপে বহু আহুতি প্রদত্ত হইবার পর 'ভূরাদি সকল লোক লাভের প্রত্যাশা আমি এইক্ষণ হইতে ত্যাগ করিলাম' এবং 'জগতের সর্ব্বভূতকে অভয় প্রদান করিতেছি'—বলিয়া হোম পরিসমাপ্ত হইল। অনন্তর শিখা, সূত্র ও যজ্ঞোপবীত যথাবিধানে আহুতি দিয়া আবহমান-

ঠাকুরের শিখাসূত্রাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ।

কাল হইতে সাধকপরম্পরানিষেবিত গুরুপ্রদত্ত কৌপীন, কাষায় ও নামে * ভূষিত হইয়া ঠাকুর শ্রীমৎ তোতার নিকটে উপদেশ গ্রহণের জন্য উপবিষ্ট হইলেন।

ঠাকুরের ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানের জন্য শ্রীমৎ তোতার প্রেরণা।

অনন্তর ব্রহ্মজ্ঞ তোতা ঠাকুরকে এখন, বেদান্তপ্রসিদ্ধ 'নেতি নেতি' উপায়াবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানের জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। বলিলেন—

নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, দেশকালাদি দ্বারা সর্ব্বদা অপরিচ্ছিন্ন একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই নিত্য সত্য। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া নিজ-প্রভাবে তাঁহাকে নামরূপের দ্বারা খণ্ডিতবৎ প্রতীত করাইলেও তিনি কখনও বাস্তবিক ঐরূপ নহেন। কারণ সমাধিকালে মায়াজনিত দেশকাল বা নামরূপের বিন্দুমাত্র উপলব্ধি হয় না। অতএব নাম-রূপের সীমার মধ্যে যাহা কিছু অবস্থিত তাহা কখনও নিত্য বস্তু হইতে পারে না, উহাকেই দূরপরিহার কর। নামরূপের দৃঢ় পিঞ্জর সিংহবিক্রমে ভেদ করিয়া নির্গত হও। আপনাতে অবস্থিত আত্মতত্ত্বের অন্বেষণে ডুবিয়া যাও। সমাধিসহায়ে তাঁহাতে অবস্থান কর, দেখিবে, নামরূপাত্মক জগৎ তখন কোথায় লুপ্ত হইবে, ক্ষুদ্র আমিজ্ঞান বিরাটে লীন ও স্তব্ধীভূত হইবে এবং অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে নিজ স্বরূপ বলিয়া সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিবে। "যে জ্ঞানাবলম্বনে এক ব্যক্তি অপরকে দেখে, জানে বা অপরের কথা শুনে, তাহা অল্প বা ক্ষুদ্র ; যাহা অল্প, তাহা তুচ্ছ—তাহাতে পরমানন্দ নাই ; কিন্তু যে জ্ঞানে ;

* আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, সন্ন্যাসদীক্ষা দানের সময় শ্রীমৎ তোতাপুরী গোস্বামী ঠাকুরকে 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাম প্রদান করিয়াছিলেন। অপর কেহ কেহ বলেন, ঠাকুরের পরম ভক্ত সেবক শ্রীযুক্ত মথুরামোহনই তাঁহাকে ঐ নামে প্রথম অভিহিত করেন। প্রথম মতটিই আমাদিগের সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

অবস্থিত হইয়া এক ব্যক্তি অপরকে দেখে না, জানে না বা অপরের বাণী ইন্দ্রিয়গোচর করে না—তাহাই ভূমা বা মহান্, তৎসহায়ে পরমানন্দে অবস্থিতি হয়। যিনি সর্ব্বদা সকলের অন্তরে বিজ্ঞাতা হইয়া রহিয়াছেন, কোন্ মনবুদ্ধি তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হইবে ?”

ঠাকুরের মনকে নির্ব্বিকল্প করিবার চেষ্টা নিষ্ফল হওয়ায় তোতার আচরণ এবং ঠাকুরের নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভ।

শ্রীমৎ তোতা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নানা যুক্তি ও সিদ্ধান্তবাক্য-সহায়ে ঠাকুরকে সেদিন সমাহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি, তিনি যেন সেদিন তাঁহার আজীবন সাধনালব্ধ উপলব্ধিসমূহ অন্তরে প্রবেশ করাইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ অদ্বৈতভাবে সমাহিত করিয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, “দীক্ষা প্রদান করিয়া ন্যাংটা নানা সিদ্ধান্তবাক্যের উপদেশ করিতে লাগিল এবং মনকে সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বিকল্প করিয়া আত্মধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাইতে বলিল। আমার কিন্তু এমনি হইল যে, ধ্যান করিতে বসিয়া চেষ্টা করিয়াও মনকে নির্ব্বিকল্প করিতে বা নামরূপের গণ্ডী ছাড়াইতে পারিলাম না। অন্য সকল বিষয় হইতে মন সহজেই গুটাইয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু ঐরূপে গুটাইবামাত্র তাহাতে শ্রীশ্রীজগদম্বার চিরপরিচিত চিদ্‌ঘনোজ্জ্বল মূর্ত্তি জ্বলন্ত জীবন্তভাবে সমুদিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার নামরূপ ত্যাগের কথা এককালে ভুলাইয়া দিতে লাগিল। সিদ্ধান্তবাক্যসকল শ্রবণপূর্ব্বক ধ্যানে বসিয়া যখন উপর্য্যুপরি ঐরূপ হইতে লাগিল তখন নির্ব্বিকল্প সমাধি-সম্বন্ধে এক প্রকার নিরাশ হইলাম এবং চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ন্যাংটাকে বলিলাম, ‘হইল না, মনকে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকল্প করিয়া আত্মধ্যানে মগ্ন হইতে পারিলাম না।’ ন্যাংটা তখন বিষম উত্তেজিত হইয়া তীব্র তিরস্কার করিয়া বলিল, ‘কেঁও, হোগা নেহি,’ অর্থাৎ—কি, হইবে

না, এত বড় কথা! বলিয়া কুটীরের মধ্যে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া ভগ্ন কাচখণ্ড দেখিতে পাইয়া উহা গ্রহণ করিল এবং সূচীর ন্যায় উহার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ভ্রূমধ্যে সজোরে বিদ্ধ করিয়া বলিল, 'এই বিন্দুতে মনকে গুটাইয়া আন্।' তখন পুনরায় দৃঢ়সংকল্প করিয়া ধ্যানে বসিলাম এবং ৺জগদম্বার শ্রীমূর্ত্তি পূর্ব্বের ন্যায় মনে উদিত হইবামাত্র জ্ঞানকে অসি কল্পনা করিয়া উহা দ্বারা ঐ মূর্ত্তিকে মনে মনে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলাম। তখন আর মনে কোনরূপ বিকল্প রহিল না, একেবারে হু হু করিয়া উহা সমগ্র নাম-রূপ-রাজ্যের উপরে উঠিয়া গেল এবং সমাধিনিমগ্ন হইলাম।"

ঠাকুর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সমাধিস্থ হইলে শ্রীমৎ তোতা অনেকক্ষণ তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট রহিলেন। পরে নিঃশব্দে কুটীরের বাহিরে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার অজ্ঞাতসারে পাছে কেহ কুটীরে প্রবেশপূর্ব্বক ঠাকুরকে বিরক্ত করে এজন্য দ্বারে তালা লাগাইয়া দিলেন। অনন্তর কুটীরের অনতিদূরে পঞ্চবটীতলে নিজ আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য ঠাকুরের আহ্বান প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর নির্ব্বিকল্প সমাধি যথার্থ লাভ করিয়াছেন কি না তদ্বিষয়ে তোতার পরীক্ষা ও বিস্ময়।

দিন যাইল, রাত্রি আসিল। দিনের পর দিন আসিয়া দিবসত্রয় অতিবাহিত হইল। তথাপি ঠাকুর শ্রীমৎ তোতাকে দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য আহ্বান করিলেন না। তখন বিস্ময়কৌতূহলে তোতা আপনিই আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং শিষ্যের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবেন বলিয়া অর্গল মোচন করিয়া কুটীরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন—যেমন বসাইয়া গিয়াছিলেন ঠাকুর সেই ভাবেই বসিয়া আছেন, দেহে প্রাণের প্রকাশ মাত্র নাই, কিন্তু মুখ প্রশান্ত, গম্ভীর, জ্যোতিঃপূর্ণ! বুঝিলেন—বহির্জগৎ সম্বন্ধে শিষ্য এখনও সম্পূর্ণ

মৃতকল্প—নিবাত-নিষ্কম্প-প্রদীপবৎ তাঁহার চিত্ত ব্রহ্মে লীন হইয়া অবস্থান করিতেছে।

সমাধিরহস্যজ্ঞ তোতা স্তম্ভিতহৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন—যাহা দেখিতেছি তাহা কি বাস্তবিক সত্য—চল্লিশ বৎসরব্যাপী কঠোর সাধনায় যাহা জীবনে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহা কি এই মহাপুরুষ সত্য সত্যই এক দিবসে আয়ত্ত করিলেন! সন্দেহাবেগে তোতা পুনরায় পরীক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন, তন্ন তন্ন করিয়া শিষ্যদেহে প্রকাশিত লক্ষণসকল অনুধাবন করিতে লাগিলেন। হৃদয় স্পন্দিত হইতেছে কি না, নাসিকাদ্বারে বিন্দুমাত্র বায়ু নির্গত হইতেছে কি না, বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলেন। ধীর স্থির কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় অচঞ্চলভাবে অবস্থিত শিষ্যশরীর বারম্বার স্পর্শ করিলেন। কিছুমাত্র বিকার বৈলক্ষণ্য বা চেতনার উদয় হইল না। তখন বিস্ময়ানন্দে অভিভূত হইয়া তোতা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

'যহ ক্যা দৈবী মায়া' সত্য—সত্যই সমাধি, বেদান্তোক্ত জ্ঞানমার্গের চরম ফল, নির্ব্বিকল্প সমাধি এক দিনে হইয়াছে!—দেবতার এ কি অত্যদ্ভুত মায়া।

অনন্তর সমাধি হইতে শিষ্যকে ব্যুত্থিত করিবেন বলিয়া তোতা প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলেন এবং 'হরি ওম্' মন্ত্রের সুগম্ভীর আরাবে পঞ্চবটীর স্থল-জল-ব্যোম পূর্ণ হইয়া উঠিল।

শ্রীমৎ তোতার ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ করিবার চেষ্টা

শিষ্যপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া এবং নির্ব্বিকল্প ভূমিতে তাঁহাকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবেন বলিয়া শ্রীমৎ তোতা কিরূপে এখানে দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস অতিবাহিত করিতে লাগিলেন এবং ঠাকুরের সহায়ে কিরূপে নিজ আধ্যাত্মিক জীবন সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ

করিলেন, সে সকল কথা আমরা অন্যত্র * সবিস্তারে বলিয়াছি বলিয়া এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

একাদিক্রমে একাদশ মাস দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া শ্রীমৎ তোতা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রস্থান করিলেন। ঐ ঘটনার অব্যবহিত পরেই ঠাকুরের মনে দৃঢ় সঙ্কল্প উপস্থিত হইল, তিনি এখন হইতে নিরন্তর নির্ব্বিকল্প অদ্বৈতভূমিতে অবস্থান করিবেন। কিরূপে তিনি ঐ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন—জীবকোটি সাধকবর্গের কথা দূরে থাকুক, অবতারপ্রতিম আধিকারিক পুরুষেরাও যে ঘনীভূত অদ্বৈতাবস্থায় বহুকাল অবস্থান করিতে সক্ষম হয়েন না, সেই ভূমিতে কিরূপে তিনি নিরন্তর ছয়মাস কাল অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন—এবং ঐকালে কিরূপে জনৈক সাধু পুরুষ কালীবাটীতে আগমনপূর্ব্বক ঠাকুরের দ্বারা পরে লোককল্যাণ বিশেষরূপে সাধিত হইবে, একথা জানিতে পারিয়া ছয় মাস কাল তথায় অবস্থান করিয়া নানা উপায়ে তাঁহার শরীর রক্ষা করিয়াছিলেন, সে সকল কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র † বলিয়াছি। অতএব ঠাকুরের সহায়ে এইকালে মথুরবাবুর জীবনে যে বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া আমরা এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব।

ঠাকুরের জগদম্বা দাসীর কঠিন পীড়া আরোগ্য করা।

ঠাকুরের ভিতর নানা প্রকার দৈবশক্তির দর্শনে মথুরবাবুর ভক্তি বিশ্বাস ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই কালের একটী ঘটনায় সেই ভক্তি অধিকতর অচলভাব ধারণপূর্ব্বক চিরকাল তাঁহাকে ঠাকুরের শরণাপন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৮ম অধ্যায়।
† গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—২য় অধ্যায়।

মথুরামোহনের দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী জগদম্বা দাসী এইকালে গ্রহণীরোগে আক্রান্তা হয়েন। রোগ ক্রমশঃ এত বাড়িয়া উঠে যে, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বৈদ্যসকল তাঁহার জীবনরক্ষা-সম্বন্ধে প্রথমে সংশয়াপন্ন এবং পরে হতাশ হয়েন।

ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি, মথুরামোহন সুপুরুষ ছিলেন, কিন্তু দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রূপবান্ দেখিয়াই রাসমণি তাঁহাকে প্রথমে নিজ তৃতীয় কন্যা শ্রীমতী করুণাময়ীর সহিত এবং ঐ কন্যার মৃত্যু হইলে পুনরায় নিজ কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। অতএব বিবাহের পরেই শ্রীযুত মথুরের অবস্থা পরিবর্ত্তন হয় এবং স্বয়ং বুদ্ধিবলে ও কর্ম্মকুশলতায় ক্রমে তিনি নিজ শ্বশ্রূঠাকুরাণীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া উঠেন। অনন্তর রাণী রাসমণির মৃত্যু হইলে কিরূপে তিনি রাণীর বিষয়-সংক্রান্ত সকল কার্য্য পরিচালনায় একরূপ একাধিপত্য লাভ করেন তাহা আমরা পাঠককে জানাইয়াছি।

জগদম্বা দাসীর সাংঘাতিক পীড়ায় মথুরামোহন এখন যে কেবল প্রিয়তমা পত্নীকে হারাইতে বসিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজ শ্বশ্রূঠাকুরাণীর বিষয়ের উপর পূর্ব্বোক্ত আধিপত্যও হারাইতে বসিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মনের এখনকার অবস্থাসম্বন্ধে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

রোগীর অবস্থা দেখিয়া যখন ডাক্তার বৈদ্যেরা জবাব দিয়া গেলেন, মথুর তখন কাতর হইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কালীমন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া ঠাকুরের অনুসন্ধানে পঞ্চবটীতে আসিলেন। তাঁহার ঐ প্রকার উন্মত্তপ্রায় অবস্থা দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে সযত্নে পার্শ্বে বসাইলেন এবং ঐরূপ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মথুর তাহাতে তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া

সজলনয়নে গদ গদ বাক্যে সকল কথা নিবেদন করিয়া দীনভাবে বারম্বার বলিতে লাগিলেন, 'আমার যাহা হইবার তাহা ত হইতে চলিল; বাবা, তোমার সেবাধিকার হইতেও এইবার বঞ্চিত হইলাম, তোমার সেবা আর করিতে পাইব না।'

মথুরের ঐরূপ দৈন্য দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয় করুণায় পূর্ণ হইল। তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া মথুরকে বলিলেন, 'ভয় নাই, তোমার পত্নী আরোগ্য হইবে।' বিশ্বাসী মথুর ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া জানিতেন, সুতরাং, তাঁহার অভয়বাণীতে প্রাণ পাইয়া সেদিন বিদায়-গ্রহণ করিলেন। অনন্তর জানবাজারে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি দেখিলেন, সহসা জগদম্বা দাসীর সাংঘাতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ঠাকুর বলিতেন, "সেই দিন হইতে জগদম্বা দাসী ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল এবং তাহার ঐ রোগটার ভোগ (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই শরীরের উপর দিয়া হইতে থাকিল; জগদম্বা দাসীকে ভাল করিয়া, ছয়মাস কাল পেটের পীড়া ও অন্যান্য যন্ত্রণায় ভুগিতে হইয়াছিল!"

শ্রীযুক্ত মথুরের ঠাকুরের প্রতি অদ্ভুত প্রেমপূর্ণ-সেবার কথা আলোচনা করিবার সময় ঠাকুর একদিন আমাদিগের নিকট পূর্ব্বোক্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "মথুর যে চৌদ্দ বৎসর সেবা করিয়াছিল তাহা কি অমনি করিয়াছিল?—মা তাহাকে (নিজ শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর দিয়া নানা প্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত সব দেখাইয়াছিলেন, সেই জন্যই সে অত সেবা করিয়াছিল।"

ষোড়শ অধ্যায়।

বেদান্তসাধনের শেষ কথা ও ইসলামধর্ম্মসাধন।

ঠাকুরের কঠিন ব্যাধি। ঐকালে তাঁহার মনের অপূর্ব্ব আচরণ।

জগদম্বা দাসীর সাংঘাতিক পীড়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আরোগ্য করিয়া হউক, অথবা অদ্বৈত-ভাবভূমিতে নিরন্তর অবস্থানের জন্য ঠাকুর দীর্ঘ ছয় মাস কাল পর্য্যন্ত যে অমানুষী চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার ফলেই হউক, তাঁহার দৃঢ় শরীর ভগ্ন হইয়া এখন কয়েক মাস রোগগ্রস্ত হইয়াছিল। তাঁহার নিকটে শুনিয়াছি, ঐ সময়ে তিনি আমাশয় পীড়ায় কঠিন ভাবে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ভাগিনেয় হৃদয় নিরন্তর তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিল, এবং শ্রীযুত মথুর তাঁহাকে সুস্থ ও রোগমুক্ত করিবার জন্য প্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের চিকিৎসা ও পথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু শরীর ঐরূপে ব্যাধিগ্রস্ত হইলেও ঠাকুরের দেহবোধবিবর্জ্জিত মন এখন যে অপূর্ব্ব শান্তি ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে অবস্থান করিত তাহা বলিবার নহে। বিন্দুমাত্র উত্তেজনায় * উহা শরীর, ব্যাধি এবং সংসারের সকল বিষয় হইতে পৃথক্ হইয়া দূরে নির্ব্বিকল্প ভূমিতে এককালে উপনীত হইত, এবং ব্রহ্ম, আত্মা বা ঈশ্বরের স্মরণমাত্রেই অন্য সকল কথা ভুলিয়া তন্ময় হইয়া কিছুকালের জন্য আপনার পৃথগস্তিত্ববোধ সম্পূর্ণ রূপে হারাইয়া ফেলিত। সুতরাং ব্যাধির প্রকোপে শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হইলেও তিনি যে, উহার সামান্যমাত্রই উপলব্ধি করিতেন, একথা বুঝিতে পারা যায়। তবে ঐ ব্যাধির যন্ত্রণা সময়ে সময়ে

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ ২য় অধ্যায়।

তাঁহার মনকে উচ্চভাবভূমি হইতে নামাইয়া শরীরে যে নিবিষ্ট করিত, একথাও আমরা তাঁহার শ্রীমুখে শুনিযাছি। ঠাকুব বলিতেন, এই কালে তাঁহাব নিকটে বেদান্তমার্গবিচবণশীল সাধকাগ্রণী পবমহংস-সকলেব আগমন হইযাছিল এবং 'নেতি নেতি', 'অস্তি-ভাতি-প্রিয়', 'অযমাত্মা ব্রহ্ম' প্রভৃতি বেদান্তপ্রসিদ্ধ তত্ত্বসমূহের বিচাবধ্বনিতে তাঁহাব বাসগৃহ নিবন্তব মুখবিত হইয়া থাকিত।* ঐসকল উচ্চ তত্ত্বেব বিচাব-কালে তাঁহাবা যখন কোন বিষযে সুমীমাংসায উপনীত হইতে পাবিতেন না, ঠাকুবকেই তখন মধ্যস্থ হইয়া উহাব মীমাংসা কবিযা দিতে হইত। বলা বাহুল্য, ইতব সাধাবণেব ন্যায ব্যাধিব প্রকোপে নিবন্তব মুহ্যমান হইযা থাকিলে, কঠোব দার্শনিক বিচাবে ঐরূপে প্রতিনিযত যোগদান কবা তাঁহাব পক্ষে কখনই সম্ভবপব হইত না।

অদ্বৈতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পবে ঠাকুরের দর্শন—ঐ দর্শনের ফলে তাঁহাব উপলব্ধি সমূহ।

আমবা অন্যত্র বলিযাছি, নির্ব্বিকল্প ভূমিতে নিবন্তব অবস্থানকালেব শেষ ভাগে ঠাকুবেব এক বিচিত্র দর্শন বা উপলব্ধি উপস্থিত হইযাছিল। ভাবমুখে অবস্থান কবিবাব জন্য তিনি তৃতীয়বার আদিষ্ট হইযাছিলেন। † 'দর্শন' বলিযা ঐ বিষয়েব উল্লেখ কবিলেও উহা যে তাঁহাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধিব কথা ইহা পাঠক বুঝিযা লইবেন। কাবণ, পূর্ব্ব দুইবাবেব ন্যায ঠাকুর এই কালে কোন দৃষ্ট মূর্ত্তিব মুখে ঐ কথা শ্রবণ কবেন নাই। কিন্তু তুরীয, অদ্বৈততত্ত্বে একেবাবে একীভূত হইযা অবস্থান না কবিযা যখনই তাঁহার মন ঐ তত্ত্ব হইতে কথঞ্চিৎ পৃথক্ হইয়া আপনাকে সগুণ বিবাট ব্রহ্মেব বা শ্রীশ্রীজগদম্বার অংশ বলিযা প্রত্যক্ষ কবিতেছিল

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—২য অধ্যায়।

† এই গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায় দেখ।

তখন উহা ঐ বিরাট-ব্রহ্মের বিরাট-মনে ঐরূপ ভাব বা ইচ্ছার বিদ্যমানতা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছিল।* ঐ উপলব্ধি হইতে তাঁহার মনে নিজ জীবনের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা সম্যক্ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ, শরীর রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিন্দুমাত্র বাসনা অন্তরে না থাকিলেও শ্রীশ্রীজগদম্বার বিচিত্র ইচ্ছায় বারম্বার ভাবমুখে অবস্থান করিতে আদিষ্ট হইয়া ঠাকুর বুঝিয়াছিলেন, নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও ভগবল্লীলাপ্রয়োজনের জন্য তাঁহাকে দেহ রক্ষা করিতে হইবে এবং নিত্যকাল ব্রহ্মে অবস্থান করিলে শরীর থাকা সম্ভবপর নহে বলিয়াই তিনি এখন ঐরূপ করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। জাতিস্মরত্বসহায়ে ঠাকুর এই কালেই সম্যক্ বুঝিয়াছিলেন, তিনি নিত্য-শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত-স্বভাববান্ আধিকারিক অবতার-পুরুষ বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মগ্লানি দূর করিয়া লোককল্যাণসাধনের জন্যই তাঁহাকে দেহধারণ ও তপস্যাদি করিতে হইয়াছে। একথাও তাঁহার এই সময়ে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল, যে, শ্রীশ্রীজগন্মাতা উদ্দেশ্যবিশেষ সাধনের জন্যই একবার তাঁহাকে বাহ্যৈশ্বর্য্যের আড়ম্বরপরিশূন্য ও নিরক্ষর করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে আনয়ন করিয়াছেন, এবং ঐ লীলারহস্য তাঁহার জীবৎকালে স্বল্পলোকে বুঝিতে সমর্থ হইলেও, যে প্রবল আধ্যাত্মিক তরঙ্গ তাঁহার শরীরমনের দ্বারা জগতে উদিত হইবে তাহা সর্ব্বতোভাবে অমোঘ থাকিয়া অনন্তকাল জনসাধারণের কল্যাণসাধন করিতে থাকিবে।

ঐরূপ অসাধারণ উপলব্ধিসকল ঠাকুরের কিরূপে উপস্থিত হইয়াছিল বুঝিতে হইলে শাস্ত্রের কয়েকটি কথা আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে। শাস্ত্র বলেন, অদ্বৈতভাবসহায়ে জ্ঞানস্বরূপে পূর্ণরূপে

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ,—৩য় অধ্যায়।

অবস্থান করিবার পূর্ব্বে সাধক জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়া থাকেন।*

ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পূর্ব্বে সাধকের জাতিস্মরত্ব লাভসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কথা।

অথবা, ঐ ভাবের পরিপাকে তাঁহার স্মৃতি তখন এতদূর পরিণত অবস্থায় উপস্থিত হয় যে, ইতিপূর্ব্বে তিনি যে ভাবে যথায়, যতবার শরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক যাহা কিছু সুকৃত-দুষ্কৃতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সে সকল কথা তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইয়া থাকে। ফলে, সংসারের সকল বিষয়ের নশ্বরতা এবং রূপরসাদি ভোগসুখের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া বারম্বার একই ভাবে জন্মপরিগ্রহের নিষ্ফলতা সম্যক্ প্রত্যক্ষীভূত হইয়া তাঁহার মনে তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং ঐ বৈরাগ্যসহায়ে তাঁহার প্রাণ সর্ব্ববিধ বাসনা হইতে এককালে পৃথক্ হইয়া দণ্ডায়মান হয়।

ব্রহ্মজ্ঞানলাভে সাধকের সর্ব্বপ্রকার যোগবিভূতি ও সিদ্ধসঙ্কল্পত্ব লাভসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কথা।

উপনিষদ্ বলেন। ঐরূপ পুরুষ সিদ্ধসঙ্কল্প হয়েন এবং দেব পিতৃ প্রভৃতি যখন যে লোক প্রত্যক্ষ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয় তখনই তাঁহার মন সমাধি-বলে ঐ সকল লোক্ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। মহামুনি পতঞ্জলি তৎকৃত যোগশাস্ত্রে ঐ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐরূপ পুরুষের সর্ব্ববিধ বিভূতি বা যোগৈশ্বর্য্যের স্বতঃ উদয় হইয়া থাকে। পঞ্চদশীকার সায়ন-মাধব ঐরূপ পুরুষের বাসনারাহিত্য এবং যোগৈশ্বর্য্যলাভ—উভয় কথার সামঞ্জস্য করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐরূপ বচিত্র ঐশ্বর্য্যসকল লাভ করিলেও অন্তরে বিন্দুমাত্র বাসনা না থাকায় তাঁহারা ঐ সকল শক্তি কখনও প্রযোগ করেন না। পুরুষ সংসারে যে অবস্থায় থাকিতে থাকিতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে, জ্ঞানলাভের পরে

* সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানং।—পাতঞ্জলসূত্র, বিভূতিপাদ, ১৮শ সূত্র। ছান্দোগ্যোপনিষৎ—৮ম প্রপাঠক—২য় খণ্ড।

তদবস্থাতেই কালাতিপাত করে। কারণ, চিত্ত সর্ব্বপ্রকারে বাসনাশূন্য হওয়ায় সমর্থ হইলেও ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যকতা সে কিছুমাত্র অনুভব করে না। আধিকারিক পুরুষেরাই * কেবল সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরেচ্ছাধীন থাকিয়া বহুজনহিতায় ঐ শক্তিসকলের প্রয়োগ সময়ে সময়ে করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় কথাসকল স্মরণ রাখিয়া ঠাকুরের বর্ত্তমান জীবনের অনুশীলনে তাঁহার এই কালের বিচিত্র অনুভূতিসকল সম্যক্ না হইলেও অনেকাংশে বুঝিতে পারা যায়। বুঝা যায় যে, তিনি ভগবৎপাদপদ্মে অন্তরের সহিত সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া সর্ব্বপ্রকারে বাসনাপরিশূন্য হইয়াছিলেন বলিয়াই অত স্বল্পকালে ব্রহ্মজ্ঞানের নির্ব্বিকল্প ভূমিতে উঠিতে এবং দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বুঝা যায়, জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়াই তিনি এই-কালে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যিনি 'শ্রীরাম' এবং 'শ্রীকৃষ্ণ'রূপে আবির্ভূত হইয়া লোককল্যাণসাধন করিয়াছিলেন তিনিই বর্ত্তমান কালে পুনরায় শরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক 'শ্রীরামকৃষ্ণ' রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। বুঝা যায়, লোককল্যাণসাধনের জন্য পর-জীবনে তাঁহাতে বিচিত্র বিভূতিসকলের প্রকাশ নিত্য দেখিতে পাইলেও কেন আমরা তাঁহাকে নিজ শরীরমনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ঐ সকল দিব্যশক্তির প্রয়োগ করিতে কখনও দেখিতে পাই না। বুঝা যায়, কেন তিনি সঙ্কল্পমাত্রেই আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি অপরের মধ্যে জাগরিত করিতে সমর্থ হইতেন; এবং কেনই বা তাঁহার দিব্যপ্রভাব দিন দিন পৃথিবীর সকল দেশে অপূর্ব্ব আধিপত্যলাভ করিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র কথা অনুসারে ঠাকুরের জীবনালোচনায় তাঁহার অপূর্ব্ব উপলব্ধি সকলের কারণ বুঝা যায়।

* লোককল্যাণসাধনের জন্য যাঁহারা বিশেষ অধিকার বা শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

অদ্বৈতভাবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভাবরাজ্যে অবরোহণ করিবার কালে ঠাকুর ঐরূপে নিজ জীবনের ভূতভবিষ্যৎ সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ উপলব্ধিসকল তাঁহাতে যে সহসা একদিন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। আমাদিগের অনুমান, ভাবভূমিতে অবরোহণের পরে বৎসরকালের মধ্যে তিনি ঐ সকল কথা সম্যক বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতা ঐ কালে তাঁহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে আবরণের পরে আবরণ উঠাইয়া দিন দিন তাঁহাকে ঐ সকল কথা স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত উপলব্ধিসকল তাঁহার মনে যুগপৎ কেন উপস্থিত হয় নাই তদ্বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমাদিগকে বলিতে হয়—অদ্বৈতভাবে অবস্থানপূর্ব্বক গভীর ব্রহ্মানন্দসম্ভোগে তিনি এইকালে নিরন্তর ব্যাপৃত ছিলেন। সুতরাং যতদিন না তাঁহার মন পুনরায় বহির্মুখী বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল ততদিন ঐ সকল বিষয় উপলব্ধি করিবার তাঁহার অবসর এবং প্রবৃত্তি হয় নাই। ঐরূপে সাধনকালের প্রারম্ভে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকটে যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 'মা আমি কি করিব, তাহা কিছুই জানি না, তুই স্বয়ং আমাকে যাহা শিখাইবি, তাহাই শিখিব'—তাহা এই কালে পূর্ণ হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত উপলব্ধিসকল ঠাকুরের যুগপৎ উপস্থিত না হইবার কারণ।

অদ্বৈত-ভাব-ভূমিতে আরূঢ় হইয়া ঠাকুরের এই কালে আর একটি বিষয়ও উপলব্ধি হইয়াছিল। তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, অদ্বৈতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই সর্ব্ববিধ সাধনভজনের চরম উদ্দেশ্য। কারণ, ভারতের প্রচলিত প্রধান প্রধান সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মতাবলম্বনে সাধন করিয়া তিনি ইতিপূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, উহারা প্রত্যেকেই সাধককে উক্ত ভূমির

অদ্বৈতভাব লাভ করাই সকল সাধনের উদ্দেশ্য বলিয়া ঠাকুরের উপলব্ধি।

দিকে অগ্রসর করে। অদ্বৈতভাবের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেই জন্য আমাদিগকে বারম্বার বলিতেন, 'উহা শেষ কথা রে, শেষ কথা, ঈশ্বর-প্রেমের চরম পরিণতিতে সর্ব্বশেষে উহা সাধক-জীবনে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়; জানিবি, সকল মতেরই উহা শেষ কথা এবং যত মত, তত পথ।'

ঐরূপে অদ্বৈতভাব উপলব্ধি করিয়া ঠাকুরের মন অসীম উদারতা লাভ করিয়াছিল। ঈশ্বরলাভকে যাহারা মানবজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া শিক্ষা প্রদান করে, ঐরূপ সকল সম্প্রদায়ের প্রতি উহা এখন অপূর্ব্ব সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ঐরূপ উদারতা এবং সহানুভূতি যে তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি, এবং পূর্ব্ব যুগের কোন সাধকাগ্রণী যে, উহা তাঁহার ন্যায় পূর্ণভাবে লাভ করিতে সমর্থ হন নাই, এ কথা প্রথমে তাঁহার হৃদয়েঙ্গম হয় নাই। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে এবং প্রসিদ্ধ তীর্থসকলে নানা সম্প্রদায়ের প্রবীণ সাধকসকলের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমে তাঁহার ঐ কথার উপলব্ধি হইয়াছিল। কিন্তু এখন হইতে তিনি ধর্ম্মের একদেশী ভাব অপরে অবলোকন করিলেই প্রাণে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ হীনবুদ্ধি দূর করিতে সর্ব্বতোভাবে সচেষ্ট হইতেন।

পূর্ব্বোক্ত উপলব্ধি তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কেহ পূর্ণভাবে করে নাই।

অদ্বৈতবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঠাকুরের মন এখন কিরূপ উদার ভাবসম্পন্ন হইয়াছিল তাহা আমরা এই কালের একটি ঘটনায় স্পষ্ট বুঝিতে পারি। আমরা দেখিয়াছি, ঐ ভাবসাধনে সিদ্ধ হইবার পরে ঠাকুরের শরীর কয়েক মাসের জন্য রোগাক্রান্ত হইয়াছিল, সেই ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হইবার পরে উল্লিখিত ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল।

অদ্বৈতবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের মনের উদারতা সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত—তাঁহার ইসলামধর্ম্মসাধন।

গোবিন্দ রায় নামক এক ব্যক্তি এই সময়ের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে ধর্ম্মান্বেষণে প্রবৃত্ত হন। হৃদয় বলিত, ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। সম্ভবতঃ পারসী ও আরবী ভাষায় ইঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানা মতামত আলোচনা করিয়া এবং নানা সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া ইনি পরিশেষে ইসলাম ধর্ম্মের উদার মতে আকৃষ্ট হইয়া যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ করেন। ধর্ম্মপিপাসু গোবিন্দ ইসলাম-ধর্ম্মমত গ্রহণ করিলেও উহার সামাজিক নিয়মপদ্ধতি কতদূর অনুসরণ করিতেন, বলিতে পারি না। কিন্তু দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অবধি তিনি যে, কোরাণ পাঠ এবং তদুক্ত প্রণালীতে সাধনভজনে মহোৎসাহে নিযুক্ত ছিলেন, একথা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। গোবিন্দ প্রেমিক ছিলেন। বোধ হয়, ইসলামের সুফি সম্প্রদায়ের প্রচলিত শিক্ষা এবং ভাবসহায়ে ঈশ্বরের উপাসনা করিবার পদ্ধতি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। কারণ, ঐ সম্প্রদায়ের দরবেশদিগের মত তিনি এখন ভাবসাধনে অহোরাত্র নিযুক্ত থাকিতেন।

সুফি গোবিন্দ রায়ের আগমন।

যেরূপেই হউক, গোবিন্দ এখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত হয়েন এবং সাধনানুকূল স্থান বুঝিয়া পঞ্চবটীর শান্তিপ্রদ ছায়ায় আসনবিস্তীর্ণ করিয়া কিছুকাল কাটাইতে থাকেন। রাণী রাসমণির কালীবাটীতে তখন হিন্দু সংসারত্যাগীদের ন্যায় মুসলমান ফকীরগণেরও সমাদর ছিল, এবং জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের ত্যাগী ব্যক্তিদিগের প্রতি এখানে সমভাবে আতিথ্য প্রদর্শন করা হইত। অতএব এখানে থাকিবার কালে গোবিন্দের অন্যত্র ভিক্ষাটনাদি করিতে হইত না এবং ইষ্টচিন্তায় নিযুক্ত হইয়া তিনি সানন্দে দিন যাপন করিতেন।

প্রেমিক গোবিন্দকে দেখিয়া ঠাকুর তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়েন, এবং

তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সরল বিশ্বাস ও প্রেমে মুগ্ধ হয়েন। ঐরূপে ঠাকুরের মন এখন ইসলাম-ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তিনি ভাবিতে থাকেন, 'ইহাও ত ঈশ্বরলাভের এক পথ, অনন্ত-লীলাময়ী মা এপথ দিয়াও ত কত লোককে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মলাভে ধন্য করিতেছেন, কিরূপে তিনি এই পথ দিয়া তাঁহার আশ্রিতদিগকে কৃতার্থ করেন তাহা দেখিতে হইবে, গোবিন্দের নিকট দীক্ষিত হইয়া এভাব সাধনে নিযুক্ত হইব।'

গোবিন্দের সহিত আলাপ করিয়া ঠাকুরের সঙ্কল্প।

যে চিন্তা, সেই কাজ। ঠাকুর গোবিন্দকে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এবং দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যথাবিধি ইসলামধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঠাকুর বলিতেন, "ঐ সময়ে 'আল্লা' মন্ত্র জপ করিতাম, মুসলমানদিগের ন্যায় কাছা খুলিয়া কাপড় পরিতাম, ত্রিসন্ধ্যা নমাজ পড়িতাম, এবং হিন্দুভাব মন হইতে এককালে লুপ্ত হওয়ায় হিন্দুর দেবদেবীকে প্রণাম দূরে থাকুক, দর্শন পর্য্যন্ত করিতে প্রবৃত্তি হইত না। ঐভাবে তিন দিবস অতিবাহিত হইবার পরে ঐ মতের সাধনফল সম্যক হস্তগত হইয়াছিল।" ইসলাম-ধর্ম্মসাধনকালে ঠাকুর প্রথমে এক দীর্ঘশ্মশ্রুবিশিষ্ট, সুগম্ভীর জ্যোতির্ম্ময় পুরুষপ্রবরের দিব্যদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। পরে সগুণ বিরাট ব্রহ্মের উপলব্ধিপূর্ব্বক তুরীয় নিগুর্ণব্রহ্মে তাঁহার মন লীন হইয়া গিয়াছিল।

গোবিন্দের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাধনে ঠাকুরের সিদ্ধিলাভ।

হৃদয় বলিত, মুসলমানধর্ম্মসাধনের সময় ঠাকুর, মুসলমানদিগের প্রিয় খাদ্যসকল, এমন কি গো মাংস পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। মথুরামোহনের সানুনয় অনুরোধই তখন তাঁহাকে ঐ কর্ম্ম হইতে নিরস্ত করিয়াছিল। বালকস্বভাব ঠাকুরের ঐরূপ ইচ্ছা অন্ততঃ আংশিক

মুসলমানধর্ম্ম সাধনকালে ঠাকুরের আচরণ।

পূর্ণ না হইলে তিনি কখন নিরস্ত হইবেন না ভাবিয়া মথুর ঐ সময়ে এক মুসলমান পাচক আনাইয়া তাহার নির্দ্দেশে এক ব্রাহ্মণের দ্বারা মুসলমানদিগের প্রণালীতে খাদ্যসকল রন্ধন করাইয়া ঠাকুরকে খাইতে দিয়াছিলেন। মুসলমানধর্ম্ম সাধনের সময় ঠাকুর কালীবাটীর অভ্যন্তরে একবারও পদার্পণ করেন নাই। উহার বাহিরে অবস্থিত মথুরামোহনের কুঠিতেই বাস করিয়াছিলেন।

ভারতের হিন্দু ও মুসলমান জাতি কালে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে ঠাকুরের ইসলামমত সাধনে ঐ বিষয় বুঝা যায়।

বেদান্তসাধনে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুরের মন অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি কিরূপ সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় বুঝিতে পারা যায় এবং একমাত্র বেদান্তবিজ্ঞানে বিশ্বাসী হইয়াই যে, ভারতের হিন্দু ও মুসলমানকুল পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন এবং ভ্রাতৃভাবে নিবদ্ধ হইতে পারে একথাও হৃদয়ঙ্গম হয়। নতুবা ঠাকুর যেমন বলিতেন 'হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যেন একটা পর্ব্বত ব্যবধান রহিয়াছে—পরস্পরের চিন্তাপ্রণালী, ধর্ম্মবিশ্বাস ও কার্য্যকলাপ এতকাল একত্রবাসেও পরস্পরের নিকট সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য হইয়া রহিয়াছে।' ঐ পাহাড় যে একদিন অন্তর্হিত হইবে এবং উভয়ে প্রেমে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিবে, যুগাবতার ঠাকুরের মুসলমানধর্ম্মসাধন কি তাহারই সূচনা করিয়া যাইল?

পরবর্ত্তীকালে ঠাকুরের মনে অদ্বৈতস্মৃতি কতদূর প্রবল ছিল।

নির্ব্বিকল্প ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে ঠাকুরের এখন, দ্বৈতভূমির সীমান্তরালে অবস্থিত বিষয় ও ব্যক্তিসকলকে দেখিয়া অদ্বৈতস্মৃতি অনেক সময় সহসা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিত এবং তাঁহাকে তুরীয়ভাবে লীন করিত। সঙ্কল্প না করিলেও সামান্য মাত্র উদ্দীপনায় আমরা তাঁহার ঐরূপ অবস্থা উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি। অতএব এখন হইতে তিনি সঙ্কল্প করিবামাত্র যে, ঐ ভূমিতে আরোহণে

সমর্থ ছিলেন, একথা বলা বাহুল্য। অদ্বৈতভাব যে তাঁহার কতদূর অন্তরের পদার্থ ছিল তাহা উহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ঐরূপ কয়েকটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন ঐ ভাব তাঁহার হৃদয়ে যেমন অবগাহ তেমনই দূরপ্রসারী ছিল।

ঐ বিষয়ক কয়েকটি দৃষ্টান্ত—(১) বৃদ্ধ ঘেসেড়া।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর প্রশস্ত উদ্যান বর্ষাকালে তৃণাচ্ছন্ন হওয়ায় মালিদিগের তরিতরকারি বপনের বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে। তজ্জন্য ঘেসেড়াদিগকে ঐ সময়ে ঘাস কাটিয়া লইবার অনুমতি প্রদান করা হয়। একজন বৃদ্ধ ঘেসেড়া একদিন ঐরূপে বিনামূল্যে ঘাস লইবার অনুমতিলাভে সানন্দে সারাদিন ঐকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া অপরাহ্নে মোট বাঁধিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইবার উপক্রম করিতেছিল। ঠাকুর দেখিতে পাইলেন, লোভে পড়িয়া সে এত ঘাস কাটিয়াছে যে, ঐ ঘাসের বোঝা লইয়া যাওয়া বৃদ্ধের শক্তিতে সম্ভবে না। দরিদ্র ঘেসেড়া কিন্তু ঐ বিষয় কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া বৃহৎ বোঝাটি মাথায় তুলিয়া লইবার জন্য নানারূপে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও উহা উঠাইতে পারিতেছিল না। ঐ বিষয় দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। ভাবিলেন, অন্তরে পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ আত্মা বিদ্যমান এবং বাহিরে এত নির্বুদ্ধিতা, এত অজ্ঞান! 'হে রাম, তোমার বিচিত্র লীলা!' বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন।

(২) আহত পতঙ্গ।

একদিন ঠাকুর দেখিলেন একটি পতঙ্গ (ফড়িং) উড়িয়া আসিতেছে এবং উহার গুহ্যদেশে একটি লম্বা কাটি বিদ্ধ রহিয়াছে। কোন দুষ্ট বালক ঐরূপ করিয়াছে ভাবিয়া তিনি প্রথমে ব্যথিত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবাবিষ্ট

হইয়া 'হে রাম, তুমি আপনার দুর্দ্দশা আপনি করিয়াছ' বলিয়া হাস্যের রোল উঠাইলেন!

কালীবাটীর উদ্যানের স্থানবিশেষ নবীন দূর্ব্বাদলে সমাচ্ছন্ন হইয়া এক সময়ে রমণীয়দর্শন হইয়াছিল। ঠাকুর উহা দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া এতদূর তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, ঐ স্থানকে সর্ব্বতোভাবে নিজ অঙ্গ বলিয়া অনুভব করিতেছিলেন। সহসা এক ব্যক্তি ঐ সময়ে ঐস্থানের উপর দিয়া অন্যত্র গমন করিতে লাগিল। তিনি উহাতে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিয়া এককালে অস্থির হইয়া পড়িলেন। ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন 'বুকের উপর দিয়া কেহ চলিয়া যাইলে যেমন যন্ত্রণার অনুভব হয়, ঐকালে ঠিক সেইরূপ যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিলাম। ঐরূপ ভাবাবস্থা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক, আমার উহা ছয় ঘণ্টাকাল মাত্র ছিল, তাহাতেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম।'

(৩) পদদলিত নবীন দূর্ব্বাদল।

কালীবাটীর চাঁদ্‌নি-সমাযুক্ত বৃহৎ ঘাটে দণ্ডায়মান হইয়া ঠাকুর একদিন ভাবাবেশে গঙ্গাদর্শন করিতেছিলেন। ঘাটে তখন দুই-খানি নৌকা লাগিয়াছিল এবং মাঝিরা কোন বিষয় লইয়া পরস্পর কলহ করিতেছিল। কলহ ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়া সবল ব্যক্তি দুর্ব্বলের পৃষ্ঠদেশে বিষম চপেটাঘাত করিল। ঠাকুর উহাতে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার ঐরূপ কাতর ক্রন্দন কালীঘরে হৃদয়ের কর্ণে সহসা প্রবেশ করায় সে দ্রুতপদে তথায় আগমনপূর্ব্বক দেখিল, তাঁহার পৃষ্ঠদেশ আরক্তিম হইয়াছে এবং ফুলিয়া উঠিয়াছে। ক্রোধে অধীর হইয়া হৃদয় বারম্বার বলিতে লাগিল, 'মামা, কে তোমায় মারিয়াছে দেখাইয়া

(৪) নৌকার মাঝিদ্বয়ের পরস্পর কলহে ঠাকুরের নিজ শরীরে আঘাতানুভব।

দাও, আমি তার মাথাটা ছিঁড়িয়া লই।' পরে ঠাকুর কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে মাঝিদিগের বিবাদ হইতে তাঁহার পৃষ্ঠে আঘাতজনিত বেদনাচিহ্ন উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, ইহাও কি কখন সম্ভবপর! ঘটনাটি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ঠাকুরের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন ঠাকুরের সম্বন্ধে ঐরূপ অনেক ঘটনার * উল্লেখ করা যাইতে পারে।

---

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ,—২য় অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

জন্মভূমিসন্দর্শন।

প্রায় ছয়মাস কাল ভুগিয়া ঠাকুরের শরীর অবশেষে ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হইল, এবং মন ভাবমুখে দ্বৈতাদ্বৈতভূমিতে অবস্থান করিতে অনেকাংশে অভ্যস্ত হইয়া আসিল। কিন্তু তাঁহার শরীর তখনও পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থ ও সবল হয় নাই। সুতরাং বর্ষাগমে গঙ্গার জল লবণাক্ত হইলে বিশুদ্ধ পানীয়ের অভাবে তাঁহার পেটের পীড়া পুনরায় দেখা দিবার সম্ভাবনা ভাবিয়া মথুরবাবু প্রমুখ সকলে স্থির করিলেন, তাঁহার কয়েকমাসের জন্য জন্মভূমি কামারপুকুরে গমন করাই শ্রেয়ঃ। তখন সন ১২৭৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস হইবে। মথুর-পত্নী ভক্তিমতী জগদম্বা দাসী, ঠাকুরের কামার-পুকুরের সংসার শিবের সংসারের ন্যায় চির-দরিদ্র বলিয়া জানিতেন। অতএব সেখানে যাইয়া 'বাবা'কে যাহাতে কোন দ্রব্যের অভাবে কষ্ট পাইতে না হয়, এই প্রকারে তন্ন তন্ন করিয়া সকল বিষয় গুছাইয়া তাঁহার সঙ্গে দিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। * অনন্তর শুভমুহূর্ত্তের উদয় হইলে, ঠাকুর যাত্রা করিলেন। হৃদয় ও ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁহার সঙ্গে যাইল। তাঁহার বৃদ্ধা জননী কিন্তু গঙ্গাতীরে বাস করিবেন বলিয়া ইতিপূর্ব্বে যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহাই স্থির রাখিয়া দক্ষিণেশ্বরে বাস করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে প্রায় আট বৎসরকাল ঠাকুর কামার-

ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও হৃদয়ের সহিত ঠাকুরের কামারপুকুরে গমন।

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ ১ম অধ্যায়।

পুকুরে আগমন করেন নাই, সুতরাং তাঁহার আত্মীয়বর্গ যে তাঁহাকে দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছিলেন একথা বলা বাহুল্য। কখনও স্ত্রীবেশ ধরিয়া 'হরি হরি' করিতেছেন, কখনও সন্ন্যাসী হইয়াছেন, কখনও 'আল্লা আল্লা' বলিতেছেন, প্রভৃতি তাঁহার সম্বন্ধে নানা কথা মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হওয়ায় ঐরূপ হইবার বিশেষ কারণ যে ছিল একথা বলিতে হইবে না। কিন্তু ঠাকুর তাঁহাদিগের মধ্যে আসিবামাত্র তাঁহাদিগের চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল। তাঁহারা দেখিলেন, তিনি পূর্ব্বে যেমন ছিলেন এখনও তদ্রূপ আছেন। সেই অমায়িকতা, সেই প্রেমপূর্ণ হাস্য-পরিহাস, সেই কঠোর সত্যনিষ্ঠা, সেই ধর্ম্মপ্রাণতা, সেই হরি-নামে বিহ্বল হইয়া আত্মহারা হওয়া—সেই সকলই তাঁহাতে পূর্ব্বের ন্যায় পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে, কেবল কি একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় দিব্যাবেশ তাঁহার শরীরমনকে সর্ব্বদা এমন সমুদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে যে সহসা তাঁহার সম্মুখীন হইতে, এবং তিনি স্বয়ং ঐরূপ না করিলে ক্ষুদ্র সংসারের বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিতে, তাঁহাদিগের অন্তরে বিষম সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হয়। তদ্ভিন্ন অন্য এক বিষয় তাঁহারা এখন বিশেষরূপে এই ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহার নিকটে থাকিলে সংসারের সকল দুর্ভাবনা কোথায় অপসারিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রাণে একটি ধীর স্থির আনন্দ ও শান্তির ধারা প্রবাহিত থাকে এবং দূরে যাইলে পুনরায় তাঁহার নিকটে যাইবার জন্য একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে তাঁহারা প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েন। সে যাহা-হউক, বহুকাল পরে তাঁহাকে পাইয়া এই দরিদ্র সংসারে এখন আনন্দের হাটবাজার বসিল, এবং নববধূকে আনাইয়া সুখের মাত্রা

ঠাকুরকে তাহার আত্মীয় বন্ধুগণ যেভাবে দেখিয়াছিল।

পূর্ণ করিবার জন্য রমণীগণের নির্দ্দেশে ঠাকুরের শ্বশুরালয় জয়রামবাটী গ্রামে লোক প্রেরিত হইল। ঠাকুর এ বিষয় জানিতে পারিয়া উহাতে বিশেষ সম্মতি বা আপত্তি কিছুই প্রকাশ করিলেন না। বিবাহের পর নববধূর ভাগ্যে একবার মাত্র স্বামিসন্দর্শন লাভ হইয়াছিল। কারণ তাঁহার সপ্তম বর্ষ বয়সকালে কুলপ্রথানুসারে ঠাকুরকে একদিন জয়রামবাটীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তখন তিনি নিতান্ত বালিকা, সুতরাং ঐ ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহার এইটুকুমাত্রই মনে ছিল যে, হৃদয়ের সহিত ঠাকুর তাঁহার পিত্রালয়ে আসিলে বাটীর কোন নিভৃত অংশে তিনি লুকাইয়াও পরিত্রাণ পান নাই। কোথা হইতে অনেকগুলি পদ্মফুল আনিয়া হৃদয় তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল এবং লজ্জা ও ভয়ে তিনি নিতান্ত সঙ্কুচিতা হইলেও তাঁহার পাদপদ্ম পূজা করিয়াছিল। ঐ ঘটনার প্রায় ছয় বৎসর পরে তাঁহার ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহাকে কামারপুকুরে প্রথম লইয়া যাওয়া হয়। সেবার তাঁহাকে তথায় একমাস থাকিতেও হইয়াছিল। কিন্তু, ঠাকুর ও ঠাকুরের জননী তখন দক্ষিণেশ্বরে থাকায় উভয়ের কাহাকেও দেখা তাঁহার ভাগ্যে হইয়া উঠে নাই। উহার ছয় মাস আন্দাজ পরে পুনরায় শ্বশুরালয়ে আগমন পূর্ব্বক দেড়মাস কাল থাকিয়াও পূর্ব্বোক্ত কারণে তিনি তাঁহাদের কাহাকেও দেখিতে পান নাই। মাত্র তিন চারি মাস তাঁহার তথা হইতে পিত্রালয়ে ফিরিবার পরেই এখন সংবাদ আসিল—ঠাকুর আসিয়াছেন, তাঁহাকে কামারপুকুরে যাইতে হইবে। তিনি তখন ছয় সাত মাস হইল চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। সুতরাং বলিতে গেলে বিবাহের পরে ইহাই তাঁহার প্রথম স্বামিসন্দর্শন।

শ্রীশ্রীমার কামারপুকুরে আগমন।

কামারপুকুরে ঠাকুর এবার ছয় সাত মাস ছিলেন। তাঁহার বাল্যবন্ধুগণ এবং গ্রামস্থ পরিচিত স্ত্রী-পুরুষ সকলে তাঁহার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় মিলিত হইয়া তাঁহার প্রীতিসম্পাদনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুরও বহুকাল পরে তাঁহাদিগকে দেখিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রমের পর অবসরলাভে চিন্তাশীল মনীষিগণ বালকবালিকাদিগের অর্থহীন উদ্দেশ্যরহিত ক্রীড়াদিতে যোগদান করিয়া যেরূপ আনন্দ অনুভব করেন, কামারপুকুরের স্ত্রী পুরুষ সকলের ক্ষুদ্র সাংসারিক জীবনে যোগদান করিয়া ঠাকুরের বর্ত্তমান আনন্দ তদ্রূপ হইয়াছিল। তবে, ইহজীবনের নশ্বরতা অনুভব করিয়া যাহাতে তাহারা সংসারে থাকিয়াও ধীরে ধীরে সংযত হইতে এবং সকল বিষয়ে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষালাভ করে তদ্বিষয়ে তিনি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন, একথা নিশ্চয় বলা যায়। ক্রীড়া, কৌতুক, হাস্য, পরিহাসের ভিতর দিয়া তিনি আমাদিগকে নিরন্তর ঐ সকল বিষয় যে ভাবে শিক্ষা দিতেন তাহা হইতে আমরা পূর্ব্বোক্ত কথা অনুমান করিতে পারি।

আত্মীয়বর্গ ও বাল্যবন্ধুগণের সহিত ঠাকুরের এই কালের আচরণ।

আবার, এই ক্ষুদ্র পল্লীর অন্তর্গত ক্ষুদ্র সংসারে থাকিয়া কেহ কেহ ধর্ম্মজীবনে আশাতীত অগ্রসর হইয়াছে দেখিয়া তিনি ঈশ্বরের অচিন্ত্য মহিমা-ধ্যানে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ঐ বিষয়ক একটি ঘটনার তিনি বহুবার আমাদিগের নিকট উল্লেখ করিতেন—

ঠাকুর বলিতেন, এই সময়ে একদিন তিনি আহারান্তে নিজ গৃহে বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রতিবেশিনী কয়েকটি রমণী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন এবং নিকটে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানা প্রশ্নালাপে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ সময় সহসা তাঁহার ভাবাবেশ হয় এবং অনুভূতি হইতে থাকে তিনি যেন মীনরূপে

উহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা।

সচ্চিদানন্দসাগরে পরমানন্দে ভাসিতেছেন, ডুবিতেছেন এবং নানা ভাবে সন্তরণে ক্রীড়া করিতেছেন। কথা কহিতে কহিতে তিনি অনেক সময়ে ঐরূপে ভাবাবেশে মগ্ন হইতেন, সুতরাং রমণীগণ উহাতে কিছুমাত্র মন না দিয়া উপস্থিত বিষয়ে নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে একজন তাঁহাদিগকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিয়া ঠাকুরের ভাবাবেশ যতক্ষণ না ভঙ্গ হয়, ততক্ষণ স্থির হইয়া থাকিতে বলিলেন। বলিলেন, 'উনি (ঠাকুর) এখন মীন হইয়া সচ্চিদানন্দসাগরে সন্তরণ দিতেছেন, গোলমাল করিলে উহার ঐ আনন্দে ব্যাঘাত হইবে!' রমণীর কথায় অনেকে তখন বিশ্বাস স্থাপন না করিলেও সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে ভাবভঙ্গে ঠাকুরকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "রমণী সত্যই বলিয়াছে। আশ্চর্য্য, কিরূপে ঐ বিষয় জানিতে পারিল।"

কামারপুকুর পল্লীস্থ নরনারীর দৈনন্দিন জীবন ঠাকুরের নিকটে এখন যে অনেকাংশে নবীন বলিয়া বোধ হইয়াছিল একথা বুঝিতে পারা যায়। বিদেশ হইতে বহুকাল পরে প্রত্যাগত ব্যক্তির, স্বদেশের প্রত্যেক ব্যক্তি ও বিষয়কে যেমন নূতন বলিয়া বোধ হয় ঠাকুরের এখন অনেকটা তদ্রূপ হইয়াছিল। কারণ, ঐ কেবল আট বৎসরকাল মাত্র জন্মভূমি হইতে দূরে থাকিলেও ঐ কালের মধ্যে ঠাকুরের অন্তরে সাধনার প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া উহাতে আমূল পরিবর্তন উপস্থিত করিয়াছিল। ঐ সময়ে তিনি আপনাকে ভুলিয়াছিলেন, জগৎ ভুলিয়াছিলেন এবং দূরাৎ সুদূরে—দেশকালের সীমার বহির্ভাগে যাইয়া উহার ভিতরে পুনরায় ফিরিবার কালে সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া আগমনপূর্ব্বক

কামারপুকুরবাসীদিগকে ঠাকুরের অপূর্ব্ব নূতন ভাবে দেখিবার কারণ।

সকল ব্যক্তি ও বিষয়কে অপূর্ব্ব নবীন ভাবে দেখিতে পাইয়াছিলেন। চিন্তাশ্রেণীসমূহের পারম্পর্য্য হইতেই আমাদিগের কালের অনুভূতি এবং উহার দৈর্ঘ্য স্বল্পতাদি পরিমাণের উপলব্ধি হইয়া থাকে, একথা দর্শনপ্রসিদ্ধ। ঐ জন্য স্বল্পকালের মধ্যে প্রভূত চিন্তারাশি অন্তরে উদয় ও লয় হইলে ঐ কাল আমাদিগের নিকট সুদীর্ঘ বলিয়া প্রতীতি হয়। পূর্ব্বোক্ত আট বৎসরে ঠাকুরের অন্তরে কি বিপুল চিন্তারাশি প্রকটিত হইয়াছিল তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। সুতরাং ঐ কালকে তাঁহার যে এক যুগতুল্য বলিয়া অনুভব হইবে, ইহা বিচিত্র নহে।

কামারপুকুরে স্ত্রী-পুরুষ সকলকে ঠাকুর কি অদ্ভুত প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। গ্রামের জমীদার, লাহাবাবুদের বাটী হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ, কামার, সূত্রধর, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি সকল জাতীয় প্রতিবেশিগণের পরিবার-ভুক্ত স্ত্রী-পুরুষদিগের সকলেই তাঁহার সহিত শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রেমসম্বন্ধে নিয়ন্ত্রিত ছিল। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস লাহার সরল হৃদয়া ভক্তিমতী বিধবা কন্যা প্রসন্ন ও ঠাকুরের বাল্যসখা, তৎপুত্র গয়াবিষ্ণু লাহা, সরল বিশ্বাসী শ্রীনিবাস শাঁখারী, পাইনদের বাটীর ভক্তিপরায়ণা রমণীগণ, ঠাকুরের ভিক্ষামাতা কামারকন্যা ধনী প্রভৃতি অনেকের ভক্তিভালবাসার কথা ঠাকুর বিশেষ প্রীতির সহিত অনেক সময়ে আমাদিগকে বলিতেন, এবং আমরাও শুনিয়া মুগ্ধ হইতাম। ইঁহারা সকলে প্রায় সর্ব্বক্ষণ তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিতেন। বিষয় বা গৃহকর্ম্মের অনুরোধে যাঁহারা ঐরূপ করিতে পারিতেন না, তাঁহারা সকাল, সন্ধ্যা বা মধ্যাহ্নে অবসর পাইলেই আসিয়া উপস্থিত হইতেন। রমণীগণ তাঁহাকে ভোজন করাইয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন, তজ্জন্য নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী

জন্মভূমির সহিত ঠাকুরের চিরপ্রেমসম্বন্ধ।

নিজ সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেন। গ্রামবাসীদিগের ঐ সকল মধুর আচরণ, এবং আত্মীয় স্বজনের মধ্যে থাকিয়াও ঠাকুর নিরন্তর কিরূপ দিব্য ভাবাবেশে থাকিতেন, সে সকল কথার আভাস আমরা অন্যত্র পাঠককে দিয়াছি,* সেজন্য পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কামারপুকুরে আসিয়া ঠাকুর এই সময়ে একটি সুমহৎ কর্ত্তব্য পালনে যত্নপরায়ণ হইয়াছিলেন। নিজ পত্নীর তাঁহার নিকটে আসা না আসা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলেও যখন তিনি তাঁহার সেবা করিতে কামারপুকুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ঠাকুর তখন তাঁহাকে শিক্ষাদীক্ষাদি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার কল্যাণসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন। ঠাকুরকে বিবাহিত জানিয়া শ্রীমদাচার্য্য তোতাপুরী তাঁহাকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "তাহাতে আসে যায় কি? স্ত্রী নিকটে থাকিলেও যাহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান, সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই যিনি সমভাবে আত্মা বলিয়া সর্ব্বক্ষণ দৃষ্টি ও তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইয়াছে; স্ত্রীপুরুষে ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন অপর সকলে সাধক হইলেও ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে বহুদূরে রহিয়াছে।" শ্রীমৎ তোতার পূর্ব্বোক্ত কথা ঠাকুরের স্মরণপথে উদিত হইয়া তাঁহাকে বহুকালব্যাপী সাধনলব্ধ নিজ বিজ্ঞানের পরীক্ষায় এবং নিজ পত্নীর কল্যাণসাধনে নিযুক্ত করিয়াছিল।

ঠাকুরের নিজ পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্যপালনের আরম্ভ।

কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইলে ঠাকুর কখনও কোনও কার্য্য

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—১ম অধ্যায়।

উপেক্ষা করিতে বা অৰ্দ্ধসম্পন্ন করিয়া ফেলিয়া রাখিতে পারিতেন না, বর্ত্তমান বিষয়েও তদ্রূপ হইয়াছিল। ঐহিক পারত্রিক সকল বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার মুখাপেক্ষী বালিকা পত্নীকে শিক্ষা প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়া তিনি ঐ বিষয় অৰ্দ্ধনিষ্পন্ন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। দেবতা, গুরু ও অতিথিপ্রভৃতির সেবা ও গৃহকর্ম্মে যাহাতে তিনি কুশলা হয়েন, টাকার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, এবং সর্ব্বোপরি ঈশ্বরে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া দেশ কাল পাত্র ভেদে সকলের সহিত ব্যবহার করিতে নিপুণা হইয়া উঠেন * তদ্বিষয়ে এখন হইতে তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। অখণ্ডব্রহ্মচর্য্যসম্পন্ন নিজ আদর্শ জীবন সম্মুখে রাখিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ শিক্ষাপ্রদানের ফল কতদূর কিরূপ হইয়াছিল তদ্বিষয়ের আমরা অন্যত্র আভাস প্রদান করিয়াছি। অতএব এখানে সংক্ষেপে ইহাই বলিলে চলিবে যে শ্রীমতী মাতা-ঠাকুরাণী, ঠাকুরের কামগন্ধরহিত বিশুদ্ধ প্রেমলাভে সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্তা হইয়া সাক্ষাৎ ইষ্টদেবতাজ্ঞানে ঠাকুরকে আজীবন পূজা করিতে এবং তাঁহার শ্রীপাদানুসারিণী হইয়া নিজ জীবন গড়িয়া তুলিতে সমর্থা হইয়াছিলেন।

ঐ বিষয়ে ঠাকুর কতদূর সুসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্যপালনে অগ্রসর ঠাকুরকে ভৈরবী ব্রাহ্মণী এখন অনেক সময় বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীমৎ তোতার সহিত মিলিত হইয়া ঠাকুরের সন্ন্যাসগ্রহণ করিবার কালে তিনি, তাঁহাকে ঐ কর্ম্ম হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। † তাঁহার মনে হইয়াছিল, সন্ন্যাসী হইয়া অদ্বৈততত্ত্বের সাধনে অগ্রসর হইলে ঠাকুরের হৃদয় হইতে ঈশ্বরপ্রেমের এককালে উচ্ছেদ হইয়া যাইবে।

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—২য় অধ্যায় এবং ৪র্থ অধ্যায়।
† গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—২য় অধ্যায়।

ঐরূপ কোন আশঙ্কাই এই সময়ে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। বোধ হয় তিনি ভাবিয়াছিলেন, ঠাকুর নিজ পত্নীর সহিত ঐরূপ ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইলে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের হানি হইবে। ঠাকুর কিন্তু পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারেও ব্রাহ্মণীর উপদেশ রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণী যে উহাতে নিতান্ত ক্ষুণ্ণা হইয়াছিলেন একথা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ঐরূপেই এই বিষয়ের পরিসমাপ্তি হয় নাই। ঐ ঘটনায় তাঁহার অভিমান প্রতিহত হইয়া ক্রমে অহঙ্কারে পরিণত হইয়াছিল এবং কিছুকালের জন্য উহা তাঁহাকে ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীনা করিয়াছিল। হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি, সময়ে সময়ে তিনি ঐ বিষয়ের প্রকাশ্য পরিচয় পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া বসিতেন। যথা—আধ্যাত্মিক বিষয়ে কোন প্রশ্ন তাঁহার সমীপে উত্থাপন করিয়া যদি কেহ বলিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার মতামত গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণী ক্রুদ্ধা হইয়া বলিয়া বসিতেন, 'সে আবার বলিবে কি? তাহার চক্ষুদান ত আমিই করিয়াছি!' অথবা, সামান্য কারণে এবং সময়ে সময়ে বিনা কারণে বাটীর স্ত্রীলোকদিগের উপরে অসন্তুষ্ট হইয়া তিরস্কার করিয়া বসিতেন। ঠাকুর কিন্তু তাঁহার ঐরূপ কথা বা অন্যায় অত্যাচারে অবিচলিত থাকিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে বিরত হয়েন নাই। তাঁহার নির্দ্দেশে শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী শ্বশ্রূতুল্যা জানিয়া ভক্তিপ্রীতির সহিত সর্ব্বদা ব্রাহ্মণীর সেবাদিতে নিযুক্ত থাকিতেন এবং তাঁহার কোন কথা বা কার্য্যের কখনও প্রতিবাদ করিতেন না।

পত্নীর প্রতি ঠাকুরের ঐরূপ আচরণ দর্শনে ব্রাহ্মণীর আশঙ্কা ও ভাবান্তর।

অভিমান, অহঙ্কার বৃদ্ধি পাইলে বুদ্ধিমান মনুষ্যেরও মতিভ্রম উপস্থিত হয়। অতএব ঐরূপ অহঙ্কার পদে পদে প্রতিহত হইতে

দেখিয়াই মানব উহার বিপরীত ফল অবশ্যম্ভাবী বলিয়া জানিতে পারে এবং উহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ কল্যাণসাধনের অবসর লাভ করে। বিদুষী সাধিকা ব্রাহ্মণীরও এখন ঐরূপ হইয়াছিল। অহঙ্কারের বশবর্ত্তিনী হইয়া তিনি, 'যেখানে যেমন, সেখানে তেমন' ব্যবহার করিতে না পারিয়া এই সময়ে একদিন বিষম অনর্থ উপস্থিত করিয়াছিলেন—

অভিমান, অহঙ্কারের বৃদ্ধিতে ব্রাহ্মণীর বুদ্ধি নাশ।

শ্রীনিবাসী শাঁখারীর কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। উচ্চ জাতিতে জন্ম পরিগ্রহ না করিলেও শ্রীনিবাসী ভগবদ্ভক্তিতে অনেক ব্রাহ্মণের অপেক্ষা বড় ছিলেন। শ্রীশ্রীরঘুবীরের প্রসাদ পাইবার জন্য ইনি একদিন এই সময়ে ঠাকুরের সমীপে আগমন করেন। ভক্ত শ্রীনিবাসকে পাইয়া ঠাকুর এবং তাঁহার পরিবারবর্গের সকলে সেদিন বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। ভক্তিমতী ব্রাহ্মণীও শ্রীনিবাসের বিশ্বাস ভক্তি দর্শনে পরিতুষ্টা হইয়াছিলেন। মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত নানা ভক্তিপ্রসঙ্গে অতিবাহিত হইল এবং শ্রীশ্রীরঘুবীরের ভোগরাগাদি সম্পূর্ণ হইলে শ্রীনিবাস প্রসাদ পাইতে বসিলেন। ভোজনান্তে প্রচলিত প্রথামত তিনি আপন উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলে ব্রাহ্মণী তাঁহাকে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন 'আমরাই উহা করিব এখন।' ব্রাহ্মণী বারম্বার ঐরূপ বলায় শ্রীনিবাস অগত্যা নিরস্ত হইয়া নিজ বাটীতে গমন করিলেন।

ঐ বিষয়ক ঘটনা।

সমাজ-প্রবল পল্লীগ্রামে সামান্য সামাজিক নিয়মভঙ্গ লইয়া অনেক সময় বিষম গণ্ডগোল এবং দলাদলির সৃষ্টি হইয়া থাকে। এখনও ঐরূপ হইবার উপক্রম হইল। কারণ, ব্রাহ্মণকন্যা ভৈরবী শ্রীনিবাসের

ব্রাহ্মণীর সহিত হৃদয়ের কলহ।

উচ্ছিষ্ট মোচন করিবেন, এই বিষয় লইয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে সমাগতা পল্লীবাসিনী ব্রাহ্মণকন্যাগণ বিশেষ আপত্তি করিতে লাগিলেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁহাদের ঐরূপ আপত্তি স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না। ক্রমে গণ্ডগোল বাড়িয়া উঠিল এবং ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয় ঐ কথা শুনিতে পাইল। সামান্য বিষয় লইয়া বিষম গোল বাধিবার সম্ভাবনা দেখিয়া, হৃদয় ব্রাহ্মণীকে ঐ কার্য্যে বিরত হইতে বলিলেও তিনি তাঁহার কথা গ্রহণ করিলেন না। তখন ব্রাহ্মণী ও হৃদয়ের মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল। হৃদয় উত্তেজিত হইয়া বলিল, 'ঐরূপ করিলে তোমাকে ঘরে থাকিতে স্থান দিব না।' ব্রাহ্মণীও ছাড়িবার পাত্রী নহেন, বলিলেন, 'না দিলে ক্ষতি কি? শীতলার ঘরে * মনসা † শোবে এখন।' তখন বাটীর অন্য সকলে মধ্যস্থ হইয়া নানা অনুনয়বিনয়ে ব্রাহ্মণীকে ঐকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া বিবাদ শান্তি করিলেন।

ব্রাহ্মণীর নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অপরাধের আশঙ্কা, অনুতাপ ও ক্ষমা চাহিয়া কাশী গমন।

অভিমানিনী ব্রাহ্মণী সেদিন নিবৃত্তা হইলেও অন্তরে বিষম আঘাত পাইয়াছিলেন। ক্রোধের উপশম হইলে তিনি শান্তভাবে চিন্তা করিয়া আপন ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, এখানে যখন ঐরূপ মতিভ্রম উপস্থিত হইতেছে তখন অতঃপর এখানে তাঁহার আর অবস্থান করা শ্রেয়ঃ নহে। সদসদ্বিচারসম্পন্ন বিবেকী সাধক যখন অন্তর দর্শনে নিযুক্ত হয়েন, চিত্তের কোন মলিনভাবই তখন তাঁহার নিকট আত্মগোপন করিতে পারে না—ব্রাহ্মণীরও এখন তদ্রূপ হইয়াছিল।

* অর্থাৎ দেবমন্দিরে।

† ব্রাহ্মণী ঐরূপে ক্রুদ্ধ সর্পের সহিত আপনাকে সমতুল্য করেন।

ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভাবপরিবর্ত্তনের আলোচনা করিয়া তিনি উহারও আত্মদোষ দেখিতে পাইলেন এবং মনে মনে সাতিশয় অনুতপ্তা হইলেন। অনন্তর কয়েকদিন গত হইলে এক দিবস তিনি ভক্তিসহকারে বিবিধ পুষ্পমাল্য স্বহস্তে রচনা ও চন্দনচর্চ্চিত করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গজ্ঞানে ঠাকুরকে মনোহর বেশে ভূষিত করিলেন এবং সর্ব্বান্তরে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পরে সংযত হইয়া মন-প্রাণ ঈশ্বরে অর্পণপূর্ব্বক কামারপুকুর পশ্চাতে রাখিয়া কাশীধামের পথ অবলম্বন করিলেন। ছয় বৎসর কাল ঠাকুরের সঙ্গে নিরন্তর থাকিবার পরে ব্রাহ্মণী তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঐরূপে প্রায় সাতমাসকাল নানাভাবে কামারপুকুরে অতিবাহিত করিয়া সম্ভবতঃ সন ১২৭৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ঠাকুর পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার শরীর তখন পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থ ও সবল হইয়াছিল। এখানে ফিরিবার স্বল্পকাল পরে তাঁহার জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। উহার কথা আমরা এখন পাঠককে বলিব।

ঠাকুরের কলিকাতায় প্রত্যাগমন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

তীর্থদর্শন ও হৃদয়রামের কথা।

মথুরবাবু এই সময়ে ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পুণ্যতীর্থসকল দর্শনে গমন করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। তাঁহার পরিবারবর্গ এবং গুরুপুত্রাদি অন্য অনেক ব্যক্তি সঙ্গে যাইবেন বলিয়া স্থির হইয়াছিল। সস্ত্রীক মথুরামোহন ঠাকুরকে সঙ্গে লইবার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ফলে বৃদ্ধা জননী * এবং ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া ঠাকুর তাঁহাদিগের সহিত যাইতে সম্মত হইলেন।

ঠাকুরের তীর্থযাত্রা স্থির হওয়া।

অনন্তর শুভদিন আগত দেখিয়া মথুরবাবু ঠাকুরপ্রমুখ সকলকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। তখন সন ১২৭৪ সালের মাঘ মাসের মধ্যভাগ হইবে, ইংরাজী ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী তারিখ। ঠাকুরের তীর্থযাত্রা-সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি। † সেজন্য হৃদয়ের নিকট ঐ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, কেবলমাত্র তাহারই এখানে উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব।

ঐ যাত্রার সময় নিরূপণ।

হৃদয় বলিত, শতাধিক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া মথুরবাবু এই-কালে তীর্থদর্শনে যাত্রা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি এবং তৃতীয় শ্রেণীর তিনখানি গাড়ী রেলওয়ে কোম্পানির নিকট হইতে রিজার্ভ (reserve)

ঐ যাত্রার বন্দোবস্ত।

---

* কেহ কেহ বলেন, ঠাকুরের জননী তাহার সহিত তীর্থে গমন করেন নাই। হৃদয় কিন্তু আমাদিগকে অন্যরূপ বলিয়াছিলেন।

† গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—৩য় অধ্যায়।

করিয়া লওয়া হইয়াছিল এবং বন্দোবস্ত ছিল, কলিকাতা হইতে কাশীর মধ্যে যে কোন স্থানে ঐ চারিখানি গাড়ি ইচ্ছামত কাটাইয়া লইয়া মথুরবাবু কয়েক দিন অবস্থান করিতে পারিবেন।

৺বৈদ্যনাথ দর্শন ও দরিদ্র সেবা।

দেওঘরে ৺বৈদ্যনাথজীকে দর্শন ও পূজাদি করিবার জন্য মথুর বাবু কয়েক দিন অবস্থান করেন। একটিবিশেষ ঘটনা এখানে উপস্থিত হইয়াছিল। এই স্থানের এক দরিদ্র পল্লীর স্ত্রীপুরুষদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয় করুণায় বিগলিত হইয়াছিল এবং মথুর বাবুকে বলিয়া তিনি তাহাদিগকে এক দিবস ভোজন এবং প্রত্যেককে এক একখানি বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। *

পথে বিঘ্ন।

বৈদ্যনাথ হইতে শ্রীযুত মথুর একেবারে ৺কাশীধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। কেবল, কাশীর সন্নিকটে কোন স্থানে কার্য্যান্তরে গাড়ী হইতে নামিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও হৃদয় উঠিতে না উঠিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছিল। শ্রীযুত মথুর উহাতে ব্যস্ত হইয়া কাশী হইতে এই মর্ম্মে তার করিয়া পাঠান যে, পরবর্ত্তী গাড়ীতে যেন তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী গাড়ীর জন্য তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হয় নাই। কোম্পানির জনৈক বিশিষ্ট কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কোন কার্য্যের তত্ত্বাবধানে একখানি স্বতন্ত্র (special) গাড়ীতে করিয়া স্বল্পক্ষণ পরেই ঐ স্থানে উপস্থিত হন এবং তাঁহাদিগকে বিপন্ন দেখিয়া, নিজ গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া কাশীধামে নামাইয়া দেন। রাজেন্দ্র বাবু কলিকাতায় বাগবাজার পল্লীতে বাস করিতেন।

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৭ম অধ্যায়।

কাশীধামে পৌঁছিয়া মথুর বাবু কেদারঘাটের উপরে পাশাপাশি দুইখানি বাটী ভাড়া লইয়াছিলেন। পূজা, দান প্রভৃতি সকল বিষয়ে তিনি এখানে মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়াছিলেন। * ঐ কারণে এবং বাটীর বাহিরে কোন স্থানে গমন করিবার কালে রূপার ছত্র ও আসাসোঁটা প্রভৃতি লইয়া তাঁহার অগ্র পশ্চাৎ দ্বারবানগণকে যাইতে দেখিয়া লোকে তাঁহাকে একটা রাজাবাজড়া বলিয়া ধারণা করিয়াছিল।

কেদারঘাটে অবস্থান ও বিশ্বনাথ দর্শন।

এখানে থাকিবার কালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব পাল্কীতে চাপিয়া প্রায় প্রত্যহ ৺বিশ্বনাথজীউর দর্শনে যাইতেন। হৃদয় তাঁহার সঙ্গে যাইত। যাইতে যাইতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন, দেবদর্শনকালেরত কথাই নাই। ঐরূপে সকল দেবস্থানে তাঁহার ভাবাবেশ হইলেও ৺কেদারনাথের মন্দিরে তাঁহার বিশেষ ভাবাবেশ হইত।

ঠাকুর ও শ্রীত্রৈলঙ্গস্বামী।

দেবস্থান ভিন্ন ঠাকুর কাশীর বিখ্যাত সাধুদিগকে দর্শন করিতে যাইতেন। তখনও হৃদয় সঙ্গে থাকিত। ঐরূপে পরমহংসাগ্রণী শ্রীযুক্ত ত্রৈলঙ্গ স্বামিজীকে দর্শন করিতে তিনি একাধিকবার গমন করিয়াছিলেন। স্বামিজী তখন মৌনাবলম্বনে মণিকর্ণিকার ঘাটে থাকিতেন। প্রথম দর্শনের দিন স্বামিজী আপন নস্যদানি ঠাকুরের সম্মুখে ধারণাপূর্ব্বক ঠাকুরকে অভ্যর্থনা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং ঠাকুর তাঁহার ইন্দ্রিয় ও অবয়ব সকলের গঠন লক্ষ্য করিয়া হৃদয়কে বলিয়াছিলেন যে, 'ইঁহাতে যথার্থ পরমহংসের লক্ষণ সকল বর্ত্তমান, ইনি সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর।' স্বামিজী তখন মণিকর্ণিকার পার্শ্বে একটি ঘাট বাঁধাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ঠাকুরের অনুরোধে হৃদয় কয়েক কোদাল মৃত্তিকা ঐ স্থানে নিক্ষেপ করিয়া ঐ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিল। তৎপরে ঠাকুর

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—৩য় অধ্যায়।

একদিন স্বামিজীকে মথুরের আবাসে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাঁহাকে স্বহস্তে পায়সান্ন খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন।

৺প্রয়াগধামে ঠাকুরের আচরণ।

পাঁচ সাতদিন কাশীতে থাকিয়া ঠাকুর মথুরের সহিত প্রয়াগে গমনপূর্ব্বক পুণ্যসঙ্গমে স্নান ও ত্রিরাত্রি বাস করিয়াছিলেন। মথুরপ্রমুখ সকলে তথায় শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে মস্তক মুণ্ডিত করিলেও ঠাকুর উহা করেন নাই। বলিয়াছিলেন, 'আমার করিবার আবশ্যক নাই।' প্রয়াগ হইতে মথুর বাবু পুনরায় ৺কাশীতে ফিরিয়াছিলেন এবং এক পক্ষ কাল তথায় বাস করিয়া শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে নিধুবনাদি স্থান দর্শন।

শ্রীবৃন্দাবনে মথুর নিধুবনের নিকটে একটি বাটীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। কাশীর ন্যায় এখানেও তিনি মুক্তহস্তে দান করিয়াছিলেন এবং পত্নীসমভিব্যাহারে দেবস্থানসকল দর্শন করিতে যাইয়া প্রত্যেক স্থলে কয়েক খণ্ড গিনি প্রণামস্বরূপে প্রদান করিয়াছিলেন। নিধুবন ভিন্ন ঠাকুর এখানে রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড এবং গিরিগোবর্দ্ধন দর্শন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত স্থলে তিনি ভাবাবেশে গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলেন। এখানে তিনি খ্যাতনামা সাধকসাধিকাগণকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন এবং নিধুবনে গঙ্গামাতার দর্শনলাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। হৃদয়কে তাঁহার অঙ্গের লক্ষণসকল দেখাইয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, ইঁহার বিশেষ উচ্চাবস্থা লাভ হইয়াছে।'

৺কাশীতে প্রত্যাগমন ও স্থিতি।

এক পক্ষ কাল আন্দাজ শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়া মথুরপ্রমুখ সকলে পুনরায় কাশীধামে আগমন করেন এবং ৺বিশ্বনাথের বিশেষ বেশ দর্শনের জন্য ১২৭৫ সালের বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। ঐ সময়ে ঠাকুর এখানে স্বর্ণময়ী অন্নপূর্ণা প্রতিমা দর্শন করিয়াছিলেন।

কাশীধামে যোগেশ্বরী নাম্নী ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহিত ঠাকুরের পুনরায় দেখা হইয়াছিল, এবং চৌষট্টি যোগিনী নামক পল্লীস্থ তাঁহার আবাসে তিনি কয়েকবার গমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণী ঐস্থলে মোক্ষদা নাম্নী একটী রমণীর সহিত বাস করিতেছিলেন।

কাশীতে ব্রাহ্মণীকে দর্শন। ব্রাহ্মণীর শেষ কথা।

ঐ রমণীর ভক্তি বিশ্বাস দর্শনে ঠাকুর পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন যাইবার কালে ব্রাহ্মণী ঠাকুরের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণীকে ঠাকুর এখন হইতে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিতে বলিয়াছিলেন। হৃদয় বলিত, ঠাকুর তথা হইতে ফিরিবার স্বল্পকাল পরে ব্রাহ্মণী শ্রীবৃন্দাবনে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানকালে ঠাকুরের বীণা শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু সে সময়ে তথায় কোনও বীণ্‌কার উপস্থিত না থাকায় উহা সফল হয় নাই। কাশীতে ফিরিয়া তাঁহার মনে পুনরায় ঐ ইচ্ছা উদয় হয় এবং শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র সরকার নামক একজন অভিজ্ঞ বীণ্‌কারের

বীণ্‌কার মহেশকে দেখিতে যাওয়া।

ভবনে হৃদয়ের সহিত উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহাকে বীণা শুনাইবার জন্য অনুরোধ করেন। মহেশবাবু কাশীস্থ মদনপুরা নামক পল্লীতে অবস্থান করিতেন। ঠাকুরের অনুরোধে তিনি সেদিন পরম আহ্লাদে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বীণা বাজাইয়াছিলেন। বীণার মধুর ঝঙ্কার শুনিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন, পরে অর্দ্ধবাহ্যদশা উপস্থিত হইলে তাঁহাকে শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকটে 'মা, আমায় হুঁস দাও, আমি ভাল করিয়া বীণা শুনিব।'—এইরূপে প্রার্থনা করিতে শুনা গিয়াছিল। ঐরূপ প্রার্থনার পরে তিনি বাহ্যভাবভূমিতে অবস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং সদানন্দে বীণা শ্রবণপূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে উহার সুরের সহিত নিজ স্বর মিলাইয়া গীত গাহিয়াছিলেন। অপরাহ্ন পাঁচটা হইতে

রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত ঐরূপে আনন্দে অতিবাহিত হইলে মহেশ বাবুর অনুরোধে তিনি ঐস্থানে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া মথুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহেশ বাবু তদবধি ঠাকুরকে প্রত্যহ দর্শন করিতে আগমন করিতেন। ঠাকুর বলিতেন—বীণা বাজাইতে বাজাইতে ইনি এককালে মত্ত হইয়া উঠিতেন।

কাশী হইতে শ্রীযুত মথুর গযাধামে যাইবার বাসনা প্রকাশ করেন। কিন্তু ঠাকুরের ঐ বিষয়ে বিশেষ আপত্তি * থাকায় তিনি ঐ সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। হৃদয় বলিত,

দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন ও আচরণ।

ঐরূপে চারি মাস কাল তীর্থে ভ্রমণ করিয়া সন ১২৭৫ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগে ঠাকুর মথুর বাবুর সহিত পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে ঠাকুর রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের রজ আনয়ন করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তিনি উহার কিয়দংশ পঞ্চবটীর চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দেন এবং অবশিষ্টাংশ নিজ সাধনকুটীর-মধ্যে স্বহস্তে প্রোথিত করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আজ হইতে এই স্থল শ্রীবৃন্দাবন তুল্য দেবভূমি হইল।" হৃদয় বলিত, উহার অনতিকাল পরে তিনি নানাস্থানের বৈষ্ণব গোস্বামী ও ভক্ত সকলকে মথুর বাবু দ্বারা নিমন্ত্রিত করাইয়া আনিয়া পঞ্চবটীতে মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। মথুরবাবু ঐ কালে গোস্বামীদিগকে ১৬৲ টাকা এবং বৈষ্ণব ভক্তদিগকে ১৲ টাকা করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন।

তীর্থ হইতে ফিরিবার অল্পকাল পরে হৃদযের স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

হৃদযের স্ত্রীর মৃত্যু ও বৈরাগ্য।

ঐ ঘটনায় তাহার মন, সংসারের প্রতি কিছু-কালের জন্য বিরাগসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি হৃদয়রাম ভাবুক ছিল

---

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—৭ম অধ্যায়।

না। নিজ ক্ষুদ্র সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া যথাসম্ভব ভোগ সুখে, কালযাপন করাই তাহার জীবনের আদর্শ ছিল। ঠাকুরের নিরন্তর সঙ্গগুণে তাহার মনে কখন কখন অন্যভাবের উদয় হইলেও উহা অধিককাল স্থায়ী হইত না। ভোগবাসনা পরিতৃপ্ত করিবার কোন-রূপ সুযোগ উপস্থিত হইলেই হৃদয় সকল ভুলিয়া উহার পশ্চাৎ ধাবিত হইত এবং যতকাল উহা সংসিদ্ধ না হইত ততকাল তাহার মনে অন্য চিন্তা প্রবেশলাভ করিত না। সেজন্য ঠাকুরের সমগ্র সাধন হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বরে থাকিবার কালে অনুষ্ঠিত হইলেও সে তাহার স্বল্পই দেখিবার ও বুঝিবার অবসর পাইয়াছিল। ঐরূপ হইলেও কিন্তু হৃদয় তাহার মাতুলকে যথার্থ ভালবাসিত এবং তাঁহার যখন যেরূপ সেবার আবশ্যক হইত তাহা সম্পাদন করিতে যত্নের ত্রুটি করিত না। উহার ফলে হৃদয়ের সাহস, বুদ্ধি এবং কার্য্যকুশলতা বিশেষ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। আবার বিখ্যাত সাধকদিগের নিকটে মাতুলের অলৌকিকত্ব শ্রবণে এবং তাঁহাতে দৈবশক্তিসকলের প্রকাশ দর্শনে তাহার মনে একটা বিশেষ বলের সঞ্চারও হইয়া-ছিল। সে ভাবিয়াছিল, মাতুল যখন তাহার আপনার হইতেও আপনার এবং সেবা দ্বারা যখন সে তাঁহার বিশেষ কৃপাপাত্র হইয়াছে তখন আধ্যাত্মিক রাজ্যের ফলসকল তাহার এক প্রকার করায়ত্তই রহিয়াছে। যখনি তাহার মন ঐ সকল লাভ করিতে প্রয়াসী হইবে মাতুল নিজ দৈবশক্তিপ্রভাবে তাহাকে তখনি ঐ সকল লাভ করাইয়া দিবেন। অতএব পরকাল সম্বন্ধে তাহার ভাবিবার আবশ্যকতা নাই। কিছুকাল সংসারসুখ ভোগ করিবার পরে সে পারত্রিক বিষয়ে মনোনিবেশ করিবে। পত্নীবিয়োগবিধুর হৃদয় ভাবিল, এখন সেইকাল উপস্থিত হইয়াছে। সে পূর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠার সহিত শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায় মনোনিবেশ করিল, পরিধানের

কাপড় ও পৈতা খুলিয়া রাখিয়া মধ্যে মধ্যে ধ্যান করিতে লাগিল এবং ঠাকুরকে ধরিয়া বসিল, তাহার যাহাতে তাঁহার ন্যায় আধ্যাত্মিক-উপলব্ধিসকল উপস্থিত হয়, তাহা করিয়া দিতে হইবে। ঠাকুর তাহাকে যত বুঝাইলেন যে, তাহার ঐরূপ করিবার আবশ্যক নাই, তাঁহার সেবা করিলেই তাহার সকল ফল লাভ হইবে, এবং হৃদয় ও তিনি উভয়েই যদি দিবারাত্র ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া আহার-নিদ্রাদি শারীরিক সকল চেষ্টা ভুলিয়া থাকেন, তাহা হইলে কে কাহাকে দেখিবে, ইত্যাদি—সে তাহাতে কর্ণপাত করিল না। ঠাকুর অগত্যা বলিলেন, "মার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক, আমার ইচ্ছায় কি কিছু হয় রে!—মা-ই আমার বুদ্ধি পাল্টাইয়া দিয়া আমাকে এইরূপ অবস্থায় আনিয়া অদ্ভুত উপলব্ধিসকল করাইয়া দিয়াছেন—মার ইচ্ছা হয় যদি তোরও হইবে।"

ঐরূপ কথাবার্ত্তার কয়েক দিন পরে পূজা ও ধ্যানকালে হৃদয়ের জ্যোতির্ম্ময় দেবমূর্ত্তিসকলের দর্শন এবং অৰ্দ্ধবাহ্যভাব হইতে আরম্ভ হইল। মথুর বাবু হৃদয়কে একদিন ঐরূপ ভাবাবিষ্ট দেখিয়া ঠাকুরকে বলিলেন,—'হৃদুর আবার এ কি অবস্থা হইল, বাবা?' ঠাকুর তাহাতে তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'হৃদয় ঢং করিয়া ঐরূপ করিতেছে না—একটু আধটু দর্শনের জন্য সে মাকে ব্যাকুল হইয়া ধরিয়াছিল তাই ঐরূপ হইতেছে। ঐরূপ দেখাইয়া বুঝাইয়া মা আবার তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিবেন।' মথুর বলিলেন, 'বাবা, এসব তোমারই খেলা, তুমিই হৃদয়কে ঐরূপ অবস্থা করিয়া দিয়াছ, তুমিই এখন তাহার মন ঠাণ্ডা করিয়া দাও—আমরা উভয়ে নন্দীভৃঙ্গীর মত তোমার কাছে থাকিব, সেবা করিব, আমাদের ঐ সব অবস্থা কেন?"

হৃদয়ের ভাবাবেশ।

মথুরের সহিত ঠাকুরের ঐরূপ কথাবার্ত্তার কয়েক দিন পরে

একদিন রাত্রে ঠাকুরকে পঞ্চবটী অভিমুখে যাইতে দেখিয়া, তাঁহার প্রয়োজন হইতে পারে ভাবিয়া, হৃদয় গাড়ু ও গামছা লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। যাইতে যাইতে হৃদয়ের এক অপূর্ব্ব দর্শন উপস্থিত হইল। সে দেখিতে লাগিল, ঠাকুর স্থূল রক্ত-মাংসের দেহধারী মনুষ্য নহেন, তাঁহার দেহনিঃসৃত অপূর্ব্ব জ্যোতিতে পঞ্চবটী আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে, এবং চলিবার কালে তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় পদযুগল ভূমি স্পর্শ না করিয়া শূন্যে শূন্যেই তাঁহাকে বহন করিতেছে। চক্ষুর দোষে ঐরূপ দেখিতেছি ভাবিয়া হৃদয় বারম্বার চক্ষু মার্জ্জন করিল. চতুষ্পার্শ্বস্থ পদার্থসকল নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় ঠাকুরের দিকে দেখিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—বৃক্ষ, লতা, গঙ্গা, কুটীর প্রভৃতি পদার্থনিচয়কে পূর্ব্ববৎ দেখিতে পাইলেও, ঠাকুরকে পুনঃ পুনঃ ঐরূপ দেখিতে থাকিল। তখন বিস্মিত হইয়া হৃদয় ভাবিল, আমার ভিতরে কি কোনরূপ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে, যাহাতে ঐরূপ দেখিতেছি? ঐরূপ ভাবিয়া সে আপনার দিকে চাহিবামাত্র তাহার মনে হইল সেও দিব্যদেহধারী জ্যোতির্ম্ময় দেবানুচর, সাক্ষাৎ দেবতার সঙ্গে থাকিয়া চিরকাল তাঁহার সেবা করিতেছে মনে হইল, সে যেন ঐ দেবতার জ্যোতিঃঘন অঙ্গসম্ভূত অংশবিশেষ, এবং তাঁহার সেবার জন্যই তাহার ভিন্ন শরীর ধারণপূর্ব্বক পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিতি। ঐরূপ দেখিয়া এবং নিজ জীবনের ঐরূপ রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার অন্তরে আনন্দের প্রবল বন্যা উপস্থিত হইল। সে আপনাকে ভুলিল, সংসার ভুলিল. পৃথিবীর মানুষ তাহাকে উন্মাদ বলিবে, সে কথা ভুলিল এবং অর্দ্ধ-বাহ্যভাবাবেশে উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বারংবার বলিতে লাগিল,—'ও রামকৃষ্ণ; ও রামকৃষ্ণ, আমরা ত মানুষ নহি, আমরা

হৃদয়ের অদ্ভুত দর্শন।

এখানে কেন? চল দেশে দেশে যাই, জীবোদ্ধার করি! তুমি যাহা আমিও তাহাই!'

ঠাকুর বলিতেন, "তাহাকে ঐরূপ চীৎকার করিতে শুনিয়া বলিলাম, 'ওরে থাম্ থাম্; অমন বলিতেছিস্ কেন, কি একটা হইয়াছে ভাবিয়া এখনি লোকজন সব ছুটীয়া আসিবে,—কিন্তু সে কি তা শুনে! তখন তাড়াতাড়ি তাহার নিকটে আসিয়া তাহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিলাম, 'দে মা শালাকে জড় করে দে।"

হৃদয়ের মনের জড়ত্ব প্রাপ্তি।

হৃদয় বলিত, ঠাকুর ঐরূপ বলিবামাত্র তাহার পূর্ব্বোক্ত দর্শন ও আনন্দ যেন কোথায় লুপ্ত হইল এবং সে পূর্ব্বে যেমন ছিল আবার তেমনি হইল। অপূর্ব্ব আনন্দ হইতে সহসা বিচ্যুত হইয়া তাহার মন বিষাদে পূর্ণ হইল এবং সে রোদন করিতে করিতে ঠাকুরকে বলিতে লাগিল, 'মামা, তুমি কেন অমন করিলে, কেন জড় হইতে বলিলে, ঐরূপ দর্শনানন্দ আমার আর হইবে না।' ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিলেন, "আমি কি তোকে একেবারে জড় হইতে বলিছি, তুই এখন স্থির হইয়া থাক্—এই কথা বলিয়াছি। সামান্য দর্শনলাভ করিয়া তুই যে গোল করিলি, তাহাতেই ত আমাকে ঐরূপ বলিতে হইল। আমি যে চব্বিশ ঘণ্টা কত কি দেখি, আমি কি ঐরূপ গোল করি? তোর এখনও ঐরূপ দর্শন করিবার সময় হয় নাই, এখন স্থির হইয়া থাক্, সময় হইলে আবার কত কি দেখিবি।"

হৃদয়ের সাধনায় বিঘ্ন।

ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত কথায় হৃদয় নীরব হইলেও নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইল। পরে অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সে ভাবিল, যেরূপেই হউক সে ঐরূপ দর্শন আবার লাভ করিতে চেষ্টা করিবে। সে ধ্যান জপের মাত্রা বাড়াইল এবং রাত্রে

পঞ্চবটীতলে যাইয়া ঠাকুর যেখানে বসিয়া পূর্ব্বে জপ ধ্যান করিতেন সেইস্থলে বসিয়া ৺জগদম্বাকে ডাকিবে এইরূপ মনস্থ করিল। ঐরূপ ভাবিয়া একদিন সে গভীররাত্রে শয্যাত্যাগপূর্ব্বক পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইল এবং ঠাকুরের আসনে ধ্যান করিতে বসিল। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের মনে পঞ্চবটীতলে আসিবার বাসনা হওয়াতে তিনিও ঐদিকে আসিতে লাগিলেন এবং তথায় পৌঁছিতে না পৌঁছিতে শুনিতে পাইলেন, হৃদয় কাতর চীৎকারে তাঁহাকে ডাকিতেছে, 'মামা গো, পুড়িয়া মরিলাম, পুড়িয়া মরিলাম।' ত্রস্তপদে অগ্রসর হইয়া ঠাকুর তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি রে, কি হইয়াছে?' হৃদয় যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বলিতে লাগিল, 'মামা, এইখানে ধ্যান করিতে বসিবামাত্র কে যেন এক মালসা আগুন গায়ে ঢালিয়া দিল, অসহ্য দাহযন্ত্রণা হইতেছে।' ঠাকুর তাহার অঙ্গে হাত বুলাইয়া বলিলেন, 'যা, ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে, তুই কেন এরূপ করিস্ বল দেখি, তোকে বলিয়াছি, আমার সেবা করিলেই তোর সব হইবে।' হৃদয় বলিত, ঠাকুর হস্তস্পর্শে বাস্তবিক তাহার সকল যন্ত্রণা তখনি শান্ত হইল। অতঃপর সে আর পঞ্চবটীতে ঐরূপে ধ্যান করিতে যাইত না এবং তাহার মনে বিশ্বাস হইল ঠাকুর তাহাকে যে কথা বলিয়াছেন তাহার অন্যথা করিলে তাহার ভাল হইবে না।

হৃদয়ের ৺দুর্গোৎসব।

ঠাকুরের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া হৃদয় এখন অনেকটা শান্তিলাভ করিলেও ঠাকুরবাটীর দৈনন্দিন কর্ম্মসকল তাহার পূর্ব্বের ন্যায় রুচিকর বোধ হইতে লাগিল না। তাহার মন নূতন কোন কর্ম্ম করিয়া নবোল্লাস লাভ করিবার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সন ১২৭৫ সালের আশ্বিন মাস আগত দেখিয়া সে নিজ বাটীতে শারদীয়া পূজা করিতে মনস্থ

করিল। হৃদয়রামের জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা গঙ্গানারায়ণের, তখন মৃত্যু হইয়াছে, এবং রাঘব মথুর বাবুর জমীদারীতে খাজনা আদায়ের কর্ম্মে বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। সময় ফিরায় বাটীতে নূতন চণ্ডীমণ্ডপখানি নির্ম্মিত হইবার কালে গঙ্গানারায়ণ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, একবার ৺জগদম্বাকে আনিয়া তথায় বসাইবেন, কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ করিবার তাঁহার সুযোগ হয় নাই। হৃদয় এখন তাঁহার ঐ ইচ্ছা স্মরণপূর্ব্বক উহা পূর্ণ করিতে যত্নপর হইল। কর্ম্মী হৃদয়ের ঐ কার্য্যে শান্তিলাভের সম্ভাবনা বুঝিয়া ঠাকুর তাহাতে সম্মত হইলেন এবং মথুর বাবু হৃদয়ের ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাহাকে আর্থিক সাহায্য করিলেন। শ্রীযুত মথুর ঐরূপে অর্থসাহায্য করিলেন বটে কিন্তু পূজাকালে ঠাকুরকে নিজ বাটীতে রাখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হৃদয় তাহাতে ক্ষুণ্ণমনে পূজা করিবার জন্য একাকী দেশে যাইতে প্রস্তুত হইল। যাইবার কালে তাহাকে ক্ষুণ্ণ দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'তুই দুঃখ করিতেছিস্ কেন? আমি নিত্য সূক্ষ্ম শরীরে তোর পূজা দেখিতে যাইব, আমাকে অপর কেহ দেখিতে পাইবে না কিন্তু তুই পাইবি। তুই অপর একজন ব্রাহ্মণকে তন্ত্রধারক রাখিয়া নিজে আপনার ভাবে পূজা করিস্ এবং একেবারে উপবাস না করিয়া মধ্যাহ্নে দুগ্ধ গঙ্গাজল ও মিছরির সরবৎ পান করিস। ঐরূপে পূজা করিলে ৺জগদম্বা তোর পূজা নিশ্চয় গ্রহণ করিবেন' ঐরূপে ঠাকুর, কাহার দ্বারা প্রতিমা গড়াইতে হইবে, কাহাকে তন্ত্রধারক করিতে হইবে, কি ভাবে অন্য সকল কার্য্য করিতে হইবে—সকল কথা তন্ন তন্ন করিয়া তাহাকে বলিয়া দিলেন এবং সে মহানন্দে পূজা করিতে যাত্রা করিল।

বাটীতে আসিয়া হৃদয় ঠাকুরের কথামত সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান

করিল এবং ষষ্ঠীর দিনে ৺দেবীর বোধন, অধিবাসাদি সকল কার্য্য-সম্পন্ন করিয়া স্বয়ং পূজায় ব্রতী হইল। সপ্তমী-বিহিতা পূজা সাঙ্গ করিয়া রাত্রে নীরাজন করিবার কালে হৃদয় দেখিতে পাইল, ঠাকুর জ্যোতির্ম্ময় শরীরে প্রতিমার পার্শ্বে ভাবাবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। হৃদয় বলিত, ঐরূপে প্রতিদিন ঐ সময়ে এবং সন্ধিপূজা-কালে সে দেবীপ্রতিমাপার্শ্বে ঠাকুরের দিব্যদর্শন লাভ করিয়া মহোৎ-সাহে পূর্ণ হইয়াছিল। পূজা সাঙ্গ হইবার স্বল্পকাল পরে হৃদয় দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিল এবং ঐ বিষয়ক সকল কথা ঠাকুরকে নিবেদন করিল ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিয়াছিলেন, "আরতি ও সন্ধিপূজার সময় তোর পূজা দেখিবার জন্য বাস্তবিকই প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া আমার ভাব হইয়া গিয়াছিল এবং অনুভব করিয়াছিলাম যেন জ্যোতির্ম্ময় শরীরে জ্যোতির্ম্ময় পথ দিয়া তোর চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছি।"

৺দুর্গোৎসবকালে হৃদয়ের ঠাকুরকে দেখা।

হৃদয় বলিত, ঠাকুর তাহাকে এক সময়ে ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, 'তুই তিন বৎসর পূজা করিবি'—ঘটনাও বাস্তবিক ঐরূপ হইয়াছিল। ঠাকুরের কথা না শুনিয়া চতুর্থবারে পূজার আয়োজন করিতে যাইয়া এমন বিঘ্ন পরম্পরা উপস্থিত হইয়াছিল যে, পরিশেষে বাধ্য হইয়া তাহাকে পূজা বন্ধ করিতে হইয়াছিল। সে যাহা হউক, প্রথম বৎসরের পূজার কিছুকাল পরে হৃদয় পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দক্ষিণেশ্বরের পূজাকার্য্যে এবং ঠাকুরের সেবায় মনোনিবেশ করিয়াছিল।

৺দুর্গোৎসবের শেষ কথা।

উনবিংশ অধ্যায়।

স্বজনবিয়োগ।

ঠাকুরের অগ্রজ শ্রীযুক্ত রামকুমারের পুত্র অক্ষয়ের সহিত পাঠককে আমরা ইতিপূর্ব্বে সামান্যভাবে পরিচিত করাইয়াছি। পূজ্যপাদ আচার্য্য তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমনের স্বল্পকাল পরে সন ১২৭২ সালের প্রথম ভাগে অক্ষয় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া বিষ্ণুমন্দিরে পূজকের পদ গ্রহণ করিয়াছিল। তখন তাহার বয়স সতর বৎসর হইবে। তাহার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা এখানে বলা প্রয়োজন।

রামকুমার-পুত্র অক্ষয়ের কথা।

জন্মগ্রহণ কালে অক্ষয়ের প্রসূতীর মৃত্যু হওযায় মাতৃহীন বালক নিজ আত্মীয়বর্গের বিশেষ আদরের পাত্র হইয়াছিল। সন ১২৫৯ সালে ঠাকুরের কলিকাতায় প্রথম আগমনকালে অক্ষয়ের বয়স তিন চারি বৎসর মাত্র ছিল। অতএব ঐ ঘটনার পূর্ব্বে দুই তিন বৎসর কাল পর্য্যন্ত ঠাকুর অক্ষয়কে ক্রোড়ে করিয়া মানুষ করিতে ও সর্ব্বদা আদর যত্ন করিতে অবসর পাইয়াছিলেন। পিতা রামকুমার কিন্তু অক্ষয়কে কখনও ক্রোড়ে করেন নাই, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, 'মায়া বাড়াইবার প্রয়োজন নাই; এ ছেলে বাঁচিবে না!' পরে ঠাকুর যখন সংসার ভুলিয়া, আপনাকে ভুলিয়া সাধনায় নিমগ্ন হইলেন, তখন সুন্দর শিশু তাঁহার অলক্ষ্যে কৈশোর অতিক্রমপূর্ব্বক যৌবনে পদার্পণ করিয়া অধিকতর প্রিয়দর্শন হইয়া উঠিয়াছিল। ঠাকুর এবং তাঁহার অন্যান্য আত্মীয়বর্গের নিকটে শুনিয়াছি, অক্ষয় বাস্তবিকই অতি সুপুরুষ ছিল। তাঁহারা বলিতেন, অক্ষয়ের দেহের বর্ণ যেমন উজ্জ্বল ছিল, অঙ্গ-

অক্ষয়ের রূপ।

প্রত্যঙ্গাদির গঠনও তেমন সুঠাম ও সুললিত ছিল, দেখিলে জীবন্ত শিবমূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞান হইত।

অক্ষয়ের শ্রীরামচন্দ্রে ভক্তি ও সাধনানুরাগ।

বাল্যকাল হইতে অক্ষয়ের মন শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল। কুলদেবতা ৺রঘুবীরের সেবায় সে প্রতিদিন অনেক কাল যাপন করিত। সুতরাং দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া অক্ষয় যখন পূজাকার্য্যে ব্রতী হইল তখন আপনার মনের মত কার্য্যেই নিযুক্ত হইয়াছিল। ঠাকুর বলিতেন, "শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর পূজা করিতে বসিয়া অক্ষয় ধ্যানে এমন তন্ময় হইত যে, ঐ সময় বিষ্ণুঘরে বহুলোকের সমাগম হইলেও সে জানিতে পারিত না—দুই ঘণ্টাকাল ঐরূপে অতিবাহিত হইবার পরে তাহার হুঁস হইত।" হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি মন্দিরের নিত্যপূজা সুসম্পন্ন করিবার পরে অক্ষয় পঞ্চবটীতলে আগমনপূর্ব্বক অনেকক্ষণ শিবপূজায় অতিবাহিত করিত, পরে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন সমাপনান্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে নিবিষ্ট হইত। তদ্ভিন্ন নবানুরাগের প্রেরণায় সে এইকালে ন্যাস ও প্রাণায়াম এত অতিমাত্রায় করিয়া বসিত যে, তজ্জন্য তাহার কণ্ঠ-তালুদেশ স্ফীত হইয়া কখন কখন রুধির নির্গত হইত। অক্ষয়ের ঐরূপ ভক্তি ও ঈশ্বরানুরাগ তাহাকে ঠাকুরের বিশেষ প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল।

ঐরূপে বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইয়া সন ১২৭৫ সালের অর্দ্ধেকের অধিক অতীত হইল। অক্ষয়ের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া খুল্লতাত রামেশ্বর তাহার বিবাহের জন্য এখন পাত্রী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কামারপুকুরের অনতিদূরে কুচেকোল নামক গ্রামে উপযুক্তা

অক্ষয়ের বিবাহ।

পাত্রীর সন্ধান পাইয়া রামেশ্বর যখন অক্ষয়কে লইয়া যাইবার জন্য দক্ষিনেশ্বরে আগমন করিলেন, তখন চৈত্র মাস। চৈত্রমাসে যাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া আপত্তি উঠিলেও রামেশ্বর

উহা মানিলেন না। বলিলেন, বিদেশ হইতে নিজ বাটীতে আগমন কালে ঐ নিষেধ-বচন মানিবার আবশ্যকতা নাই। বাটীতে ফিরিয়া অনতিকাল পরে সন ১২৭৬ সালের বৈশাখে অক্ষয়ের বিবাহ হইল।

বিবাহের কয়েক মাস পরে শ্বশুরালয়ে যাইয়া অক্ষয়ের কঠিন পীড়া হইল। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সংবাদ পাইয়া তাহাকে কামারপুকুরে আনাইলেন এবং চিকিৎসাদি দ্বারা আরোগ্য করাইয়া পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়া দিলেন। এখানে আসিয়া তাহার চেহারা ফিরিল এবং স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হইতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এমন সময়ে সহসা একদিন অক্ষয়ের জ্বর হইল। ডাক্তারবৈদ্যেরা বলিল, সামান্য জ্বর, শীঘ্র সারিয়া যাইবে।

বিবাহের পরে অক্ষয়ের কঠিন পীড়া ও দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন।

হৃদয় বলিত, অক্ষয় শ্বশুরালয়ে পীড়িত হইয়াছে শুনিয়া ঠাকুর ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, 'হৃদু, লক্ষণ বড় খারাপ, রাক্ষস-গণ-বিশিষ্টা কোন কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছে, ছোঁড়া মারা যাইবে দেখিতেছি।' যাহা হউক তিন চারি দিনেও অক্ষয়ের জ্বরের উপশম হইল না দেখিয়া ঠাকুর এখন হৃদয়কে ডাকিয়া বলিলেন, 'হৃদু, ডাক্তারেরা বুঝিতে পারিতেছে না, অক্ষয়ের বিকার হইয়াছে, ভাল চিকিৎসক আনাইয়া আশ মিটাইয়া চিকিৎসা কর, ছোঁড়া কিন্তু বাঁচিবে না।'

অক্ষয়ের দ্বিতীয়বার পীড়া। অক্ষয়ের মৃত্যু-ঘটনা ঠাকুরের পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারা।

হৃদয় বলিত "তাঁহাকে ঐরূপ বলিতে শুনিয়া আমি বলিলাম, 'ছিঃ ছিঃ মামা, তোমার মুখ দিয়ে ওরকম কথাগুলা কেন বাহির হইল।—তাহাতে তিনি বলিলেন 'আমি কি ইচ্ছা করিয়া ঐরূপ বলিয়াছি? মা যেমন জানান ও বলান ইচ্ছা না থাকিলেও

অক্ষয় বাঁচিবে না শুনিয়া হৃদয়ের আশঙ্কা ও আচরণ।

আমাকে তেমনি বলিতে হয়। আমার কি ইচ্ছা অক্ষয় মারা পড়ে'।"

ঠাকুরের ঐরূপ কথা শুনিয়া হৃদয় বিশেষ উদ্বিগ্ন হইল এবং সুচিকিৎসকসকল আনাইয়া অক্ষয়ের পীড়া আরোগ্যের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিতে লাগিল। রোগ কিন্তু ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। অনন্তর প্রায় মাসাবধি ভুগিবার পরে অক্ষয়ের অন্তিমকাল আগত দেখিয়া ঠাকুর তাহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'অক্ষয়, বল, গঙ্গা নারায়ণ ওঁ রাম।'—অক্ষয় এক দুই করিয়া তিন-বার ঐ মন্ত্র আবৃত্তি করিবার পরক্ষণেই তাহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি, অক্ষয়ের মৃত্যু হইলে হৃদয় যত কাঁদিতে লাগিল, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া তত হাসিতে লাগিলেন!

অক্ষয়ের মৃত্যু ও ঠাকুরের আচরণ।

প্রিয়দর্শন পুত্রসদৃশ অক্ষয়ের মৃত্যু উচ্চ ভাবভূমি হইতে দর্শন করিয়া ঠাকুর ঐরূপে হাস্য করিলেও প্রাণে বিষমাঘাত যে অনুভব করেন নাই, তাহা নহে। বহুকাল পরে আমাদের নিকট ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি সময়ে সময়ে বলিয়াছেন যে, ঐ সময়ে ভাবাবেশে মৃত্যু-টাকে অবস্থান্তরপ্রাপ্তিমাত্র বলিয়া দেখিতে পাইলেও ভাবভঙ্গ হইয়া সাধারণ ভূমিতে অবরোহণ করিবার কালে অক্ষয়ের বিয়োগে তিনি বিশেষ অভাব বোধ করিয়াছিলেন। * অক্ষয়ের দেহত্যাগ ঐ বাটীতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি মথুর বাবুর বৈঠকখানা বাটীতে অতঃপর আর কখনও বাস করিতে পারেন নাই।

অক্ষয়ের মৃত্যুতে ঠাকুরের মনঃকষ্ট।

অক্ষয়ের মৃত্যুর পরে ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুক্ত রামেশ্বর

* গুরুভাব—পূর্বার্দ্ধ, ১ম অধ্যায়।

ভট্টাচার্য্য, দক্ষিণেশ্বরে রাধাগোবিন্দজীউএর পূজকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সংসারের সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বাবধান তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকায় তিনি সকল সময়ে দক্ষিণেশ্বরে থাকিতে পারিতেন না। বিশ্বাসী ব্যক্তির হস্তে ঐ কার্য্যের ভারার্পণপূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে কামারপুকুর গ্রামে যাইয়া থাকিতেন শুনিয়াছি, শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং দীননাথ নামক একব্যক্তি ঐ সময়ে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন করিত।

ঠাকুরের ভ্রাতা রামেশ্বরের পূজকের পদ গ্রহণ।

অক্ষয়ের মৃত্যুর স্বল্পকাল পরে শ্রীযুত মথুর ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া নিজ জমীদারী মহলে এবং গুরুগৃহে গমন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের মন হইতে অক্ষয়ের বিয়োগজনিত অভাববোধ প্রশমিত করিবার জন্যই বোধ হয়, তিনি এখন ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কারণ, পরমভক্ত মথুর, এক পক্ষে যেমন ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে সকল বিষয়ে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন, অপর পক্ষে তেমনি আবার তাঁহাকে সাংসারিক ব্যাপারমাত্রে অনভিজ্ঞ বালকবোধে সর্ব্বতোভাবে নিজরক্ষণীয় বিবেচনা করিতেন। মথুরের জমীদারী মহল পরিদর্শন করিতে যাইয়া ঠাকুর এক স্থানের পল্লীবাসী স্ত্রী-পুরুষগণের দুর্দ্দশা ও অভাব দেখিয়া তাহাদিগের দুঃখে কাতর হন এবং তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া মথুরের দ্বারা তাহাদিগকে একমাথা করিয়া তেল, এক একখানি নূতন কাপড় এবং উদর পুরিয়া একদিনের ভোজন, দান করাইয়াছিলেন হৃদয় বলিত, রাণাঘাটের সন্নিকট কলাইঘাট নামক স্থানে পূর্ব্বোক্ত ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, মথুরবাবু ঐ সময়ে ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় করিয়া চূর্ণীর খালে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন।

মথুরের সহিত ঠাকুরের রাণাঘাটে গমন ও দরিদ্র নারায়ণগণের সেবা।

হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি সাতক্ষীরার নিকট সোনাবেড়ে নামক গ্রামে মথুরের পৈতৃক ভিটা ছিল। ঐ গ্রামের সন্নিহিত গ্রাম সকল তখন মথুরের জমীদারীভুক্ত। ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া মথুর এই সময়ে ঐ স্থানে গমন করিয়াছিলেন। এখান হইতে মথুরের গুরুগৃহ অধিক দূরবর্ত্তী ছিল না। বিষয়সম্পত্তির বিভাগ লইয়া গুরুবংশীয়দিগের মধ্যে এই কালে বিবাদ চলিতেছিল। সেই বিবাদ মিটাইবার জন্য মথুরকে তাঁহারা আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। গ্রামের নাম তালামাগ্‌রো। মথুর তথায় যাইবার কালে ঠাকুর ও হৃদয়কে নিজ হস্তীর উপর আরোহণ করাইয়া এবং স্বয়ং শিবিকায় আরোহণ করিয়া গমন করিয়াছিলেন। * মথুরের গুরুপুত্রগণের সযত্ন পরিচর্য্যায় কয়েক সপ্তাহ এখানে অতিবাহিত করিয়া ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

মথুরের নিজবাটী ও গুরুগৃহ দর্শন।

মথুরের বাটী ও গুরুস্থান দর্শন করিয়া ফিরিবার স্বল্পকাল পরে ঠাকুরকে লইয়া কলিকাতায় কলুটোলা নামক পল্লীতে একটী বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত পল্লীবাসী, শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্ত বা ধরের বাটীতে তখন হরিসভার অধিবেশন হইত। ঠাকুর তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া গমনপূর্ব্বক ভাবাবেশে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্য নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আমরা পাঠককে অন্যত্র প্রদান

কলুটোলার হরিসভায় ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যদেবের আসনাধিকার ও কাল্‌না, নবদ্বীপাদি দর্শন।

* হৃদয় বলিত, যাইবার কালে পথ বন্ধুর ছিল বলিয়া শ্রীযুত মথুর ঠাকুরকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া স্বয়ং হস্তিপৃষ্ঠে গমন করিয়াছিলেন এবং গ্রামে পৌঁছিবার পরে ঠাকুরের কৌতুহল পরিতৃপ্তির জন্য তাঁহাকে কখন কখন হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়াছিলেন।

করিয়াছি।* উহার অনতিকাল পরে ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শন করিতে অভিলাষ হওয়ায় মথুর বাবু তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কাল্‌না, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন। কাল্‌নায় গমন করিয়া ঠাকুর কিরূপে ভগবান দাস বাবাজী নামক সিদ্ধ ভক্তের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কিরূপ অদ্ভুত দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল, সে সকল কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।† সম্ভবতঃ সন ১২৭৪ সালে ঠাকুর ঐ সকল পুণ্য স্থান দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের সন্নিকট গঙ্গায় চড়াসকলের নিকট দিয়া গমন করিবার কালে ঠাকুরের যেরূপ গভীর ভাবাবেশ উপস্থিত হইয়াছিল, নবদ্বীপে যাইয়া তদ্রূপ হয় নাই। মথুর বাবু প্রভৃতি ঐ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের লীলাস্থল পুরাতন নবদ্বীপ, গঙ্গাগর্ভে লীন হইয়াছে; ঐ সকল চড়ার স্থলেই সেই সকল বিদ্যমান ছিল, সেইজন্যই ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার গভীর ভাবাবেশ উপস্থিত হইয়াছিল।

মথুরের নিষ্কাম ভক্তি।

একাদিক্রমে চতুর্দ্দশ বৎসর ঠাকুরের সেবায় সর্ব্বান্তঃকরণে নিযুক্ত থাকিয়া মথুর বাবুর মন এখন কতদূর নিষ্কাম ভাবে উপনীত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপে হৃদয় আমাদিগকে একটি ঘটনা বলিয়াছিল। পাঠককে উহা এখানে বলিলে মন্দ হইবে না।

এক সময়ে মথুর বাবু শরীরের সন্ধিস্থলবিশেষে স্ফোটক হইয়া শয্যাগত হইয়াছিলেন। ঠাকুরকে দেখিবার জন্য ঐসময়ে তাঁহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া হৃদয় ঐকথা ঠাকুরকে নিবেদন করিল

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—৩য় অধ্যায়।

† গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—৩য় অধ্যায়।

ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, 'আমি যাইয়া কি করিব, তাহার ফোড়া আরাম করিয়া দিবার আমার কি শক্তি আছে?' ঠাকুর যাইলেন না দেখিয়া মথুর লোক পাঠাইয়া বারম্বার কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। তাঁহার ঐরূপ ব্যাকুলতায় ঠাকুরকে অগত্যা যাইতে হইল। ঠাকুর উপস্থিত হইলে মথুরের আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি অনেক কষ্টে উঠিয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিলেন, এবং বলিলেন 'বাবা, একটু পায়ের ধূলা দাও।'

ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

ঠাকুর বলিলেন, আমার পায়ের ধূলা লইয়া কি হইবে, উহাতে তোমার ফোড়া কি আরোগ্য হইবে?'

মথুর তাহাতে বলিলেন, 'বাবা আমি কি এমনি, তোমার পায়ের ধূলা কি ফোড়া আরাম করিবার জন্য চাহিতেছি? তাহার জন্য ত ডাক্তার আছে। আমি ভবসাগরে পার হইবার জন্য তোমার শ্রীচরণের ধূলা চাহিতেছি।'

ঐ কথা শুনিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন। মথুর ঐ অবকাশে তাঁহার চরণে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন—তাঁহার দুনয়নে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।

মথুরবাবু ঠাকুরকে এখন কতদূর ভক্তিবিশ্বাস করিতেন তদ্বিষয়ের নানা কথা আমরা ঠাকুরের এবং হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি। এক কথায় বলিতে হইলে, তিনি তাঁহাকে ইহকাল পরকালের সম্বল ও গতি বলিয়া দৃঢ় ধারণা করিয়া ছিলেন। অন্য পক্ষে ঠাকুরের কৃপাও তাঁহার প্রতি তেমনি অসীম ছিল। স্বাধীনচেতা ঠাকুর মথুরের কোন কোন কার্য্যে সময়ে সময়ে বিরক্ত হইলেও ঐভাব ভুলিয়া তখনি আবার তাঁহার সকল অনুরোধ রক্ষাপূর্ব্বক তাঁহার ঐহিক ও পারত্রিক

ঠাকুরের সহিত মথুরের গভীর প্রেমসম্বন্ধ।

কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিতেন। ঠাকুর ও মথুরের সম্বন্ধ যে কত গভীর প্রেমপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য ছিল, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনায় বুঝিতে পারা যায়—

এক দিন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া মথুরকে বলিলেন, 'মথুর, তুমি যতদিন (জীবিত) থাকিবে আমি ততদিন এখানে (দক্ষিণেশ্বরে) থাকিব। মথুর শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। কারণ, তিনি জানিতেন, সাক্ষাৎ জগদম্বাই ঠাকুরের শরীরাবলম্বনে তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারবর্গকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন—সুতরাং ঠাকুরের ঐরূপ কথা শুনিয়া বুঝিলেন তাঁহার অবর্ত্তমানে ঠাকুর তাঁহার পরিবার-বর্গকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন। অনন্তর তিনি দীনভাবে ঠাকুরকে বলিলেন, 'সে কি বাবা, আমার পত্নী এবং পুত্র দ্বারকানাথও যে তোমাকে বিশেষ ভক্তি করে।' মথুরকে কাতর দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, 'আচ্ছা, তোমার পত্নী ও দোয়ারি যতদিন থাকিবে, আমি ততদিন থাকিব।' ঘটনাও বাস্তবিক ঐরূপ হইয়াছিল। শ্রীমতী জগদম্বা দাসী ও দ্বারকানাথের দেহাব-সানের অনতিকাল পরে ঠাকুর চিরকালের নিমিত্ত দক্ষিণেশ্বর পরি-ত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী জগদম্বা দাসী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।* উহার পরে কিঞ্চিদধিক তিন বৎসর মাত্র ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়াছিলেন।

ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

অন্য এক দিবস মথুরবাবু ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, 'কৈ

---

* "Jagadamba died on or about 1st January, 1881, intestate, leaving defendant Trayluksha, then the only son of Mathura, her surviving" Quoted from Plaintiff's statement in High Court Suit No 203 of 1889

বাবা, তুমি যে, বলিয়াছিলে তোমার ভক্তগণ আসিবে, তাহারা কেহই ত এখন আসিল না?' ঠাকুর তাহাতে বলিলেন, 'কি জানি বাবু, মা তাহাদিগকে কত দিনে আনিবেন—তাহারা সব আসিবে, একথা কিন্তু মা আমাকে স্বয়ং জানাইয়াছেন অপর যাহা যাহা দেখাইয়াছেন সে সকলি ত একে একে সত্য হইয়াছে, এটি কেন সত্য হইল না, কে জানে!' ঐ বলিয়া ঠাকুর বিষণ্ণমনে ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার ঐ দর্শনটি কি তবে ভুল হইল? মথুর তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া মনে বিশেষ ব্যথা পাইলেন, ভাবিলেন, ঐকথা পাড়িয়া ভাল করেন নাই। পরে বালকভাবাপন্ন ঠাকুরকে সান্ত্বনার জন্য বলিলেন, 'তারা আসুক আর নাই আসুক বাবা, আমি ত তোমার চিরানুগত ভক্ত রহিয়াছি?—তবে আর, তোমার দর্শন সত্য হইল না কিরূপে?—আমি একাই এক শত ভক্তের তুল্য, তাই মা বলিয়াছিলেন, অনেক ভক্ত আসিবে।'—ঠাকুর বলিলেন, 'কে জানে বাবু, তুমি যা বলচ তাই বা হবে।' মথুর ঐ প্রসঙ্গে আর অধিক দূর অগ্রসর না হইয়া অন্য কথা পাড়িয়া ঠাকুরকে ভুলাইয়া দিলেন।

ঐ বিষয়ে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত।

ঠাকুরের নিরন্তর সঙ্গগুণে মথুরের মনে কতদূর ভাবপরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছিল তাহা আমরা 'গুরুভাব' গ্রন্থের অনেক স্থলে পাঠককে বলিয়াছি। শাস্ত্র বলেন মুক্ত পুরুষের সেবকেরা তদনুষ্ঠিত শুভ কর্ম্মসকলের ফলের অধিকারী হয়েন। অতএব অবতারপুরুষের সেবকেরা যে, বিবিধ দৈবী সম্পদের অধিকারী হইবেন, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

মথুরের ঐরূপ নিষ্কাম-ভক্তি লাভ করা আশ্চর্য্য নহে। ঐ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত।

সম্পদ বিপদ, সুখ দুঃখ, মিলন বিয়োগ, জীবন মৃত্যুরূপ তরঙ্গসমাকুল কালের অনন্ত প্রবাহ ক্রমে সন ১২৭৮ সালকে ধরাধামে

উপস্থিত করিল। ঠাকুরের সহিত মথুরের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইয়া ঐ বৎসর পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। বৈশাখ যাইল, জ্যৈষ্ঠ যাইল, আষাঢেরও অর্দ্ধেক দিন অতীতের গর্ভে লীন হইল, এমন সময় শ্রীযুত মথুর জ্বররোগে শয্যাগত হইলেন। ক্রমশঃ উহা বৃদ্ধি হইয়া সাত আট দিনেই বিকারে পরিণত হইল। এবং মথুরের বাক্‌রোধ হইল। ঠাকুর পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন—মা তাঁহার ভক্তকে নিজ স্নেহময় অঙ্কে গ্রহণ করিতেছেন—মথুরের ভক্তিব্রতের উদ্‌যাপন হইয়াছে! সেজন্য হৃদয়কে প্রতিদিন দেখিতে পাঠাইলেও, স্বয়ং মথুরকে দর্শন করিতে একদিনও যাইলেন না। ক্রমে শেষ দিন উপস্থিত হইল—অন্তিমকাল আগত দেখিয়া মথুরকে কালীঘাটে লইয়া যাওয়া হইল। সেই দিন ঠাকুর হৃদয়কেও দেখিতে পাঠাইলেন না—কিন্তু অপরাহ্ণ উপস্থিত হইলে, দুই তিন ঘণ্টাকাল গভীর ভাবে নিমগ্ন হইলেন এবং জ্যোতির্ম্ময় বর্ত্মে দিব্য শরীরে ভক্তের পার্শ্বে উপনীত হইয়া তাহাকে কৃতার্থ করিলেন—বহুপুণ্যার্জ্জিত লোকে তাহাকে স্বয়ং আরূঢ় করাইলেন!

মথুরের দেহত্যাগ।

ভাবভঙ্গে ঠাকুর হৃদয়কে নিকটে ডাকিলেন, তখন পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে—এবং বলিলেন, "শ্রীশ্রীজগদম্বার সখীগণ মথুরকে সাদরে দিব্য রথে উঠাইয়া লইলেন—তাহার তেজ শ্রীশ্রীদেবীলোকে গমন করিল।" পরে, গভীর রাত্রে কালীবাটীর কর্ম্মচারিগণ ফিরিয়া আসিয়া হৃদয়কে সংবাদ দিল, মথুরবাবু অপরাহ্ণে পাঁচটার সময় দেহ রক্ষা করিয়াছেন! * ঐরূপে পুণ্যলোকে গমন করিলেও, ভোগবাসনার সম্পূর্ণ

ঠাকুরের ভাবাবেশে ঐ ঘটনা দর্শন।

---

* "Mathura Mohan Biswas died in July, 1871, intestate leaving him surviving Jagadamba, sole widow Bhupal since deceased, a son by his another wife who had pre-deceased him—

ক্ষয় না হওয়ায়, পরম ভক্ত মথুরামোহনকে ধরাধামে পুনরায় ফিরিতে হইবে, ঠাকুরের মুখে একথা আমরা অন্যসময়ে শুনিয়াছি এবং পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।*

---

and Dwarka Nath Biswas since deceased, defendant Traylukshа Nath and Thakurdas alias Dhurmadas, three sons by the said Jagadamba"

Quoted from plaintiff's statement in High Court Suit No 230 of 1889—Shyma Churun Biswas, vs Trayluksha Nath Biswas, Gurudas, Kalidas, Durgadas and Kumudini

* গুরুভাব—পূর্বার্দ্ধ, ৭ম অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়।

৺ ষোড়শী-পূজা।

মথুর চলিয়া যাইলেন, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে মানবের জীবন-প্রবাহ কিন্তু সমভাবেই বহিতে লাগিল। দিন, মাস অতীত হইয়া ক্রমে ছয়মাস কাটিয়া গেল এবং ১২৭৮ সালের ফাল্গুন মাস সমাগত হইল। ঠাকুরের জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা ঐ কালে উপস্থিত হইয়াছিল। উহা জানিতে হইলে আমাদিগকে জয়রামবাটী গ্রামে ঠাকুরের শ্বশুরালয়ে একবার গমন করিতে হইবে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, সন ১২৭৪ সালে ঠাকুর যখন ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া নিজ জন্মভূমি কামারপুকুর গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার আত্মীয়া রমণীগণ তাঁহার পত্নীকে তথায় আনয়ন করিয়াছিলেন। বলিতে হইলে বিবাহের পর ঐ কালেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর স্বামিসন্দর্শন প্রথম লাভ হইয়াছিল। কামারপুকুর অঞ্চলের বালিকাদিগের সহিত কলিকাতার বালিকাদিগের তুলনা করিবার অবসর যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন, কলিকাতা অঞ্চলের বালিকাদিগের দেহের ও মনের পরিণতি স্বল্প বয়সেই উপস্থিত হয়, কিন্তু কামারপুকুর প্রভৃতি গ্রামসকলের বালিকাদিগের তাহা হয় না। চতুর্দ্দশ এবং কখন কখন পঞ্চদশ ও ষোড়শ বর্ষীয়া কন্যাদিগেরও সেখানে যৌবনকালের অঙ্গলক্ষণসমূহ পূর্ণভাবে উদ্গত হয় না—এবং শরীরের ন্যায় তাহাদিগের মনের পরিণতিও ঐরূপ বিলম্বে উপস্থিত

বিবাহের পরে ঠাকুরকে প্রথম দর্শনকালে শ্রীশ্রীমা বালিকা মাত্র ছিলেন।

গ্রাম্য বালিকাদিগের বিলম্বে শরীরমনের পরিণতি হয়।

হয়। পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিণীসকলের ন্যায় অল্পপরিসর স্থানে কাল যাপন করিতে বাধ্য না হইয়া পবিত্র নির্ম্মল গ্রাম্য বায়ু সেবন এবং গ্রাম মধ্যে যথা তথা স্বচ্ছন্দবিহারপূর্ব্বক স্বাভাবিক ভাবে জীবন অতিবাহিত করিবার জন্যই বোধ হয় ঐরূপ হইয়া থাকে।

ঠাকুরকে প্রথমবার দেখিয়া শ্রীশ্রীমার মনের ভাব।

চতুর্দ্দশ বৎসরে প্রথমবার স্বামিসন্দর্শনকালে শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী নিতান্ত বালিকাস্বভাবসম্পন্না ছিলেন। দাম্পত্য-জীবনের গভীর উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ববোধ করিবার শক্তি তাঁহাতে তখন বিকাশোন্মুখ হইয়াছিল মাত্র। পবিত্রা বালিকা দেহবুদ্ধিবিরহিত ঠাকুরের দিব্য সঙ্গ এবং নিঃস্বার্থ আদরযত্ন লাভে ঐকালে অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উল্লসিত হইয়াছিলেন। ঠাকুরের স্ত্রীভক্তদিগের নিকটে তিনি ঐ উল্লাসের কথা অনেক সময় এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন "হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে, ঐকাল হইতে সর্ব্বদা এইরূপ অনুভব করিতাম—সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকিত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে।"

ঐভাব লইয়া শ্রীশ্রীমার জয়রামবাটীতে বাসের কথা।

কয়েক মাস পরে ঠাকুর যখন কামারপুকুর হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন, বালিকা তখন অনন্ত আনন্দসম্পদের অধিকারিণী হইয়াছেন—এইরূপ অনুভব করিতে করিতে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিলেন। পূর্ব্বোক্ত উল্লাসের উপলব্ধিতে তাঁহার চলন, বলন, আচরণাদি সকল চেষ্টার ভিতর এখন একটি পরিবর্ত্তন যে উপস্থিত হইয়াছিল, একথা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু সাধারণ মানব উহা দেখিতে পাইয়াছিল কি না সন্দেহ, কারণ উহা তাঁহাকে চপলা না করিয়া শান্তস্বভাবা করিয়াছিল, প্রগল্‌ভা না করিয়া চিন্তাশীলা করিয়াছিল,

স্বার্থ-দৃষ্টি-নিবদ্ধা না করিয়া নিঃস্বার্থপ্রেমিকা করিয়াছিল, এবং অন্তর হইতে সর্ব্বপ্রকার অভাববোধ তিরোহিত করিয়া মানবসাধারণের দুঃখকষ্টের সহিত অনন্ত সমবেদনাসম্পন্না করিয়া ক্রমে তাঁহাকে করুণার সাক্ষাৎ প্রতিমায় পরিণত করিয়াছিল। মানসিক উল্লাস-প্রভাবে অশেষ শারীরিক কষ্টকে তাঁহার এখন হইতে কষ্ট বলিয়া মনে হইত না এবং আত্মীয়বর্গের নিকট হইতে আদর যত্নের প্রতিদান না পাইলে মনে দুঃখ উপস্থিত হইত না। ঐরূপে সকল বিষয়ে সামান্যে সন্তুষ্টা থাকিয়া বালিকা আপনাতে আপনি ডুবিয়া তখন পিত্রালয়ে কাল কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু শরীর ঐস্থানে থাকিলেও তাঁহার মন ঠাকুরের পদানুসরণ করিয়া এখন হইতে দক্ষিণেশ্বরেই উপস্থিত ছিল। ঠাকুরকে দেখিবার এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য মধ্যে মধ্যে মনে প্রবল বাসনার উদয় হইলেও তিনি উহা যত্নে সম্বরণ-পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিতেন;—ভাবিতেন, প্রথম দর্শনে যিনি তাঁহাকে কৃপা করিয়া এতদূর ভালবাসিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে ভুলিবেন না—সময় হইলেই নিজ সকাশে ডাকিয়া লইবেন। ঐরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং হৃদয়ে বিশ্বাস স্থির রাখিয়া তিনি ঐ শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

চারিটি দীর্ঘ বৎসর একে একে কাটিয়া গেল। আশা প্রতীক্ষার প্রবল প্রবাহ বালিকার মনে সমভাবেই বহিতে লাগিল। তাঁহার শরীর কিন্তু মনের ন্যায় সমভাবে থাকিল না, দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইয়া সন ১২৭৮ সালের পৌষে উহা তাঁহাকে অষ্টাদশ বর্ষীয়া যুবতীতে পরিণত করিল। দেবতুল্য স্বামীর প্রথম সন্দর্শন-জনিত আনন্দ তাঁহাকে জীবনের দৈনন্দিন সুখদুঃখ হইতে উচ্চে উঠাইয়া রাখিলেও সংসারে নিরাবিল আনন্দের

ঐকালে শ্রীশ্রীমার মনোবেদনার কারণ ও দক্ষিণেশ্বরে আসিবার সঙ্কল্প।

অবসর কোথায়?—গ্রামের পুরুষেরা জল্পনা করিতে বসিয়া যখন তাঁহার স্বামীকে 'উন্মত্ত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিত, "পরিধানের কাপড় পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া হরি হরি করিয়া বেড়ায়"—ইত্যাদি নানা কথা বলিত, অথবা সমবয়স্কা রমণীগণ যখন তাঁহাকে 'পাগলের স্ত্রী' বলিয়া করুণা বা উপেক্ষার পাত্রী বিবেচনা করিত, তখন মুখে কিছু না বলিলেও তাঁহার অন্তরে দারুণ ব্যথা উপস্থিত হইত। উন্মনা হইয়া তিনি তখন চিন্তা করিতেন—তবে কি পূর্ব্বে যেমন দেখিয়াছিলাম তিনি সেরূপ আর নাই? লোকে যেমন বলিতেছে, তাঁহার কি ঐরূপ অবস্থান্তর হইয়াছে? বিধাতার নির্ব্বন্ধে যদি ঐরূপই হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার ত আর এখানে থাকা কর্ত্তব্য নহে, পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার সেবাতে নিযুক্ত থাকাই উচিত। অশেষ চিন্তার পর স্থির করিলেন, তিনি দক্ষিণেশ্বরে স্বয়ং গমনপূর্ব্বক চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিবেন, পরে—যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিবেন।

ফাল্গুনের দোলপূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুণ্যতোয়া জাহ্নবীতে স্নান করিবার জন্য বঙ্গের সুদূর প্রান্ত হইতে অনেকে ঐদিন কলিকাতায় আগমন করে। শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর দূরসম্পর্কীয়া কয়েকজন আত্মীয়া রমণী ঐ বৎসর

ঐ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার বন্দোবস্ত।

ঐজন্য আগমন করিবেন বলিয়া ইতিপূর্ব্বে স্থির করিয়াছিলেন। তিনি এখন তাঁহাদিগের সহিত গঙ্গাস্নানে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তাঁহার পিতার অভিমত না হইলে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে ভাবিয়া রমণীরা তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বুদ্ধিমান্ পিতা শুনিয়াই বুঝিলেন, কন্যা কেন এখন কলিকাতায় যাইতে অভিলাষিণী হইয়াছেন, এবং

তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং কলিকাতা আসিবার জন্য সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিলেন।

রেল-কোম্পানীর প্রসাদে সুদূর কাশী বৃন্দাবন কলিকাতার অতি সন্নিকট হইয়াছে, কিন্তু ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুর ও জয়রামবাটী উহাতে বঞ্চিত থাকিয়া যে দূরে সেই দূরেই পড়িয়া রহিয়াছে। এখনও ঐরূপ, অতএব তখনকার ত কথাই নাই—তখন বিষ্ণুপুর বা তারকেশ্বর কোন স্থানেই রেলপথ প্রস্তুত হয় নাই এবং ঘাটালকেও বাষ্পীয় জলযান কলিকাতার সহিত যুক্ত করে নাই। সুতরাং শিবিকা অথবা পদব্রজে গমনাগমন করা ভিন্ন ঐ সকল গ্রামের লোকের অন্য উপায় ছিল না এবং জমীদার প্রভৃতি ধনী লোক ভিন্ন মধ্যবিৎ গৃহস্থেরা সকলেই শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিতেন। অতএব কন্যা ও সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে শ্রীরামচন্দ্র দূরপথ পদব্রজে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ধান্যক্ষেত্রের পর ধান্যক্ষেত্র এবং মধ্যে মধ্যে কমলপূর্ণ দীর্ঘিকানিচয় দেখিতে, দেখিতে, অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃক্ষরাজির শীতল ছায়া অনুভব করিতে করিতে, তাঁহারা সকলে প্রথম দুই তিন দিন সানন্দে পথ চলিতে লাগিলেন। কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছান পর্য্যন্ত ঐ আনন্দ রহিল না। পথশ্রমে অনভ্যস্তা কন্যা পথিমধ্যে একস্থলে দারুণ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বিশেষ চিন্তান্বিত করিলেন। কন্যার ঐরূপ অবস্থায় অগ্রসর হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া তিনি চটীতে আশ্রয় লইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

নিজ পিতার সহিত শ্রীশ্রীমার পদব্রজে গঙ্গা-স্নান করিতে আগমন ও পথিমধ্যে জ্বর।

পথিমধ্যে এরূপে পীড়িতা হওয়ায় শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর অন্তঃকরণে কতদূর বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। কিন্তু এক অদ্ভুত দর্শন উপস্থিত হইয়া ঐ সময়ে তাঁহাকে আশ্বস্তা করিয়াছিল।

পীড়িতাবস্থায় শ্রীশ্রীমার অদ্ভুত দর্শন বিবরণ।

উক্ত দর্শনের কথা তিনি পরে স্ত্রীভক্তদিগকে কখন কখন নিম্নলিখিত ভাবে বলিয়াছেন—

"জ্বরে যখন একেবারে বেহুঁস্, লজ্জাসরমরহিত হইয়া পড়িয়া আছি, তখন দেখিলাম, পার্শ্বে একজন রমণী আসিয়া বসিল—মেয়েটীর রং কাল, কিন্তু এমন সুন্দর রূপ কখনও দেখি নাই!—বসিয়া আমার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল—এমন নরম ঠাণ্ডা হাত, গায়ের জ্বালা জুড়াইয়া যাইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কোথা থেকে আস্চ গা?' রমণী বলিল—'আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আস্চি।' শুনিয়া অবাক্ হইয়া বলিলাম—'দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমি মনে করিয়াছিলাম দক্ষিণেশ্বরে যাব, তাঁকে (ঠাকুরকে) দেখ্ব, তাঁর সেবা কর্ব। কিন্তু পথে জ্বর হওয়ায় আমার ভাগ্যে ঐ সব আর হইল না।' রমণী বলিল—'সে কি! তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বৈ কি, ভাল হয়ে—সেখানে যাবে, তাঁকে দেখ্বে। তোমার জন্যই ত তাঁকে সেখানে আট্কে রেখেছি।' আমি বলিলাম, 'বটে? তুমি আমাদের কে হও গা?' মেয়েটী বল্লে, 'আমি তোমার বোন্ হই।' আমি বলিলাম, 'বটে? তাই তুমি এসেছ।' ঐরূপ কথাবার্ত্তার পরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম!"

রাত্রে স্বপ্নযোগে শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছান ও ঠাকুরের আচরণ।

প্রাতঃকালে উঠিয়া শ্রীরামচন্দ্র দেখিলেন, কন্যার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে! পথিমধ্যে নিরুপায় হইয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা তিনি তাঁহাকে লইয়া ধীরে ধীরে পথ অতিবাহন করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। রাত্রে পূর্ব্বোক্ত দর্শনে উৎসাহিতা হইয়া শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী তাঁহার ঐ পরামর্শ সাগ্রহে অনুমোদন করিলেন। কিছু দূর যাইতে না যাইতে একখানি শিবিকাও পাওয়া গেল। তাঁহার পুনরায় জ্বর আসিল, কিন্তু পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় প্রবল বেগে না আসায়

তিনি উহার প্রকোপে একেবারে অক্ষম হইয়া পড়িলেন না। ঐ বিষয়ে কাহাকে কিছু বলিলেনও না। ক্রমে পথের শেষ হইল এবং রাত্রি নয়টার সময় শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

ঠাকুর তাঁহাকে সহসা ঐরূপে রোগাক্রান্তা হইয়া আসিতে দেখিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর বাড়িবে বলিয়া নিজ গৃহে ভিন্ন শয্যায় তাঁহার শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং দুঃখ করিয়া বারম্বার বলিতে লাগিলেন, 'তুমি এত দিনে আসিলে? আর কি আমার সেজ বাবু (মথুর বাবু) আছে যে তোমার যত্ন হবে?' ঔষধ পথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্তে তিন চারি দিনেই শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী আরোগ্যলাভ করিলেন। ঐ তিন চারি দিন ঠাকুর তাঁহাকে দিবারাত্র নিজ গৃহে রাখিয়া ঔষধ পথ্যাদি সকল বিষয়ের স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিলেন, পরে নহবত ঘরে নিজ জননীর নিকটে তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটিল, পরের কথায় উদিত হইয়া যে সন্দেহ মেঘের ন্যায় বিশ্বাস-সূর্য্যকে আবৃত করিতে উপক্রম করিয়াছিল, ঠাকুরের যত্ন-প্রবুদ্ধ অনুরাগপবনে তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া এখন কোথায় বিলীন হইল। শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, ঠাকুর পূর্ব্বে যেমন ছিলেন এখনও তদ্রূপ আছেন—সংসারী মানব না বুঝিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নানা রটনা করিয়াছে। দেবতা দেবতাই আছেন এবং বিস্মৃত হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় সমানভাবে কৃপাপরবশ রহিয়াছেন! অতএব কর্ত্তব্য স্থির হইতে বিলম্ব হইল না। প্রাণের উল্লাসে তিনি নহবতে থাকিয়া দেবতার ও দেবজননীর সেবায় নিযুক্তা হইলেন—এবং তাঁহার পিতা

ঠাকুরের ঐরূপ আচরণে শ্রীশ্রীমার সানন্দে তথায় অবস্থিতি।

কন্যার আনন্দে আনন্দিত হইযা কয়েক দিন ঐ স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে নিজ গ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

সন ১২৭৪ সালে কামাবপুকুরে অবস্থান কবিবার কালে শ্রীমতী মাতাঠাকুবাণীব আগমনে ঠাকুবেব মনে যে চিন্তাপবম্পবার উদয হইয়াছিল তাহা আমবা পাঠককে বলিয়াছি। ব্রহ্মবিজ্ঞানে দৃঢপ্রতিষ্ঠালাভসম্বন্ধীয আচার্য্য শ্রীমৎ তোতাপুবীব কথা আলোচনা পূর্ব্বক তিনি ঐ কালে নিজ সাধন-লব্ধ বিজ্ঞানেব পবীক্ষা করিতে এবং পত্নীব প্রতি নিজ কর্ত্তব্য পবিপালনে অগ্রসব হইয়াছিলেন।

ঠাকুরেব নিজ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানেব পবীক্ষা ও পত্নীকে শিক্ষাপ্রদান।

কিন্তু ঐ সমযে তদুভয অনুষ্ঠানের আবম্ভ মাত্র কবিয়াই তাঁহাকে কলিকাতায ফিবিতে হইযাছিল। শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীকে নিকটে পাইযা তিনি এখন পুনবায ঐ দুই বিষযে মনোনিবেশ কবিলেন।

প্রশ্ন উঠিতে পাবে—পত্নীকে সঙ্গে লইযা দক্ষিণেশ্বরে আসিযা তিনি ইতিপূর্ব্বেই ত ঐরূপ কবিতে পাবিতেন, ঐরূপ করেন নাই কেন? উত্তবে বলিতে হয—সাধাবণ মানব ঐরূপ কবিত, সন্দেহ নাই; ঠাকুব ঐ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না বলিযা ঐরূপ আচবণ কবেন নাই। ঈশ্বরেব প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভব কবিযা যাঁহাবা জীবনেব প্রতি-ক্ষণ প্রতি কার্য্য কবিতে অভ্যস্ত হইযাছেন, তাঁহাবা স্বয়ং মতলব আঁটিযা কখন কোন কার্য্যে অগ্রসব হন না। আত্মকল্যাণ বা অপ-রের কল্যাণ সাধন করিতে তাঁহাবা আমাদিগেব ন্যায পবিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র বুদ্ধিব সহায়তা না লইযা শ্রীভগবানেব বিবাট বুদ্ধিব সহাযতা ও ইঙ্গিত প্রতীক্ষা কবিযা থাকেন। সেজন্য স্বেচ্ছায পবীক্ষা দিতে তাঁহারা সর্ব্বথা পরাঙ্মুখ হন। কিন্তু বিবাটেচ্ছার অনুগামী হইয়া চলিতে

ইতিপূর্ব্বে ঠাকুরের ঐরূপ অনুষ্ঠান না কবিবাব কাবণ।

চলিতে যদি কখন পরীক্ষা দিবার কাল স্বতঃ উপস্থিত হয় তবে তাঁহারা ঐ পরীক্ষা প্রদানের জন্য সানন্দে অগ্রসর হন। ঠাকুর স্বেচ্ছায় আপন ব্রহ্মবিজ্ঞানের গভীরতা পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হয়েন নাই। কিন্তু যখন দেখিলেন পত্নী কামারপুকুরে তাঁহার সকাশে আগমন করিয়াছেন এবং তৎপ্রতি নিজ কর্ত্তব্য প্রতিপালনে অগ্রসর হইলে তাঁহাকে ঐ বিষয়ে পরীক্ষা প্রদান করিতে হইবে, তখনই ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আবার ঈশ্বরেচ্ছায় ঐ অবসর চলিয়া যাইয়া যখন তাঁহাকে কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক পত্নীর নিকট হইতে দূরে থাকিতে হইল তখন তিনি ঐরূপ অবসর পুনরানয়নের জন্য স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইলেন না। শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর যত দিন না স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনয়নের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করিলেন না। সাধারণ বুদ্ধিসহায়ে আমরা ঠাকুরের আচরণের ঐরূপে সামঞ্জস্য করিতে পারি, তদ্ভিন্ন বলিতে পারি যে, যোগদৃষ্টিসহায়ে তিনি বিদিত হইয়া ছিলেন, ঐরূপ করাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত।

সে যাহা হউক, পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্য পালনপূর্ব্বক পরীক্ষা প্রদানের অবসর উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া ঠাকুর এখন তদ্বিষয়ে সানন্দে অগ্রসর হইলেন এবং অবসর পাইলেই মাতাঠাকুরাণীকে মানবজীবনের উদ্দেশ্য এবং কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, এই সময়েই তিনি মাতাঠাকুরাণীকে বলিয়াছিলেন, 'চাঁদা মামা যেমন সকল শিশুর মামা তেমনি ঈশ্বর সকলেরই আপনার, তাঁহাকে ডাকিবার সকলেরই অধিকার আছে, যে ডাকিবে তিনি তাহাকেই দর্শনদানে কৃতার্থ করিবেন, তুমি ডাক ত তুমিও তাঁহার দেখা পাইবে। কেবল উপদেশ

ঠাকুরের শিক্ষাদানের প্রণালী ও শ্রীশ্রীমার সহিত এইকালে আচরণ।

মাত্র দানেই ঠাকুরের শিক্ষার অবসান হইত না; কিন্তু শিষ্যকে নিকটে রাখিয়া ভালবাসায় সর্ব্বতোভাবে আপনার করিয়া লইয়া তিনি তাহাকে প্রথমে উপদেশ প্রদান করিতেন, পরে শিষ্য উহা কার্য্যে কতদূর প্রতিপালন করিতেছে সর্ব্বদা তদ্বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেন এবং ভ্রমবশতঃ সে বিপরীত অনুষ্ঠান করিলে তাহাকে বুঝাইয়া সংশোধন করিয়া দিতেন। শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর সম্বন্ধে তিনি যে, এখন পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। প্রথম দিন হইতে ভালবাসায় তিনি তাঁহাকে কতদূর আপনার করিয়া লইয়াছিলেন তাহা আগমনমাত্র তাঁহাকে নিজ গৃহে বাস করিতে দেওয়াতে এবং আরোগ্য হইবার পরে প্রত্যহ রাত্রে নিজ শয্যায় শয়ন করিবার অনুমতি প্রদানে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। মাতাঠাকুরাণীর সহিত ঠাকুরের এইকালের দিব্য আচরণের কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র * বলিয়াছি, এজন্য এখানে তাহার আর পুনরুল্লেখ করিব না। দুই একটি কথা, যাহা ইতিপূর্ব্বে বলা হয় নাই, তাহাই কেবল বলিব।

শ্রীশ্রীমাকে ঠাকুর কি ভাবে দেখিতেন।

শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী এক দিন এই সময়ে ঠাকুরের পদসম্বাহন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আমাকে তোমার কি বলিয়া বোধ হয়?' ঠাকুর তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, 'যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়াছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করিতেছেন, এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করিতেছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলিয়া তোমাকে সর্ব্বদা সত্য সত্য দেখিতে পাই।'

---

* গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ, ৪র্থ অধ্যায়।

অন্য এক দিবস শ্রীশ্রীমাকে নিজ পার্শ্বে নিদ্রিতা দেখিয়া ঠাকুর আপন মনকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—"মন ইহারই নাম স্ত্রীশরীর লোকে ইহাকে পরম উপাদেয় ভোগ্য বস্তু বলিয়া জানে এবং ভোগ করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ লালায়িত হয়; কিন্তু উহা গ্রহণ করিলে দেহেই আবদ্ধ থাকিতে হয় সচ্চিদানন্দঘন ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না; ভাবের ঘরে চুরি করিও না, পেটে একখানা মুখে একখানা রাখিও না, সত্য বল তুমি উহা গ্রহণ করিতে চাও অথবা ঈশ্বরকে চাও? যদি উহা চাও ত এই তোমার সম্মুখে রহিয়াছে গ্রহণ কর।" ঐরূপ বিচারপূর্ব্বক ঠাকুর শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইবামাত্র মন কুণ্ঠিত হইয়া সহসা সমাধিপথে এমন বিলীন হইয়া গেল যে, সে রাত্রিতে উহা আর সাধারণ ভাবভূমিতে অবরোহণ করিল না। ঈশ্বরের নাম শ্রবণ করাইয়া পরদিন বহু যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করাইতে হইয়াছিল!

ঠাকুরের নিজ মনের সংযম পরীক্ষা।

ঐরূপে পূর্ণযৌবন ঠাকুর এবং নবযৌবনসম্পন্না শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর এই কালের দিব্য লীলাবিলাসসম্বন্ধে যে সকল কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি, তাহা জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে অপর কোনও মহাপুরুষের সম্বন্ধে শ্রবণ করা যায় না। উহাতে মুগ্ধ হইয়া মানব-হৃদয় স্বতঃই ইঁহাদিগের দেবত্বে বিশ্বাসবান্ হইয়া উঠে এবং অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা ইঁহাদিগের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিতে বাধ্য হয়। দেহবোধবিরহিত ঠাকুরের প্রায় সমস্ত রাত্রি এইকালে সমাধিতে অতিবাহিত হইত এবং সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া বাহ্যভূমিতে অবরোহণ করিলেও তাঁহার মন

পত্নীকে লইয়া ঠাকুরের আচরণের ন্যায় আচরণ কোন অবতার-পুরুষ করেন নাই। উহার ফল।

এত উচ্চে অবস্থান করিত যে, সাধারণমানবের ন্যায় দেহবুদ্ধি উহাতে একক্ষণের জন্যও উদিত হইত না।

ঐরূপে দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস অতীত হইয়া ক্রমে বৎসরাধিক কাল অতীত হইল—কিন্তু এই অদ্ভুত ঠাকুর ও ঠাকুরাণীর সংযমের বাঁধ ভঙ্গ হইল না।—একক্ষণের জন্য ভুলিয়াও তাঁহাদিগের মন, প্রিয় বোধ করিয়া দেহের রমণ কামনা করিল না।

শ্রীশ্রীমার অলৌকিকত্ব-সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা।

ঐকালের কথা স্মরণ করিয়া ঠাকুর পরে আমাদিগকে কখন কখন বলিয়াছেন, "ও (শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী) যদি এত ভাল না হইত, আত্মহারা হইয়া তখন আমাকে আক্রমণ করিত তাহা হইলে সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেহবুদ্ধি আসিত কি না, কে বলিতে পারে? বিবাহের পরে মাকে (৺জগদম্বাকে) ব্যাকুল হইয়া ধরিয়াছিলাম যে, মা আমার পত্নীর ভিতর হইতে কামভাব এককালে দূর করিয়া দে—ওর (শ্রীশ্রীমার) সঙ্গে একত্র বাস করিয়া এইকালে বুঝিয়াছিলাম, মা সে কথা সত্য সত্যই শ্রবণ করিয়াছিলেন।"

বৎসরাধিক কাল অতীত হইলেও মনে একক্ষণের জন্য যখন দেহ-বুদ্ধির উদয় হইল না, এবং শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীকে কখন ৺জগদম্বা অংশভাবে এবং কখন সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্মভাবে দৃষ্টি করা ভিন্ন অপর কোন ভাবে দেখিতে ও ভাবিতে যখন সমর্থ হইলেন না, তখন ঠাকুর বুঝিলেন, শ্রীশ্রীজগন্মাতা কৃপা করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়াছেন এবং মার কৃপায় তাঁহার মন এখন সহজ স্বাভাবিক ভাবে দিব্যভাবভূমিতে আরূঢ় হইয়া সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছে। শ্রীশ্রীজগন্মাতার প্রসাদে তিনি এখন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, তাঁহার সাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঠাকুরের সঙ্কল্প।

শ্রীপাদপদ্মে যেন এতদূর তন্ময় হইয়াছে যে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মার ইচ্ছার বিরোধী কোন ইচ্ছাই এখন আর উহাতে উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। অতঃপর শ্রীশ্রীজগদম্বার নিয়োগে তাঁহার প্রাণে এক অদ্ভুত বাসনার উদয় হইল এবং কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তিনি উহা এখন কার্য্যে পরিণত করিলেন। ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকটে ঐ বিষয়ে সময়ে সময়ে যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাই এখন সম্বদ্ধভাবে আমরা পাঠককে বলিব।

সন ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের অর্দ্ধেকের উপর গত হইয়াছে। আজ অমাবস্যা, ফলাহারিণী কালিকা পূজার পুণ্যদিবস। সুতরাং দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আজ বিশেষ পর্ব্ব উপস্থিত। ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বাকে পূজা করিবার মানসে আজ বিশেষ আয়োজন করিয়াছেন। ঐ আয়োজন কিন্তু মন্দিরে না হইয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারে গুপ্তভাবে তাঁহার গৃহেই হইয়াছে। পূজাকালে ৺দেবীকে বসিতে দিবার জন্য আলিম্পন-ভূষিত একখানি পীঠ পূজকের আসনের দক্ষিণপার্শ্বে স্থাপিত হইয়াছে। সূর্য্য অস্তে গমন করিল—ক্রমে গাঢ় তিমিরাবগুণ্ঠনে অমাবস্যার নিশি সমাগতা হইল। ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়কে অদ্য রাত্রিকালে মন্দিরে ৺দেবীর বিশেষপূজা করিতে হইবে, সুতরাং ঠাকুরের পূজার আয়োজনে যথাসাধ্য সহায়তা করিয়া সে মন্দিরে চলিয়া যাইল এবং ৺রাধাগোবিন্দের রাত্রিকালের সেবা-পূজা সমাপনান্তর দীনু পূজারি আসিয়া ঠাকুরকে ঐ বিষয়ে সহায়তা করিতে লাগিল। ৺দেবীর রহস্যপূজার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইতে রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীকে পূজাকালে উপস্থিত থাকিতে ঠাকুর ইতি-পূর্ব্বে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তিনিও ঐ গৃহে এখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর পূজায় বসিলেন।

৺ষোড়শী পূজার আয়োজন।

পূজা-দ্রব্যসকল সংশোধিত হইয়া পূর্ব্বকৃত্য সম্পাদিত হইল। ঠাকুর এইবার আলিম্পনভূষিত পীঠে শ্রীশ্রীমাকে উপবেশনের জন্য ইঙ্গিত করিলেন। পূজা দর্শন করিতে করিতে শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী ইতিপূর্ব্বে অর্দ্ধ-বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং কি করিতেছেন তাহা সম্যক্ না বুঝিয়া মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় তিনি এখন পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট ঠাকুরের দক্ষিণভাগে উত্তরাস্যা হইয়া উপবিষ্টা হইলেন। সম্মুখস্থ কলসের মন্ত্রপূত বারি দ্বারা ঠাকুর বারম্বার শ্রীশ্রীমাকে যথাবিধানে অভিষিক্তা করিলেন। অনন্তর মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া তিনি এখন প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন—

শ্রীশ্রীমাকে অভিষেকপূর্ব্বক ঠাকুরের পূজা করণ।

"হে বালে, হে সর্ব্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইঁহার (শ্রীশ্রীমার) শরীরমনকে পবিত্র করিয়া ইঁহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্ব্বকল্যাণ সাধন কর।"

অতঃপর শ্রীশ্রীমার অঙ্গে মন্ত্রসকলের যথাবিধানে ন্যাসপূর্ব্বক ঠাকুর সাক্ষাৎ ৺দেবীজ্ঞানে তাঁহাকে ষোড়শোপচারে পূজা করিলেন এবং ভোগ নিবেদন করিয়া নিবেদিত বস্তু সকলের কিয়দংশ স্বহস্তে তাঁহার মুখে প্রদান করিলেন। বাহ্যজ্ঞানতিরোহিত হইয়া শ্রীশ্রীমা সমাধিস্থা হইলেন। ঠাকুরও অর্দ্ধবাহ্যদশায় মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে সম্পূর্ণ সমাধিমগ্ন হইলেন। সমাধিস্থ পূজক সমাধিস্থা দেবীর সহিত আত্মস্বরূপে পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হইলেন!

পূজাশেষে সমাধি ও ঠাকুরের জপপূজাদি ৺দেবীচরণে সমর্পণ।

কতক্ষণ কাটিয়া গেল! নিশার দ্বিতীয় প্রহর বহুক্ষণ অতীত হইল! আত্মারাম ঠাকুরের এইবার বাহ্যসংজ্ঞার কিছু কিছু লক্ষণ দেখা গেল! পূর্ব্বের ন্যায় অর্দ্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া তিনি এখন ৺দেবীকে আত্মনিবেদন করিলেন। অনন্তর আপনার সহিত সাধনার ফল এবং

জপের মালা প্রভৃতি সর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীদেবীপাদপদ্মে চিরকালের নিমিত্ত বিসর্জ্জনপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন—

"হে সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে সর্ব্বকর্ম্মনিষ্পন্নকারিণি, হে শরণ-দায়িনী ত্রিনয়নী শিব-গেহিনী গৌরি, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম করি।"

পূজা শেষ হইল—মূর্ত্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে ঈশ্বরীর উপাসনাপূর্ব্বক ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি হইল—তাঁহার দেব-মানবত্ব সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করিল।

৺ষোড়শী-পূজার পরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী প্রায় পাঁচ মাস কাল ঠাকুরের নিকটে অবস্থান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় ঐকালে তিনি ঠাকুর এবং ঠাকুরের জননীর সেবায় নিযুক্তা থাকিয়া দিবাভাগ নহবত ঘরে অতিবাহিত করিয়া রাত্রিকালে ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে শয়ন করিতেন। দিবারাত্র ঠাকুরের ভাবসমাধির বিরাম ছিল না এবং কখন কখন নির্ব্বিকল্প সমাধিপথে তাঁহার মন সহসা এমন বিলীন হইত যে, মৃতের লক্ষণসকল তাঁহার দেহে প্রকাশিত হইত! কখন ঠাকুরের ঐরূপ সমাধি হইবে এই আশঙ্কায় শ্রীশ্রীমার রাত্রিকালে নিদ্রা হইত না। বহুক্ষণ সমাধিস্থ হইবার পরেও ঠাকুরের সংজ্ঞা হইতেছে না দেখিয়া ভীতা ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া তিনি এক রাত্রিতে হৃদয় এবং অন্যান্য সকলের নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছিলেন। পরে হৃদয় আসিয়া বহুক্ষণ নাম শুনাইলে ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হইয়াছিল। সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর সকল কথা জানিতে পারিয়া শ্রীশ্রীমার রাত্রিকালে প্রত্যহ নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে জানিয়া নহবতে তাঁহার জননীর নিকটে

ঠাকুরের নিরন্তর সমাধির জন্য শ্রীশ্রীমার নিদ্রায় ব্যাঘাত হওয়ায় অন্যত্র শয়ন এবং কামারপুকুরে প্রত্যাগমন।

মাতাঠাকুরাণীর শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ঐরূপে এক বৎসর চারি মাসকাল ঠাকুরের নিকটে দক্ষিণেশ্বরে অতিবাহিত করিয়া সম্ভবতঃ সন ১২৮০ সালের কার্ত্তিক মাসের কোন সময়ে শ্রীশ্রীমা কামারপুকুরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

একবিংশ অধ্যায়।

সাধকভাবের শেষ কথা।

৺ষোড়শী-পূজা সম্পন্ন করিয়া ঠাকুরের সাধন যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইল। ঈশ্বরানুরাগরূপ যে পুণ্য হুতবহ হৃদয়ে নিরন্তর প্রজ্জ্বলিত থাকিয়া তাঁহাকে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অস্থির করিয়া নানাভাবে সাধনায় প্রবৃত্ত করাইয়াছিল এবং ঐকালের পরেও সম্পূর্ণরূপে শান্ত হইতে দেয় নাই, পূর্ণাহুতি প্রাপ্ত হইয়া এতদিনে তাহা প্রশান্তভাব ধারণ করিল। ঐরূপ না হইয়াই বা উহা এখন করিবে কি—ঠাকুরের

৺ষোড়শীপূজার পরে ঠাকুরের সাধনবাসনার নিবৃত্তি।

আপনার বলিবার এখন আর কি আছে, যাহা তিনি উহাতে ইতিপূর্ব্বে আহুতি প্রদান না করিয়াছেন?—ধন মান নাম যশাদি পৃথিবীর সমস্ত ভোগাকাঙ্ক্ষা বহুপূর্ব্বেই তিনি উহাতে বিসর্জ্জন করিয়াছেন! হৃদয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারাদি সকলকেও উহার করাল মুখে একে একে আহুতি দিয়াছেন।—ছিল কেবল বিবিধ সাধন পথে অগ্রসর হইয়া নানাভাবে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে দেখিবার বাসনা—তাহাও এখন তিনি উহাতে নিঃশেষে অর্পণ করিলেন। অতএব প্রশান্ত না হইয়া উহা এখন আর করিবে কি?

ঠাকুর দেখিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহার প্রাণের ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়াছেন—পরে, নানা অদ্ভুত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিসকলের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করাইয়া বিবিধ শাস্ত্রীয় পথে অগ্রসর করিয়া ঐ দর্শন মিলাইয়া লইবার অবসর দিয়াছেন—অতএব, তাঁহার নিকটে তিনি এখন আর কি চাহিবেন!

কারণ, সর্ব্বধর্ম্মমতের সাধনা সম্পূর্ণ করিয়া অপর আর কি করিবেন।

দেখিলেন চৌষট্টিখানা তন্ত্রের সকল সাধন একে একে সম্পন্ন হইয়াছে, বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত পঞ্চভাবাশ্রিত যতপ্রকার সাধনপথ ভারতে প্রবর্ত্তিত আছে, সে সকল যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সনাতন বৈদিকমার্গানুসারী হইয়া সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্গুণ নিরাকাররূপের দর্শন হইয়াছে এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার অচিন্ত্যলীলায় ভারতের বাহিরে উদ্ভূত ইসলাম মতের সাধনায় প্রবর্ত্তিত হইয়াও যথাযথ ফল হস্তগত হইয়াছে—সুতরাং তাঁহার নিকটে তিনি এখন আর কি দেখিতে বা শুনিতে চাহিবেন।

শ্রীশ্রীঈশাপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে ঠাকুরের অদ্ভুত উপায়ে সিদ্ধিলাভ।

এই কালের একবৎসর পরে কিন্তু ঠাকুরের মন আবার অন্য এক সাধন পথে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে দর্শন করিবার জন্য উন্মুক্ত হইয়াছিল। তখন তিনি শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ মল্লিকের সহিত পরিচিত হইয়াছেন এবং তাঁহার নিকটে বাইবেল শ্রবণপূর্ব্বক শ্রীশ্রীঈশার পবিত্র জীবনের এবং সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তনের কথা জানিতে পারিয়াছেন। ঐ বাসনা মনে ঈষন্মাত্র উদয় হইতে না হইতে শ্রীশ্রীজগদম্বা উহা অদ্ভুত উপায়ে পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন, সেইহেতু উহার জন্য তাঁহাকে বিশেষ কোনরূপ চেষ্টা করিতে হয় নাই। ঘটনা এইরূপ হইয়াছিল—দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর দক্ষিণ পার্শ্বে যদুনাথ মল্লিকের উদ্যান বাটী; ঠাকুর ঐ স্থানে মধ্যে মধ্যে বেড়াইতে যাইতেন। যদুনাথ ও তাঁহার মাতা ঠাকুরকে দর্শন করিয়া অবধি তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, সুতরাং উদ্যানে তাঁহারা উপস্থিত না থাকিলেও ঠাকুর তথায় বেড়াইতে যাইলে কর্ম্মচারিগণ বাবুদের বৈঠকখানা উন্মুক্ত করিয়া তাঁহাকে কিছুকাল বসিবার ও বিশ্রাম করিবার জন্য অনুরোধ করিত। উক্ত গৃহের দেয়ালে অনেকগুলি উত্তম চিত্র বিলম্বিত ছিল। মাতৃক্রোড়ে

অবস্থিত শ্রীশ্রীঈশার বালগোপাল মূর্তিও একখানি তন্মধ্যে ছিল। ঠাকুর বলিতেন, একদিন উক্ত ঘরে বসিয়া তিনি ঐ ছবিখানি তন্ময় হইয়া দেখিতেছিলেন এবং শ্রীশ্রীঈশার অদ্ভুত জীবনকথা ভাবিতে ছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, ছবিখানি যেন জীবন্ত জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিয়াছে এবং ঐ অদ্ভুত দেব-জননী ও দেব-শিশুর অঙ্গ হইতে জ্যোতিরশ্মিসমূহ তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার মানসিক ভাবসকল আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেছে! জন্মগত হিন্দুসংস্কার-সমূহ অন্তরের নিভৃত কোণে লীন হইয়া ভিন্ন সংস্কারসকল উহাতে উদয় হইতেছে দেখিয়া ঠাকুর তখন নানাভাবে আপনাকে সামলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বাকে কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন—'মা, আমাকে এ কি করিতেছিস্, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ঐ সংস্কারতরঙ্গ প্রবলবেগে উত্থিত হইয়া তাঁহার মনের হিন্দুসংস্কার সমূহকে এককালে তলাইয়া দিল। তখন দেবদেবীসকলের প্রতি ঠাকুরের অনুরাগ, ভালবাসা কোথায় বিলীন হইল এবং শ্রীশ্রী-ঈশার ও তৎপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আসিয়া হৃদয় অধিকারপূর্ব্বক, খ্রীষ্টান পাদরিসমূহ প্রার্থনামন্দিরে শ্রীশ্রীঈশার মূর্ত্তি সম্মুখে ধূপ-দীপ দান করিতেছে, অন্তরের ব্যাকুলতা কাতর প্রার্থনায় নিবেদন করিতেছে—এই সকল বিষয় ঠাকুরকে দেখাইতে লাগিল। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ফিরিয়া নিরন্তর ঐসকল বিষয়ের ধ্যানেই মগ্ন রহিলেন এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার মন্দিরে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার কথা এককালে ভুলিয়া যাইলেন। তিন দিন পর্য্যন্ত ঐ ভাবতরঙ্গ তাঁহার উপর ঐরূপে প্রভুত্ব করিয়া বর্ত্তমান রহিল। পরে তৃতীয় দিবসের অবসানে ঠাকুর পঞ্চবটী তলে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন, এক অদৃষ্টপূর্ব্ব দেব-মানব, সুন্দর গৌরবর্ণ, স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহাকে অবলোকন করিতে করিতে তাঁহার দিকে

অগ্রসর হইতেছেন। ঠাকুর দেখিয়াই বুঝিলেন, ইনি বিদেশী এবং বিজাতিসম্ভূত। দেখিলেন, বিশ্রান্ত নয়নযুগলে ইহার মুখের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে এবং নাসিকা 'একটু চাপা' হইলেও উহাতে ঐ সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম সাধিত হয় নাই। ঐ সৌম্যমুখমণ্ডলের অপূর্ব্ব দেবভাব দেখিয়া ঠাকুর মুগ্ধ হইলেন এবং বিস্মিত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন—কে ইনি? দেখিতে দেখিতে ঐ মূর্ত্তি নিকটে আগমন করিল এবং ঠাকুরের পূত হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ধ্বনিত হইতে লাগিল, 'ঈশামসি—দুঃখযাতনা হইতে জীবকুলকে উদ্ধারের জন্য যিনি হৃদয়ের শোণিত দান এবং মানব হস্তে অশেষ নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন, সেই ঈশ্বরাভিন্ন পরম যোগী ও প্রেমিক খ্রীষ্ট ঈশামসি।'—তখন দেব মানব ঈশা ঠাকুরকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার শরীরে লীন হইলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ঠাকুরের মন সগুণ বিরাটব্রহ্মের সহিত কতক্ষণ পর্য্যন্ত একীভূত হইয়া রহিল।—ঐরূপে শ্রীশ্রীঈশার দর্শনলাভ করিয়া ঠাকুর তাঁহার অবতারত্বসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঈশাসম্বন্ধীয় ঠাকুরের দর্শন কিরূপে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়।

উহার বহুকাল পরে আমরা যখন ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইতেছি তখন তিনি একদিন শ্রীশ্রীঈশার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'হাঁ রে, তোরা ত বাইবেল পড়িয়াছিস্, বল্, দেখি উহাতে ঈশার শারীরিক গঠন সম্বন্ধে কি লেখা আছে?—তাঁহাকে দেখিতে কিরূপ ছিল?' আমরা বলিলাম, 'মহাশয় ঐ কথা বাইবেলের কোন স্থানে উল্লিখিত দেখি নাই; তবে, ঈশা য়াহুদি জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; অতএব সুন্দর গৌরবর্ণ ছিলেন এবং তাঁহার চক্ষু বিশ্রান্ত এবং নাসিকা দীর্ঘ টিকাল ছিল নিশ্চয়!' ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, কিন্তু আমি দেখিয়াছি

তাঁহার নাক একটু চাপা। কেন ঐরূপ দেখিয়াছিলাম কে জানে!” ঠাকুরের ঐ কথায় তখন কিছু না বলিলেও আমরা ভাবিয়াছিলাম তাঁহার ভাবাবেশে দৃষ্ট মূর্ত্তি ঈশার বাস্তবিক মূর্ত্তির সহিত কেমন করিয়া মিলিবে?—যাহুদি জাতীয় পুরুষসকলের ন্যায় ঈশার নাসিকা টিকাল ছিল নিশ্চয়। কিন্তু ঠাকুরের শরীর রক্ষার কিছুকাল পরে জানিতে পারিলাম, ঈশার শারীরিক গঠন সম্বন্ধে তিন প্রকার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে এবং উহার মধ্যে একটীতে তাঁহার নাসিকা চাপা ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে।

শ্রীশ্রীবুদ্ধের অবতারত্ব ও তাঁহার ধর্ম্মমতসম্বন্ধে ঠাকুরের কথা।

ঠাকুরকে ঐরূপে পৃথিবীতে প্রচলিত প্রধান প্রধান যাবতীয় ধর্ম্ম-মতসকলে সিদ্ধ হইতে দেখিয়া পাঠকের মনে প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ ধারণা ছিল। সেজন্য ঐ বিষয়ে আমাদের যাহা জানা আছে তাহা এখানে লিপিবদ্ধ করা ভাল। ভগবান্ শ্রীবুদ্ধদেব সম্বন্ধে ঠাকুর হিন্দুসাধারণে যেমন বিশ্বাস করিয়া থাকে সেইরূপ বিশ্বাস করিতেন; অর্থাৎ শ্রীবুদ্ধদেবকে তিনি ঈশ্বরাবতার বলিয়া শ্রদ্ধা ও পূজা সর্ব্বকাল অর্পণ করিতেন এবং পুরীধামস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-সুভদ্রা-বলভদ্ররূপ ত্রিরত্নমূর্ত্তিতে শ্রীভগবান বুদ্ধাবতারের প্রকাশ অদ্যাপি বর্ত্তমান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদে ভেদবুদ্ধির লোপ হইয়া মানবসাধারণের জাতিবুদ্ধি বিরহিত হওয়া রূপ উক্ত ধামের মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়া তিনি তথায় যাইবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু তথায় গমন করিলে নিজ শরীর নাশের সম্ভাবনা জানিতে পারিয়া এবং যোগদৃষ্টি-সহায়ে শ্রীশ্রীজগদম্বার ঐ বিষয়ে অন্যরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়া সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।* গাঙ্গবারিকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মবারি বলিয়া

* গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ, ৩য় অধ্যায়।

ঠাকুরের সতত বিশ্বাসের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদী অন্ন গ্রহণে মানবের বিষয়াসক্ত মন তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয় এবং আধ্যাত্মিক ভাব ধারণের উপযোগী হয়, এ কথাতেও তিনি ঐরূপ দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। বিষয়ী লোকের সঙ্গে কিছুকাল অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইলে তিনি উহার পরেই কিঞ্চিৎ গাঙ্গবারি ও 'আট্‌কে' মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহার শিষ্যবর্গকেও ঐরূপ করিতে বলিতেন। শ্রীভগবান্ বুদ্ধাবতারে ঠাকুরের বিশ্বাসসম্বন্ধে উপরোক্ত কথাগুলি ভিন্ন আরও একটী কথা আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম। ঠাকুরের পরম অনুগত ভক্ত মহাকবি শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় শ্রীশ্রীবুদ্ধাবতারের লীলাময় জীবন যখন নাটকাকারে প্রকাশিত করেন তখন ঠাকুর উহা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব ঈশ্বরাবতার ছিলেন ইহা নিশ্চয়, তৎপ্রবর্ত্তিত মতে এবং বৈদিক জ্ঞানমার্গে কোন প্রভেদ নাই। আমাদিগের ধারণা ঠাকুর যোগদৃষ্টিসহায়ে ঐ কথা জানিয়াই ঐরূপ বলিয়াছিলেন।

জৈনধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক তীর্থঙ্করসকলের এবং শিখধর্ম্মপ্রবর্ত্তক গুরু নানক হইতে আরম্ভ করিয়া গুরু গোবিন্দ পর্য্যন্ত দশ গুরুর অনেক কথা ঠাকুর পরজীবনে জৈন এবং শিখধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকটে শুনিতে পারিয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার ঐ সকল সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকের উপরে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল। অন্যান্য দেব দেবীর আলেখ্যের সহিত তাঁহার গৃহের এক পার্শ্বে মহাবীর তীর্থঙ্করের একটী প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি এবং শ্রীশ্রীঈশার একখানি আলেখ্য স্থাপিত ছিল। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঐ সকল আলেখ্যের এবং তদুভয়ের সম্মুখে ঠাকুর ধূপ ধূনা প্রদান করিতেন। ঐরূপে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন

ঠাকুরের জৈন ও শিখধর্ম্মমতে ভক্তিবিশ্বাস।

করিলেও কিন্তু আমরা তাঁহাকে তীর্থঙ্করদিগের অথবা দশ গুরুর মধ্যে কাহাকেও ঈশ্বরাবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে শ্রবণ করি নাই। শিখদিগের দশ গুরু সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন, "উহারা সকলে জনক ঋষির অবতার—শিখদিগের নিকট শুনিয়াছি, রাজর্ষি জনকের মনে মুক্তিলাভ করিবার পূর্ব্বে লোককল্যাণ সাধন করিবার কামনা উদয় হইয়াছিল এবং সেজন্য তিনি নানকাদি গোবিন্দ পর্য্যন্ত দশ গুরুরূপে দশবার জন্মগ্রহণ করিয়া শিখজাতির মধ্যে ধর্ম্ম সংস্থাপনপূর্ব্বক পর-ব্রহ্মের সহিত চিরকালের নিমিত্ত মিলিত হইয়াছিলেন, শিখদিগের ঐ কথা মিথ্যা হইবার কোনও কারণ নাই।"

সে যাহা হউক, সর্ব্বসাধনে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুরের কতকগুলি অসাধারণ উপলব্ধি হইয়াছিল। ঐ উপলব্ধিগুলির কতকগুলি ঠাকুরের নিজ সম্বন্ধে ছিল এবং কতকগুলি সাধারণ আধ্যাত্মিক বিষয়সম্বন্ধে ছিল। উহার কিছু কিছু বর্ত্তমান গ্রন্থে আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠককে বলিলেও প্রধান প্রধানগুলির এখানে উল্লেখ করিতেছি। সাধনকালের অবসানে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্মাতার সহিত নিত্যযুক্ত হইয়া ভাবমুখে থাকিবার কালে ঐ উপলব্ধিগুলির সম্যক্ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদিগের ধারণা। তিনি যোগদৃষ্টিসহায়ে ঐ উপলব্ধিসকল প্রত্যক্ষ করিলেও সাধারণ মানব-বুদ্ধিতে উহাদিগের সম্বন্ধে যতটা বুঝিতে পারা যায় তাহাও আমরা এখানে পাঠককে বলিতে চেষ্টা করিব।

সর্ব্বধর্ম্মতে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুরের অসাধারণ উপলব্ধিনিচয়ের আবৃত্তি।

প্রথম—ঠাকুরের ধারণা হইয়াছিল তিনি ঈশ্বরাবতার, আধিকারিক পুরুষ, তাঁহার সাধনভজন অন্যের জন্য সাধিত হইয়াছে। আপনার সহিত অপরের সাধকজীবনের তুলনা করিয়া তিনি তদুভয়ের বিশেষ পার্থক্য সাধারণ দৃষ্টিসহায়ে

(১) তিনি ঈশ্বরাবতার।

বুঝিতে পারিয়াছিলেন। দেখিযাছিলেন, সাধাবণ সাধক একটী মাত্র ভাবসহাযে আজীবন চেষ্টা কবিযা ঈশ্ববেব দর্শনলাভপূর্ব্বক শান্তির অধিকাবী হয; তাঁহাব কিন্তু ঐকপ না হইয়া যতদিন পর্য্যন্ত তিনি সকল মতেব সাধনা না কবিয়াছেন ততদিন কিছুতেই শান্ত হইতে পাবেন নাই এবং প্রত্যেক মতেব সাধনে সিদ্ধ হইতে তাঁহাব অত্যল্প সময লাগিযাছে। কাবণ ভিন্ন কার্য্যেব উৎপত্তি অসম্ভব; পূর্ব্বোক্ত বিষযেব কাবণানুসন্ধানই ঠাকুবকে এখন যোগারূঢ কবাইযা উহাব কাবণ পূর্ব্বোক্ত প্রকাবে দেখাইযা দিযাছিল। দেখাইযাছিল, তিনি শুদ্ধ বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্ববেব বিশেষাবতাব বলিযাই তাঁহাব ঐরূপ হইযাছে।—এবং বুঝাইযাছিল যে, তাঁহাব অদৃষ্টপূর্ব্ব সাধনাসমূহ আধ্যাত্মিক বাজ্যে নূতন আলোক আনযনপূর্ব্বক জীবের কল্যাণসাধনেব জন্যই অনুষ্ঠিত হইযাছে, তাঁহাব ব্যক্তিগত অভাব-মোচনেব জন্য নহে।

দ্বিতীয—তাঁহাব ধাবণা হইযাছিল, অন্য জীবেব ন্যায় তাঁহাব মুক্তি হইবে না। সাধাবণ যুক্তিসহাযে ঐকথা বুঝিতে বিলম্ব হয না। কাবণ, যিনি ঈশ্বব হইতে সর্ব্বদা অভিন্ন—তাঁহাব অংশবিশেষ। তিনি ত সর্ব্বদাই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, তাঁহাব অভাব বা পবিচ্ছিন্নতাই নাই—অতএব মুক্তি হইবে কিরূপে। ঈশ্ববেব জীবকল্যাণ সাধনরূপ কর্ম্ম যতদিন থাকিবে ততদিন তাঁহাকেও যুগে যুগে অবতীর্ণ হইযা উহা কবিতে হইবে—অতএব তাঁহার মুক্তি কিরূপে হইবে? ঠাকুব যেমন বলিতেন, 'সরকাবী কর্ম্ম-চাবীকে জমীদাবীব যেখানে গোলমাল উপস্থিত হইবে সেখানেই ছুটিতে হইবে।' যোগদৃষ্টিসহাযে তিনি নিজ সম্বন্ধে কেবল ঐ কথাই জানিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম কোণ নির্দ্দেশ করিয়া আমাদিগকে অনেক সমযে বলিযাছিলেন, আগামী বাবে তাঁহাকে

(২) তাঁহাব মুক্তি নাই।

ঐদিকে আগমন করিতে হইবে। আমাদিগের কেহ কেহ * বলেন, তিনি তাঁহাদিগকে ঐ আগমনের সময় নিরূপণ পর্য্যন্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, 'দুইশত বৎসর পরে ঐদিকে আসিতে হইবে, তখন অনেকে মুক্তিলাভ করিবে, যাহারা তখন মুক্তিলাভ না করিবে তাহাদিগকে উহার জন্য অনেক কাল অপেক্ষা করিতে হইবে।'

(৩) নিজ দেহরক্ষার কাল জানিতে পারা।

তৃতীয়—যোগারূঢ় হইয়া ঠাকুর নিজ দেহরক্ষার কাল বহু পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে একদিন ঐ বিষয়ে তিনি ভাবাবেশে এইরূপ বলিয়াছিলেন—

"যখন দেখিবে যাহার তাহার হাতে খাইব, কলিকাতায় রাত্রি যাপন করিব এবং খাদ্যের অগ্রভাগ অন্যকে পূর্ব্বে খাওয়াইয়া পরে স্বয়ং অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিব, তখন জানিবে দেহরক্ষা করিবার কাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।"—ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল।

আর একদিন ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে দক্ষিণেশ্বরে বলিয়াছিলেন, "শেষকালে আর কিছু খাইব না কেবল পায়সান্ন খাইব"—উহা সত্য হইবার কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। †

আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধে ঠাকুরের দ্বিতীয় প্রকারের উপলব্ধিগুলি এখন আমরা লিপিবদ্ধ করিব—

প্রথম—সর্ব্বমতের সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া ঠাকুরের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, 'সর্ব্ব ধর্ম্ম সত্য—যত মত, তত পথ মাত্র'। যোগবুদ্ধি এবং সাধারণ বুদ্ধি উভয় সহায়েই ঠাকুর যে, ঐ কথা বুঝিয়াছিলেন, ইহা বলিতে পারা যায়। কারণ সকল প্রকার ধর্ম্মমতের সাধনায় অগ্রসর

* মহাকবি শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি।

† গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—২য় অধ্যায়।

হইয়া তিনি উহাদিগের প্রত্যেকের যথার্থ ফল জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যুগাবতার ঠাকুরের উহা প্রচারপূর্ব্বক পৃথিবীর ধর্ম্মবিরোধ ও ধর্ম্মগ্লানি নিবারণের জন্যই যে বর্ত্তমানকালে আগমন, একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কারণ, কোন ঈশ্বরাবতারই ইতিপূর্ব্বে সাধনসহায়ে ঐ কথা নিজ জীবনে পূর্ণ উপলব্ধিপূর্ব্বক জগৎকে ঐ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন নাই। আধ্যাত্মিক মতের উদারতা লইয়া অবতারসকলের স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইলে ঐ বিষয় প্রচারের জন্য ঠাকুরকে নিঃসন্দেহে সর্ব্বোচ্চাসন প্রদান করিতে হয়।

(৪) সর্ব্ব ধর্ম্ম সত্য—যত মত তত পথ।

দ্বিতীয়—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মত প্রত্যেক মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়—অতএব ঠাকুর বলিতেন, উহারা পরস্পরবিরোধী নহে, কিন্তু মানব-মনের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অবস্থা-সাপেক্ষ। ঠাকুরের ঐ প্রকার প্রত্যক্ষ অনন্ত শাস্ত্র বুঝিবার পক্ষে যে, কতদূর সহায়তা করিবে তাহা স্বল্প চিন্তার ফলেই উপলব্ধি হইবে। বেদোপনিষদাদি শাস্ত্রে পূর্ব্বোক্ত তিন মতের কথা ঋষিগণ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ থাকায় কি অনন্ত গণ্ডগোল বাধিয়া শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মমার্গকে জটিল করিয়া রাখিয়াছে তাহা বলিবার নহে। প্রত্যেক সম্প্রদায় ঋষিগণের ঐ তিন প্রকারের প্রত্যক্ষ এবং উক্তিসকলকে সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া ভাষা মোচড়াইয়া উহাদিগকে একই ভাবাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। টীকাকারগণের ঐপ্রকার চেষ্টার ফলে ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে, শাস্ত্রবিচার বলিলেই লোকের মনে একটা দারুণ ভীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। ঐ ভীতি হইতেই শাস্ত্রে অবিশ্বাস এবং উহার ফলে ভারতের আধ্যাত্মিক অবনতি উপস্থিত হইয়াছে।

(৫) দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈতমত মানবকে অবস্থাভেদে অবলম্বন করিতে হইবে।

যুগাবতার ঠাকুরের সেইজন্য ঐ তিন মতকে অবস্থাবিশেষে স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া উহাদিগের ঐরূপ অদ্ভুত সামঞ্জস্যের কথা প্রচারের প্রয়োজন হইয়াছিল। তাঁহার ঐ মীমাংসা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আমাদিগের শাস্ত্রে প্রবেশাধিকার লাভের একমাত্র পথ। ঐ বিষয়ক তাঁহার কয়েকটি উক্তি এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি—

"অদ্বৈত ভাব শেষ কথা জান্‌বি, উহা বাক্য-মনাতীত উপলব্ধির বিষয়।

"মন-বুদ্ধি সহায়ে বিশিষ্টাদ্বৈত পর্য্যন্ত বলা ও বুঝা যায়, তখন নিত্য যেমন নিত্য, লীলাও তেমনি নিত্য—চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় শ্যাম।

"বিষয়বুদ্ধিপ্রবল, সাধারণ মানবের পক্ষে দ্বৈতভাব, নারদপঞ্চরাত্রের উপদেশ মত উচ্চ নাম সংকীর্ত্তনাদি প্রশস্ত।"

কর্ম্ম সম্বন্ধেও ঠাকুর ঐরূপে সীমা নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেন—"সত্ত্বগুণী ব্যক্তির কর্ম্ম স্বভাবতঃ ত্যাগ হইয়া যায়—চেষ্টা করিলেও সে আর কর্ম্ম করিতে পারে না,—অথবা ঈশ্বর তাহাকে উহা করিতে দেন না। যথা, গৃহস্থের বধূর গর্ভবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মত্যাগ এবং পুত্র হইলে সর্ব্বপ্রকার গৃহকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া উহাকে লইয়াই নাড়াচাড়া করিয়া অবস্থান। অন্য সকল মানবের পক্ষে কিন্তু ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া সংসারের যত কিছু কার্য্য বড় লোকের বাটীর দাসদাসীর ভাবে সম্পাদন করার চেষ্টা কর্ত্তব্য। ঐরূপ করার নামই কর্ম্মযোগ। যতটা সাধ্য ঈশ্বরের নাম জপ ও ধ্যান করা এবং পূর্ব্বোক্তরূপে সকল কর্ম্ম সম্পাদন করা ইহাই পথ।"

(৬) কর্ম্মযোগ অবলম্বনে সাধারণ মানবের উন্নতি হইবে।

তৃতীয়—ঠাকুরের উপলব্ধি হইয়াছিল, শ্রীশ্রীজগদম্বার হস্তের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া নিজ জীবনে প্রকাশিত উদার মতের বিশেষভাবে

অধিকারী নব সম্প্রদায তাঁহাকে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। ঐ বিষয়ে ঠাকুর প্রথমে যাহা দেখিযাছিলেন তাহা মথুরবাবু জীবিত থাকিবার কালে। তিনি তখন তাঁহাকে বলিযাছিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহাকে দেখাইযাছেন যে, তাঁহাব নিকট ধর্ম্মলাভ কবিতে অনেক ভক্ত আসিবে। পরে ঐ বিষয় যে সত্য হইযাছিল তাহা বলা বাহুল্য। কাশীপুরের বাগানে অবস্থানকালে ঠাকুব নিজ ছাযামূর্ত্তি (photograph) দেখিতে দেখিতে আমাদিগকে বলিযাছিলেন, "ইহা অতি উচ্চ যোগাবস্থাব মূর্ত্তি—কালে এই মূর্ত্তির* ঘরে ঘরে পূজা হইবে।"

(৭) উহার মতে সম্প্রদায প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

চতুর্থ—যোগদৃষ্টিসহায়ে জানিতে পারিযা ঠাকুরের দৃঢ় ধারণা হইযাছিল, "যাহাদের শেষ জন্ম তাহারা তাঁহার নিকটে (ধর্ম্মলাভ কবিতে) আসিবে।" ঐ বিষযে আমাদিগের মতামত আমরা পাঠককে অন্যত্র† বলিযাছি। সেজন্য উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রযোজন।

(৮) যাহাদের শেষ জন্ম তাহারা তাঁহার মত গ্রহণ করিবে।

ঠাকুরের সাধনকালে তিনটি বিশেষ সময়ে তিনজন বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ সাধক পণ্ডিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক অবস্থা স্বচক্ষে দর্শনপূর্ব্বক তদ্বিষযে আলোচনা করিবার অবসর লাভ করিযাছিলেন। পণ্ডিত পদ্মলোচন, ঠাকুর তন্ত্রসাধনে সিদ্ধ হইবার পরে তাঁহাকে দর্শন করিযাছিলেন—পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ, ঠাকুর বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত সাধনসকলে সিদ্ধিলাভের পরে তাঁহার দর্শন লাভ করিযা-

---

* ঠাকুরের বসিযা সমাধিস্থ থাকিবার মূর্ত্তি।

† গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—চতুর্থ অধ্যায়।

ছিলেন—এবং গৌরী পণ্ডিত, দিব্যসাধন শ্রীসম্পন্ন ঠাকুরকে সাধন-কালের অবসানে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। পদ্মলোচন ঠাকুরকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'আপনার ভিতরে আমি ঈশ্বরীয়আবির্ভাব ও শক্তি দেখিতেছি।' বৈষ্ণবচরণ সংস্কৃত ভাষায় স্তব রচনা করিয়া ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের সম্মুখে তাঁহার অবতারত্ব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত গৌরীকান্ত ঠাকুরকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'শাস্ত্রে যে সকল উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা পাঠ করিয়াছি, সে সকলি তোমাতে সাক্ষাৎ বর্ত্তমান দেখিতেছি। তদ্ভিন্ন শাস্ত্রে যাহা লিপিবদ্ধ নাই এরূপ উচ্চাবস্থাসকলের প্রকাশও তোমাতে বিদ্যমান দেখিতেছি—তোমার অবস্থা বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রসকল অতিক্রম করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, তুমি মানুষ নহ, অবতারসকলের যাঁহা হইতে উৎপত্তি হয় সেই বস্তু তোমার ভিতরে রহিয়াছে!' ঠাকুরের অলৌকিক জীবন কথা এবং পূর্ব্বোক্ত অপূর্ব্ব উপলব্ধিসকলের আলোচনা করিয়া বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, ঐ সকল সাধক পণ্ডিতাগ্রণীগণ তাঁহাকে বৃথা চাটুবাদ করিয়া পূর্ব্বোক্ত কথাসকল বলিয়া যান নাই। ঐ সকল পণ্ডিতের দক্ষিণেশ্বরে আগমন-কাল নিম্নলিখিত ভাবে নিরূপিত হয়—

তিনজন বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ সাধক ঠাকুরকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেখিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

দক্ষিণেশ্বরে প্রথমবার অবস্থানকালে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী গৌরী পণ্ডিতকে তথায় দেখিয়াছিলেন। আবার, মথুর বাবু জীবিত থাকিবার কালে গৌরী পণ্ডিত যে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন একথা আমরা ঠাকুরের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। অতএব বোধ হয় শ্রীযুক্ত গৌরী সন ১২৭৭ সালের কোন সময়ে দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্ব্বক সন ১২৭৯ সাল পর্য্যন্ত ঠাকুরের নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া নিজ জীবনে যাঁহারা ঐ জ্ঞান পরিণত করিতে

চেষ্টা করিতেন, ঐরূপ সাধক পণ্ডিতদিগকে দেখিবার জন্য ঠাকুরের নিরন্তর আগ্রহ ছিল। ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত গৌরীকান্ত তর্কভূষণ পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন বলিয়াই ঠাকুরের তাঁহাকে দেখিতে অভিলাষ হয় এবং মথুর বাবুর দ্বারা নিমন্ত্রণ করাইয়া তিনি তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনয়ন করেন। পণ্ডিতজীর বাস ঠাকুরের জন্মভূমির নিকটে ইঁদেশ নামক গ্রামে ছিল। হৃদয়ের ভ্রাতা রামরতন, মথুর বাবুর নিমন্ত্রণ-পত্র লইয়া যাইয়া শ্রীযুত গৌরীকান্তকে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীমন্দিরে আনয়ন করিয়াছিলেন। গৌরী পণ্ডিতের সাধনপ্রসূত অদ্ভুত শক্তির কথা এবং দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্ব্বক ঠাকুরকে দেখিয়া তাঁহার মনে ক্রমে প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হইয়া তিনি যে ভাবে সংসার ত্যাগ করেন সে সকল কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র * বলিয়াছি।

ঐ পণ্ডিতদিগের আগমনকাল নিরূপণ।

'রাণী রাসমণির জীবনবৃত্তান্ত' শীর্ষক গ্রন্থে শ্রীযুত মথুরের অন্নমেরু অনুষ্ঠানের কাল সন ১২৭০ সাল বলিয়া নিরূপিত আছে। পণ্ডিত পদ্মলোচনকে ঐকালে দক্ষিণেশ্বরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া দান গ্রহণ করাইবার জন্য শ্রীযুত মথুরের আগ্রহের কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি। অতএব বেদান্তবিৎ ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ঠাকুরের নিকট আগমনকাল সন ১২৭০ সাল বলা যাইতে পারে।

শ্রীযুক্ত উৎসবানন্দ গোস্বামীর পুত্র পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের দক্ষিণেশ্বরে আগমনকাল সহজেই নিরূপিত হয়। কারণ, ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীমতী যোগেশ্বরীর সহিত এবং পরে ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত গৌরীকান্ত তর্কভূষণের সহিত দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীতে তাঁহার ঠাকুরের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইবার কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—১ম অধ্যায়

শুনিয়াছি। ব্রাহ্মণীর ন্যায় তিনিও ঠাকুরের শরীরমনে বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত মহাভাবের লক্ষণসমুদয় প্রকাশিত দেখিয়াছিলেন এবং স্তম্ভিতহৃদয়ে শ্রীযুক্তা ব্রাহ্মণীর সহিত একমত হইয়া তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গদেব পুন-রাবতীর্ণ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন। ঠাকুরের নিকটে পূর্ব্বোক্ত কথাসকল শুনিয়া মনে হয়, শ্রীযুত বৈষ্ণবচরণ সন ১২৭১ সালে ঠাকুরের মধুরভাব সাধনে সিদ্ধ হইবার পরে তাঁহার নিকটে আসিয়া সন ১২৭৯ সাল পর্য্যন্ত দক্ষিণেশ্বরে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের নিজ সাঙ্গো-পাঙ্গসকলকে দেখিতে বাসনা ও আহ্বান।

পূর্ব্বোক্ত উপলব্ধিসকল করিবার পরে ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া ঠাকুরের মনে এক অভিনব বাসনা প্রবলভাবে উদিত হইয়াছিল। যোগারূঢ় হইয়া পূর্ব্বদৃষ্ট ভক্তসকলকে দেখিবার জন্য এবং তাহাদিগের অন্তরে নিজ ধর্ম্মশক্তি সঞ্চার করিবার জন্য তিনি বিশেষ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "সেই ব্যাকুলতার সীমা ছিল না। দিবাভাগে সর্ব্বকাল ঐ ব্যাকুলতা হৃদয়ে কোনরূপে ধারণ করিয়া থাকিতাম। বিষয়ী লোকের মিথ্যা বিষয়প্রসঙ্গ শুনিয়া যখন বিষবৎ বোধ হইত তখন ভাবিতাম, তাহারা সকলে আসিলে ঈশ্বরীয় কথা কহিয়া প্রাণ শীতল করিব, শ্রবণ জুড়াইব, নিজ আধ্যা-ত্মিক উপলব্ধিসকল তাহাদিগকে বলিয়া অন্তরের বোঝা লঘু করিব। ঐরূপে প্রত্যেক বিষয়ে তাহাদিগের আগমনের কথার উদ্দীপনা হইয়া তাহাদিগের বিষয়ই নিরন্তর চিন্তা করিতাম—কাহাকে কি বলিব, কাহাকে কি দিব, ঐ সকল কথা ভাবিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম। কিন্তু দিবাবসানে যখন সন্ধ্যার সমাগম হইত তখন ধৈর্য্যের বাঁধ দিয়া ঐ ব্যাকুলতাকে আর রাখিতে পারিতাম না, মনে হইত আবার একটা দিন চলিয়া গেল, তাহাদিগের কেহই আসিল না। যখন দেবালয় আরত্রিকের শঙ্খঘণ্টা রোলে মুখরিত হইয়া উঠিত তখন

বাবুদিগের কুঠির উপরের ছাদে যাইয়া হৃদয়ের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে 'তোরা সব কে কোথায় আছিস্ আয় রে—তোদের না দেখে আর থাকতে পারচি না' বলিয়া চীৎকারে গগন পূর্ণ করিতাম! মাতা তাহার বালককে দেখিবার জন্য ঐরূপ ব্যাকুলতা অনুভব করে কি না সন্দেহ, সখা সখার সহিত এবং প্রণয়িযুগল পরস্পরের সহিত মিলনের জন্য কখনও ঐরূপ করে বলিয়া শুনি নাই—এত ব্যাকুলতায় প্রাণ চঞ্চল হইয়াছিল! ঐরূপ হইবার কয়েক দিন পরেই ভক্তসকলে একে একে উপস্থিত হইতে লাগিল!"

ঐরূপে ঠাকুরের ব্যাকুল আহ্বানে ভক্তসকলের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পূর্ব্বে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থের সহিত ঐসকলের মুখ্যভাবে সম্বন্ধ না থাকায় আমরা উহাদিগকে পরিশিষ্টমধ্যে লিপিবদ্ধ করিলাম।

পরিশিষ্ট ।

পরিশিষ্ট।

৺ষোড়শীপূজার পর হইতে পূর্ব্বপরিদৃষ্ট অন্তরঙ্গ ভক্তসকলের আগমন কালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঠাকুরের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী।

আমরা পাঠককে বলিয়াছি, ৺ষোড়শী-পূজার পরে শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী সন ১২৮০ সালের কার্ত্তিক মাসে কামারপুকুরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমার ঐ স্থানে পৌছিবার স্বল্প কাল পরেই ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য জ্বরাতিসার রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঠাকুরের পিতার বংশের প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষের মধ্যেই আধ্যাত্মিকতার বিশেষ প্রকাশ ছিল। শ্রীযুত রামেশ্বরের সম্বন্ধে ঐ বিষয়ে যাহা শ্রবণ করিয়াছি তাহার এখানে উল্লেখ করিতেছি।

রামেশ্বরের মৃত্যু।

রামেশ্বর বড় উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। সন্ন্যাসী ফকীরেরা দ্বারে আসিয়া যে যাহা চাহিত, গৃহে থাকিলে, তিনি তাহাদিগকে উহা তৎক্ষণাৎ প্রদান করিতেন। তাঁহার আত্মীয়বর্গের নিকটে শুনিয়াছি, ঐরূপে কোন ফকীর আসিয়া বলিত, রন্ধনের জন্য আমার একটি ঘোক্‌নোর অভাব, কেহ বলিত আমার লোটা বা জলপাত্রের অভাব, কেহ বলিত আমার কম্বলের অভাব—রামেশ্বরও ঐসকল তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বাহির করিয়া তাহাদিগকে দিতেন। বাটীর যদি কেহ উহাতে আপত্তি করিত, তাহা হইলে রামেশ্বর তাহাকে শান্তভাবে বলিতেন,—লইয়া যাউক, কিছু বলিও না, ঐরূপ দ্রব্য আবার কত আসিবে, ভাবনা কি? জ্যোতিষশাস্ত্রে রামেশ্বরের সামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল।

রামেশ্বরের উদার প্রকৃতি।

রামেশ্বরের মৃত্যুর সম্ভাবনা ঠাকুরের পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারা ও তাঁহাকে সতর্ক করা।

দক্ষিণেশ্বর হইতে রামেশ্বরের শেষবার বাটী ফিরিয়া আসিবার কালে আর যে তাঁহাকে তথা হইতে ফিরিতে হইবে না, একথা ঠাকুর জানিতে পারিয়াছিলেন,—'বাটী যাচ্ছ, যাও, কিন্তু স্ত্রীর নিকটে শয়ন করিও না ; তাহা হইলে তোমার প্রাণরক্ষা হওয়া সংশয়।' ঐ কথা ঠাকুরের মুখে আমাদিগের কেহ * কেহ শ্রবণ করিয়াছেন।

রামেশ্বর বাটীতে পৌঁছিবার কিছুকাল পরে সংবাদ আসিল, তিনি পীড়িত। ঠাকুর ঐকথা শুনিয়া হৃদয়কে বলিয়াছিলেন,—'সে নিষেধ মানে নাই, তাহার প্রাণরক্ষা হওয়া সংশয়।' ঐ ঘটনার পাঁচ সাত দিন পরেই সংবাদ আসিল, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদে ঠাকুর তাঁহার বৃদ্ধ জননীর প্রাণে বিষমাঘাত লাগিবে বলিয়া বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন এবং মন্দিরে গমনপূর্ব্বক জননীকে শোকের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকটে কাতর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ঐরূপ করিবার পরে তিনি জননীকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য মন্দির হইতে নহবতে আগমন করিলেন এবং সজলনয়নে তাঁহাকে ঐ দুঃসংবাদ নিবেদন করিলেন।

রামেশ্বরের মৃত্যুসংবাদে জননীর শোকে প্রাণসংশয় হইবে ভাবিয়া ঠাকুরের প্রার্থনা ও তৎফল।

ঠাকুর বলিতেন, "ভাবিয়াছিলাম, মা ঐ কথা শুনিয়া একেবারে হতজ্ঞান হইবেন এবং তাঁহার প্রাণরক্ষা সংশয় হইবে, কিন্তু ফলে দেখিলাম, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। মা ঐ কথা শুনিয়া অল্প স্বল্প দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক 'সংসার অনিত্য, সকলেরই একদিন মৃত্যু নিশ্চিত, অতএব শোক করা বৃথা'—ইত্যাদি বলিয়া আমাকেই শান্ত করিতে

* শ্রীমৎ প্রেমানন্দ স্বামী।

লাগিলেন।—দেখিলাম, তানপুরার কান টিপিয়া সুর যেমন চড়াইয়া দেয়, শ্রীশ্রীজগদম্বা যেন ঐরূপে মার মনকে উচ্চ গ্রামে চড়াইয়া রাখিয়াছেন, পার্থিব শোক দুঃখ সেইজন্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। ঐরূপ দেখিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকে বারবার প্রণাম করিলাম এবং নিশ্চিন্ত হইলাম।"

রামেশ্বর পাঁচ সাত দিন পূর্ব্বে নিজ মৃত্যুকাল জানিতে পারিয়াছিলেন এবং আত্মীয়গণকে ঐ কথা বলিয়া নিজ সৎকার ও শ্রাদ্ধের জন্য সকল আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাটীর সম্মুখে একটি আম গাছ কোন কারণে কাটা হইতেছে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—ভাল হইল, আমার কার্য্যে লাগিবে। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি শ্রীরামচন্দ্রের পূত নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন,—পরে সংজ্ঞা হারাইয়া অল্পক্ষণ থাকিয়া তাঁহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল।

মৃত্যু উপস্থিত জানিয়া রামেশ্বরের আচরণ।

মৃত্যুর পূর্ব্বে রামেশ্বর আত্মীয়বর্গকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহটাকে শ্মশানমধ্যে অগ্নিসাৎ না করিয়া, উহার পার্শ্বের রাস্তার উপরে—যেন অগ্নিসাৎ করা হয়। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বলিয়াছিলেন, কত সাধুলোকে ঐ রাস্তার উপর দিয়া চলিবে, তাঁহাদের পদরজে আমার সদ্গতি হইবে। রামেশ্বরের মৃত্যু গভীর রাত্রিতে হইয়াছিল।

পল্লীর গোপাল নামক একব্যক্তির সহিত রামেশ্বরের বহুকালাবধি বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। গোপাল বলিতেন, তাঁহার মৃত্যু যে দিন যে সময়ে হইয়াছিল সেই দিন সেই সময়ে তিনি তাঁহার বাটীর দ্বারে, কাহাকেও শব্দ করিতে শুনিয়া জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পাইয়াছিলেন, 'আমি রামেশ্বর, গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছি, বাটীতে ৺রঘুবীর রহিলেন, তাঁহার সেবার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে যাহাতে গোল না হয়,

তদ্বিষয়ে তুমি নজর রাখিও!' গোপাল বন্ধুর আহ্বানে দ্বার খুলিতে যাইয়া পুনরায় শুনিলেন, 'আমার শরীর নাই, অতএব দ্বার খুলিলেও তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না!' গোপাল তথাপি দ্বার খুলিয়া যখন কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইলেন না, তখন সংবাদ সত্য কি মিথ্যা জানিবার জন্য রামেশ্বরের বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, সত্যসত্যই রামেশ্বরের দেহ ত্যাগ হইয়াছে।

মৃত্যুর পরে রামেশ্বরের নিজ বন্ধু গোপালের সহিত কথোপকথন।

রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায় বলেন, তাঁহার পিতার মৃত্যু সন ১২৮০ সালের অগ্রহায়ণের ২৭ তারিখে হইয়াছিল এবং তখন তাঁহার বয়স আন্দাজ ৪৮ বৎসর ছিল। পিতার অস্থি সঞ্চয়পূর্ব্বক কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বৈদ্যবাটী নামক স্থলে আসিয়া তিনি উহা গঙ্গায় বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, পরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে আসিবার জন্য ঐস্থলে নৌকায় করিয়া গঙ্গা পার হইয়াছিলেন। পার হইবার কালে বারাকপুরের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন, মথুর বাবুর পত্নী শ্রীমতী জগদম্বা দাসী তথায় যে মন্দিরে অন্নপূর্ণা দেবীকে পরে প্রতিষ্ঠিতা করেন তাহার অর্দ্ধেক ভাগ মাত্র তখন গাঁথা হইয়াছে। অনন্তর ১২৮১ সালের ৩০শে চৈত্র ইংরাজী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল তারিখে ঐ মন্দিরে ৺দেবীপ্রতিষ্ঠা নিষ্পন্ন হইয়াছিল। রামেশ্বরের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র রামলাল দক্ষিণেশ্বরে পূজকের পদ স্বীকার করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালের দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও পূজকের পদগ্রহণ। চানকের অন্নপূর্ণার মন্দির।

মথুর বাবুর মৃত্যুর পরে কলিকাতার সিঁন্দুরিয়াপটি পল্লী-নিবাসী শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ মল্লিক মহাশয় ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইয়া,

তাঁহাকে বিশেষরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করেন। * শম্ভু বাবু ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতে বিশেষ অনুরাগসম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহার অজস্র দানের জন্য কলিকাতাবাসী সকলের পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঠাকুরের প্রতি শম্ভু বাবুর ভক্তি ও ভালবাসা দিন দিন অতি গভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং কয়েক বৎসর কাল তিনি তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ঠাকুরের এবং শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর যখন যাহা কিছুর অভাব হইত, জানিতে পারিলে শম্ভু বাবু তৎসমস্ত পরম আনন্দে পূরণ করিতেন। শ্রীযুক্ত শম্ভু ঠাকুরকে 'গুরুজী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ঠাকুর তাহাতে মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইয়া বলিতেন, 'কে কার গুরু—তুমি আমার গুরু'—শম্ভু কিন্তু তাহাতে নিরস্ত না হইয়া চিরকাল তাঁহাকে ঐরূপে সম্বোধন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের দিব্য সঙ্গগুণে শম্ভু বাবু যে আধ্যাত্মিক পথে বিশেষ আলোক দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং উহার প্রভাবে তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস সকল যে পূর্ণতা এবং সফলতা লাভ করিয়াছিল, তাহা তাঁহার ঠাকুরকে ঐরূপ সম্বোধন হৃদয়ঙ্গম হয়। শম্ভু বাবুর পত্নীও ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিতেন এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দক্ষিণে-

ঠাকুরের দ্বিতীয় রসদ্দার শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ মল্লিকের কথা।

---

* ঠাকুরের ভক্তসকলের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা ঠাকুরকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, মথুর বাবুর মৃত্যুর পরে পানিহাটি-নিবাসী শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন তাঁহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগাইবার ভার লইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মণিমোহন তখন ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে গমনাগমন করিতেন। তাঁহার পরে শম্ভু বাবু ঐ সেবাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদিগের মনে হয়, শম্ভু বাবুকে ঠাকুর স্বয়ং তাঁহার দ্বিতীয় রসদ্দার বলিয়া যখন নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন মণি বাবু ঠাকুরের সেবাভার গ্রহণ করিলেও, অধিক কাল উহা সম্পন্ন করিতে পারেন নাই।

শ্বরে থাকিলে, তাঁহাকে প্রতি জয়মঙ্গলবারে নিজালয়ে লইয়া যাইয়া ষোড়শোপচারে তাঁহার শ্রীচরণ পূজা করিতেন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আগমন বোধ হয় সন ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে হইয়াছিল। পূর্ব্বের ন্যায় তখন তিনি নহবতের ঘরে ঠাকুরের জননীর সহিত বাস করিতে থাকেন। শম্ভু বাবু ঐ কথা জানিতে পারিয়া, সঙ্কীর্ণ নহবতঘরে তাঁহার থাকিবার কষ্ট হইতেছে অনুমান করিয়া, দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের সন্নিকটে কিছু জমী ২৫০৲ টাকা প্রদানপূর্ব্বক মৌরসী করিয়া লন এবং তদুপরি একখানি সুপরিসর চালা ঘর বাঁধিয়া দিবার সঙ্কল্প করেন। তখন কাপ্তেন উপাধি প্রাপ্ত নেপাল-রাজসরকারের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ উপাধ্যায় মহাশয় ঠাকুরের নিকট গমনাগমন করিতেছেন এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। কাপ্তেন বিশ্বনাথ উক্ত ঘর করিবার সঙ্কল্প শুনিয়া, উহার নিমিত্ত যত কাঠ লাগিবে দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। নেপাল-রাজসরকারের সাল কাঠের কারবারের ভার তখন তাঁহার হস্তে ন্যস্ত থাকায়, উহা দেওয়া তাঁহার পক্ষে বিশেষ ব্যয়সাধ্য ছিল না। গৃহনির্ম্মাণ আরম্ভ হইলে, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ গঙ্গার অপর পারে বেলুড়গ্রামস্থ তাঁহার কাঠের গদী হইতে তিনখানি সালের চকোর পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু রাত্রে গঙ্গায় বিশেষ প্রবলভাবে জোয়ার আসায় উহার একখানি ভাসিয়া গেল। হৃদয় উহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীমাকে 'ভাগ্যহীনা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, কাঠ ভাসিয়া যাইবার কথা শুনিয়া, কাপ্তেন আর একখানি কাঠ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং গৃহনির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। অতঃপর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী উক্ত গৃহে প্রায় বৎসরকাল বাস করিয়াছিলেন। গৃহকর্ম্মে সাহায্য করিবে

শ্রীশ্রীমার জন্য শম্ভুবাবুর ঘর করিয়া দেওয়া। কাপ্তেনের ঐ বিষয়ে সাহায্য। ঐ গৃহে ঠাকুরের একরাত্রি বাস।

এবং সর্ব্বদা শ্রীশ্রীমার সঙ্গে থাকিবে বলিয়া, একটি রমণীকে তখন নিযুক্তা করা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমা এই গৃহে রন্ধন করিয়া, ঠাকুরের জন্য নানাবিধ খাদ্য প্রত্যহ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার ভোজনান্তে পুনরায় এখানে ফিরিয়া আসিতেন। তাঁহার সন্তোষ ও তত্ত্বাবধানের জন্য ঠাকুরও দিবাভাগে কখন কখন ঐ গৃহে আগমন করিতেন এবং কিছুকাল তাঁহার নিকটে থাকিয়া পুনরায় মন্দিরে ফিরিয়া আসিতেন। একদিন কেবল ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল। সেদিন অপরাহ্ণে ঠাকুর শ্রীশ্রীমার নিকটে আগমনমাত্র গভীর রাত্র পর্য্যন্ত এমন মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয় যে, মন্দিরে ফিরিয়া আসা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। ঐরূপে সে রাত্রি তিনি তথায় বাস করিতে বাধ্য হয়েন এবং শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে ঝোল ভাত রাঁধিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন।

এক বৎসর ঐ গৃহে বাস করিবার পরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী আমাশয় রোগে কঠিনভাবে আক্রান্তা হইলেন। শম্ভুবাবু তাঁহাকে আরোগ্য করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিয়োগে প্রসাদ ডাক্তার এই সময়ে শ্রীশ্রীমার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। একটু আরোগ্য হইলে, শ্রীশ্রীমা পিত্রালয় জয়রামবাটী গ্রামে গমন করিলেন। সম্ভবতঃ সন ১২৮২ সালের আশ্বিন মাসে ঐ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তথায় যাইবার স্বল্পকাল পরে পুনরায় তিনি ঐ রোগে শয্যাশায়িনী হইলেন। ক্রমে উহার এত বৃদ্ধি হইল যে, তাঁহার শরীর-রক্ষা সংশয়ের বিষয় হইয়া উঠিল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পূজ্যপাদ পিতা শ্রীরামচন্দ্র তখন মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার জননী এবং ভ্রাতৃবর্গই তাঁহার যথাসাধ্য সেবা করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি, ঠাকুর ঐ সময়ে তাঁহার নিদারুণ পীড়ার কথা শুনিয়া

ঐ গৃহে বাসকালে শ্রীশ্রীমার কঠিন পীড়া ও জয়রামবাটীতে গমন।

হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, 'তাইত রে হৃদে, ও (শ্রীশ্রীমা) কেবল আসবে আর যাবে, মনুষ্যজন্মের কিছুই করা হবে না!'

রোগের যখন কিছুতেই উপশম হইল না, তখন শ্রীশ্রীমার প্রাণে ৺দেবীর নিকট হত্যা-প্রদানের কথা উদিত হইল এবং জননী এবং ভ্রাতৃগণ জানিতে পারিলে ঐ বিষয়ে বাধা প্রদান করিতে পারে ভাবিয়া, তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া গ্রামদেবী ৺সিংহবাহিনীর মাড়ে (মন্দিরে) যাইয়া ঐ উদ্দেশ্যে প্রায়োপবেশন করিয়া পড়িয়া রহিলেন। কয়েক ঘণ্টাকাল ঐরূপে থাকিবার পরেই ৺দেবী প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে আরোগ্যের জন্য ঔষধ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন।

৺সিংহবাহিনীর নিকট হত্যাদান ও ঔষধপ্রাপ্তি।

৺দেবী আদেশে উক্ত ঔষধ সেবনমাত্রেই তাঁহার রোগের শান্তি হইল এবং ক্রমে তাঁহার শরীর পূর্ব্বের ন্যায় সবল হইয়া উঠিল। শ্রীশ্রীমার হত্যা-প্রদানপূর্ব্বক ঔষধপ্রাপ্তির কাল হইতে ঐ দেবী বিশেষ জাগ্রতা বলিয়া চতুষ্পার্শ্বের গ্রামসমূহে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

প্রায় চারি বৎসরকাল ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমার ঐরূপে সেবা করিবার পরে শম্ভুবাবু রোগে শয্যাশায়ী হইলেন। পীড়িতাবস্থায় ঠাকুর তাঁহাকে একদিন দেখিতে গিয়াছিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন, 'শম্ভুর প্রদীপে তৈল নাই।' ঠাকুরের কথাই সত্য হইল—বহুমূত্র রোগে বিকার উপস্থিত হইয়া শ্রীযুত শম্ভু শরীর রক্ষা করিলেন। শম্ভুবাবু পরম উদার ও তেজস্বী ঈশ্বরভক্ত ছিলেন। পীড়িতাবস্থাতে তাঁহার মনের প্রসন্নতা এক দিনের জন্যও নষ্ট হয় নাই। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি হৃদয়কে হৃষ্টচিত্তে বলিয়াছিলেন, "মরণের নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই, আমি পুঁটুলি পাঁটুলা বেঁধে প্রস্তুত হয়ে ব'সে আছি।" শম্ভু বাবুর সহিত পরিচয় হইবার বহুপূর্ব্বে ঠাকুর যোগারূঢ় অবস্থায় দেখিয়া-

মৃত্যুকালে শম্ভুবাবুর নির্ভীক আচরণ।

ছিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বা শম্ভুকেই তাঁহার দ্বিতীয় রসদ্দাররূপে মনোনীত করিয়াছেন, এবং দেখিবামাত্র তাঁহাকে সেই ব্যক্তি বলিয়া চিনিয়া লইয়াছিলেন।

পীড়িতা হইয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী পিত্রালয়ে যাইবার কয়েক মাস পরে ঠাকুরের জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। সন ১২৮২ সালের ১৬ই ফাল্গুন তারিখে, ঠাকুরের জন্মতিথির দিবসে তাঁহার জননী শ্রীমতী চন্দ্রমণি দেবী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ৯০।৯৫ বৎসর হইয়াছিল এবং উহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে জরার আক্রমণে তাঁহার ইন্দ্রিয় ও মনের শক্তিসমূহ অনেকাংশে লুপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ আমরা হৃদয়ের নিকটে যেরূপ শুনিয়াছি, সেইরূপ লিপিবদ্ধ করিতেছি—

ঠাকুরের জননী চন্দ্রমণি দেবীর শেষাবস্থা ও মৃত্যু।

ঐ ঘটনা উপস্থিত হইবার চারিদিন পূর্ব্বে হৃদয় কিছুদিনের জন্য অবসর লইয়া বাটী যাইতেছিল। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে একটি অনির্দ্দেশ্য আশঙ্কায় তাহার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং ঠাকুরকে ছাড়িয়া তাহার কিছুতেই যাইতে ইচ্ছা হইল না। ঠাকুরকে উহা নিবেদন করায় তিনি বলিলেন, তবে যাইয়া কাজ নাই। উহার পরে তিনদিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল।

ঠাকুর প্রত্যহ তাঁহার জননীর নিকট কিছুকালের জন্য যাইয়া তাঁহার সেবা স্বহস্তে যথাসাধ্য সম্পাদন করিতেন। হৃদয়ও ঐরূপ করিতেন; এবং 'কালীর মা' নাম্নী চাকরাণী দিবাভাগে প্রায় সর্ব্বদা বৃদ্ধার নিকটে থাকিত। হৃদয়কে বৃদ্ধা ইদানীং দেখিতে পারিতেন না। অক্ষয়ের মৃত্যুর সময় হইতে বৃদ্ধার মনে কেমন একটা ধারণা হইয়াছিল যে, হৃদয়ই অক্ষয়কে মারিয়া ফেলিয়াছে এবং ঠাকুরকে এবং তাঁহার পত্নীকে মারিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। সেজন্য

বৃদ্ধা ঠাকুরকে কখন কখন সতর্ক করিয়া দিতেন, বলিতেন—"হৃদুর কথা কখন শুনিবি না।" জরাজীর্ণা হইয়া বুদ্ধিভ্রংশের পরিচয় অন্য নানা বিষয়েও পাওয়া যাইত। যথা,—দক্ষিণেশ্বর বাগানের সন্নিকটেই আলমবাজারের পাটের কল। মধ্যাহ্নে ঐ কলের কর্ম্মচারীদিগকে কিছুক্ষণের জন্য ছুটী দেওয়া হয় এবং অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল বাদে বাঁশী বাজাইয়া পুনরায় কাজে লাগাইয়া দেওয়া হয়। কলের বাঁশীর আওয়াজকে বৃদ্ধা ৺বৈকুণ্ঠের শঙ্খধ্বনি বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন এবং যতক্ষণ না ঐ ধ্বনি শুনিতে পাইতেন, ততক্ষণ আহারে বসিতেন না। ঐ বিষয়ে অনুরোধ করিলে বলিতেন—'এখন কি খাব গো, এখন শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের ভোগ হয় নাই বৈকুণ্ঠে শঙ্খ বাজে নাই, এখন কি খাইতে আছে?' কলের যেদিন ছুটী থাকিত, সেদিন বাঁশী বাজিত না, বৃদ্ধাকে আহারে বসান সেদিন বিষম মুস্কিল হইত; হৃদয় এবং ঠাকুরকে ঐদিন নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া বৃদ্ধাকে আহার করাইতে হইত।

সে যাহা হউক, চতুর্থ দিবস সমাগত হইল, বৃদ্ধার অসুস্থতার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। সন্ধ্যার পরে ঠাকুর তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার পূর্ব্বজীবনের নানা কথার উত্থাপন ও গল্প করিয়া বৃদ্ধার মন আনন্দে পূর্ণ করিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় ঠাকুর তাঁহাকে শয়ন করাইয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন প্রভাত হইয়া ক্রমে আটটা বাজিয়া গেল, বৃদ্ধা তথাপি ঘরে, দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিলেন না। 'কালীর মা' নহবতের উপরের ঘরের দ্বারে যাইয়া অনেক ডাকাডাকি করিল, কিন্তু বৃদ্ধার সাড়া পাইল না। দ্বারে কান পাতিয়া শুনিতে পাইল, তাঁহার গলা হইতে কেমন একটা বিকৃত রব উত্থিত হইতেছে। তখন ভীত হইয়া সে ঠাকুর ও হৃদয়কে ঐ বিষয় নিবেদন করিল। হৃদয় যাইয়া

কৌশলে বাহির হইতে দ্বারের অর্গল খুলিয়া দেখিল, বৃদ্ধা সংজ্ঞারহিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। তখন কবিরাজী ঔষধ আনিয়া হৃদয় তাঁহার জিহ্বায় লাগাইয়া দিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে বিন্দু বিন্দু করিয়া দুগ্ধ ও গঙ্গাজল তাঁহাকে পান করাইতে লাগিল। তিন দিন ঐভাবে থাকিবার পরে বৃদ্ধার অন্তিমকাল উপস্থিত দেখিয়া, তাঁহাকে অন্তর্জ্জলি করা হইল এবং ঠাকুর ফুল, চন্দন ও তুলসী লইয়া তাঁহার পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। পরে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে করিতে নাই বলিয়া ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল তাঁহার নিয়োগে বৃদ্ধার দেহের সৎকার করিল। অনন্তর অশৌচ উত্তীর্ণ হইলে, ঠাকুরের নির্দ্দেশে রামলালই বৃষোৎসর্গ করিয়া ঠাকুরের জননীর শ্রাদ্ধক্রিয়া যথারীতি সম্পাদন করিয়াছিল।

মাতৃবিয়োগ হইলে, ঠাকুর শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে সন্ন্যাসগ্রহণের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া অশৌচগ্রহণাদি কোন কার্য্য করেন নাই। জননীর পুত্রোচিত কোন কার্য্য করিলাম না ভাবিয়া এক দিন তিনি তর্পণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু অঞ্জলি ভরিয়া জল তুলিবামাত্র ভাবাবেশ উপস্থিত হইয়া তাঁহার অঙ্গুলিসকল অসাড় ও অসংলগ্ন হইয়া সমস্ত জল হস্ত হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। বারম্বার চেষ্টা করিয়াও তখন তিনি ঐ বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়েন নাই এবং দুঃখিত অন্তরে ক্রন্দন করিয়া পরলোকগতা জননীকে নিজ অসামর্থ্য নিবেদন করিয়াছিলেন। পরে এক পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছিলেন, গলিত-কর্ম্ম অবস্থা হইলে অথবা আধ্যাত্মিক উন্নতিতে স্বভাবতঃ কর্ম্ম এককালে উঠিয়া যাইলে ঐরূপ হইয়া থাকে; শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান না করিতে পারিলেও, তখন ঐরূপ ব্যক্তিকে দোষ স্পর্শে না।

মাতৃবিয়োগ হইলে ঠাকুরের তর্পণ করিতে যাইয়া তৎকরণে অপারগ হওয়া। তাঁহার গলিত-কর্ম্মাবস্থা।

ঠাকুরের মাতৃবিয়োগের একবৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছায় তাঁহার জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। সন ১২৮১ সালের চৈত্র মাসের মধ্যভাগে, ইংরাজী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ঠাকুরের প্রাণে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতা শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে দেখিবার বাসনা উদয় হইয়াছিল। যোগারূঢ় ঠাকুর উহাতে শ্রীশ্রীমাতার ইঙ্গিত দেখিয়াছিলেন এবং শ্রীযুত কেশব তখন কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে বেলঘরে নামক স্থানে শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেন মহাশয়ের উদ্যানবাটিকায় সশিষ্যে সাধনভজনে নিযুক্ত আছেন জানিতে পারিয়া, হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া ঐ উদ্যানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি, তাঁহারা কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের গাড়ীতে করিয়া গমন করিয়াছিলেন এবং অপরাহ্ণে আন্দাজ এক ঘটিকার সময় ঐ স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন। ঠাকুরের পরিধানে সে দিন একখানি লালপেড়ে কাপড় মাত্র ছিল এবং উহার কোঁচার খুঁটটি তাঁহার বাম স্কন্ধোপরি লম্বিত হইয়া পৃষ্ঠদেশে ঝুলিতেছিল।

ঠাকুরের কেশববাবুকে দেখিতে গমন।

গাড়ী হইতে নামিয়া হৃদয় দেখিলেন, শ্রীযুক্ত কেশব অনুচরবর্গের সহিত উদ্যানমধ্যস্থ পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে বসিয়া আছেন। অগ্রসর হইয়া তিনি তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, 'আমার মাতুল হরিকথা ও হরিগুণগান শুনিতে বড় ভালবাসেন এবং উহা শ্রবণ করিতে করিতে মহাভাবে তাঁহার সমাধি হইয়া থাকে; আপনার নাম শুনিয়া আপনার মুখে ঈশ্বরগুণাকীর্ত্তন শুনিতে তিনি এখানে আগমন করিয়াছেন, আদেশ পাইলে তাঁহাকে এখানে লইয়া আসিব।' শ্রীযুত কেশব সম্মতিপ্রকাশ করিলে, হৃদয় গাড়ী হইতে ঠাকুরকে নামাইয়া সঙ্গে লইয়া তথায়

বেলঘরিয়া উদ্যানে কেশব।

উপস্থিত হইলেন। কেশব প্রভৃতি সকলে ঠাকুরকে দেখিবার জন্য এতক্ষণ উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া এখন স্থির করিলেন, ইনি সামান্য ব্যক্তি মাত্র।

ঠাকুর কেশবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'বাবু তোমরা নাকি ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া থাক। ঐ দর্শন কিরূপ, তাহা জানিতে বাসনা, সেজন্য তোমাদিগের নিকটে আসিয়াছি।' ঐরূপে সৎপ্রসঙ্গ আরব্ধ হইল। ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত কথার উত্তরে শ্রীযুত কেশব কি বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর যে, "কে জানে মন কালী কেমন—ষড়্‌দর্শনে মিলে না"-রূপ রামপ্রসাদী সঙ্গীতটি গাহিতে গাহিতে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, একথা আমরা হৃদয়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। ঠাকুরের ভাবাবস্থা দেখিয়া তখন কেশব প্রভৃতি সকলে উহাকে আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থা বলিয়া মনে করেন নাই; ভাবিয়াছিলেন, উহা মিথ্যা ভাণ বা মস্তিষ্কের বিকার-প্রসূত। সে যাহা হউক, ঠাকুরের বাহ্যচৈতন্য আনয়নের জন্য হৃদয় তাঁহার কর্ণে এখন প্রণব শুনাইতে লাগিলেন এবং উহা শুনিতে শুনিতে তাঁহার মুখমণ্ডল মধুর হাস্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ঐরূপে অর্দ্ধবাহ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর এখন গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়সকল সামান্য সামান্য দৃষ্টান্ত সহায়ে এমন সরল ভাষায় বুঝাইতে লাগিলেন যে, সকলে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। স্নানাহারের সময় অতীত হইয়া ক্রমে পুনরায় উপাসনার সময় উপস্থিত হইতে বসিয়াছে, সে কথা কাহারও মনে হইল না। ঠাকুর তাঁহাদিগের ঐ প্রকার ভাব দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "গরুর পালে অন্য কোন পশু আসিলে, তাহারা তাহাকে গুঁতাইতে যায়, কিন্তু গরু আসিলে গা চাটাচাটি করে—আমাদের আজ সেইরূপ হইয়াছে।" অনন্তর কেশবকে

কেশবের সহিত প্রথমালাপ।

সম্বোধন করিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "তোমার ল্যাজ্ খসিয়াছে!" শ্রীযুত কেশবের অনুচরবর্গ ঐ কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, যেন অসন্তুষ্ট হইয়াছে দেখিয়া ঠাকুর তখন ঐ কথার অর্থ বুঝাইয়া সকলকে মোহিত করিলেন। বলিলেন, "দেখ, ব্যাঙাচির যতদিন ল্যাজ্ থাকে, ততদিন সে জলেই থাকে স্থলে উঠিতে পারে না, কিন্তু ল্যাজ যখন খসিয়া পড়ে, তখন জলেও থাকিতে পারে, ড্যাঙ্গাতেও বিচরণ করিতে পারে—সেইরূপ মানুষের যতদিন অবিদ্যারূপ ল্যাজ্ থাকে, ততদিন সে সংসারজলেই কেবল থাকিতে পারে; ঐ ল্যাজ্ খসিয়া পড়িলে, সংসার এবং সচ্চিদানন্দ উভয় বিষয়েই ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারে। কেশব তোমার মন এখন ঐরূপ হইয়াছে' উহা সংসারেও থাকিতে পারে এবং সচ্চিদানন্দেও যাইতে পারে।" ঐরূপে নানাপ্রসঙ্গে অনেকক্ষণ অতিবাহিত করিয়া ঠাকুর সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন।

ঠাকুরের দর্শন পাইবার পরে শ্রীযুত কেশবের মন তাঁহার প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, এখন হইতে তিনি প্রায়ই ঠাকুরের পুণ্যদর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আগমন করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে তাঁহার কলিকাতার 'কমল কুটীর' নামক বাটীতে লইয়া যাইয়া তাঁহার দিব্যসঙ্গ লাভে আপনাকে সৌভাগ্যবান বিবেচনা করিতেন। ঠাকুর ও কেশবের সম্বন্ধ, ক্রমে এত গভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, পরস্পর পরস্পরকে কয়েক দিন দেখিতে না পাইলে উভয়েই বিশেষ অভাব বোধ করিতেন; তখন ঠাকুর কলিকাতায় তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেন অথবা শ্রীযুক্ত কেশব দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিতেন। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের সময় প্রতি বৎসর ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়া অথবা ঠাকুরকে

ঠাকুর ও কেশবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

লইয়া যাইয়া তাঁহার সহিত ঈশ্বর প্রসঙ্গে একদিন অতিবাহিতকরাকে শ্রীযুক্ত কেশব ঐ উৎসবের অঙ্গমধ্যে পরিগণিত করিতেন। ঐরূপে অনেকবার তিনি ঐ সময়ে জাহাজে করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বদলবলে দক্ষিণেশ্বরে আগমন পূর্ব্বক ঠাকুরকে উহাতে উঠাইয়া লইয়া তাঁহার অমৃতময় উপদেশ শুনিতে শুনিতে গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া কেশবের আচরণ।

দক্ষিণেশ্বরে আগমনকালে শ্রীযুত কেশব শাস্ত্রীয় প্রথা স্মরণ করিয়া কখন রিক্তহস্তে আসিতেন না, ফলমূলাদি কিছু আনয়নপূর্ব্বক ঠাকুরের সম্মুখে রক্ষা করিতেন এবং অনুগত শিষ্যের ন্যায় তাঁহার পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইতেন। ঠাকুর রহস্য করিয়া তাঁহাকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "কেশব, তুমি এত লোককে বক্তৃতায় মুগ্ধ কর, আমাকে কিছু বল।" শ্রীযুত কেশব তাহাতে বিনীতভাবে উত্তর করিয়াছিলেন, 'মহাশয়, আমি কি কামারের দোকানে ছুঁচ বেচিতে বসিব। আপনি বলুন, আমি শুনি। আপনার মুখের দুই চারিটি কথা লোককে বলিবামাত্র তাহারা মুগ্ধ হয়।'

ঠাকুরের কেশবকে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ এবং ভাগবত, ভক্ত, ভগবান, তিনে এক, একে তিন—বুঝান।

ঠাকুর একদিন কেশবকে দক্ষিণেশ্বরে বুঝাইয়াছিলেন যে, ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মশক্তির অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হয় এবং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি সর্ব্বদা অভেদ ভাবে অবস্থিত। শ্রীযুত কেশব ঠাকুরের ঐ কথা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। অনন্তর ঠাকুর তাঁহাকে বলেন যে, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির সম্বন্ধের ন্যায় ভাগবত, ভক্ত ও ভগবানরূপ তিন পদার্থ অভিন্ন বা নিত্যযুক্ত—ভাগবত, ভক্ত, ভগবান্, তিনে এক, একে তিন। কেশব তাঁহার ঐ কথা বুঝিয়া উহাও অঙ্গীকার করিয়া লইলেন। অতঃপর ঠাকুর তাঁহাকে

বলিলেন, 'গুরু, কৃষ্ণ, ও বৈষ্ণব তিনে এক, একে তিন—তোমাকে এখন একথা বুঝাইয়া দিতেছি।' কেশব তাহাতে কি চিন্তা করিয়া বলিতে পারি না, বিনয়নম্রবচনে বলিলেন 'মহাশয়, পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন, তাহার অধিক এখন আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, অতএব বর্ত্তমানপ্রসঙ্গ এখন আর উত্থাপনে প্রয়োজন নাই।' ঠাকুরও তাহাতে বলিলেন, "বেশ বেশ, এখন ঐ পর্য্যন্ত থাক্।" ঐরূপে পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত শ্রীযুত কেশবের মন ঠাকুরের দিব্য সঙ্গলাভে জীবনে বিশেষালোক উপলব্ধি করিয়াছিল এবং বৈদিক ধর্ম্মের সার রহস্য দিন দিন বুঝিতে পারিয়া সাধনায় নিমগ্ন হইয়াছিল। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার পর হইতে তাঁহার ধর্ম্মমত দিন দিন পরিবর্ত্তিত হওয়ায় ঐকথা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।

আঘাত না পাইলে মানবমন সংসার হইতে উত্থিত হইয়া ঈশ্বরকে নিজ সর্ব্বস্ব বলিয়া ধারণে সমর্থ হয় না। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার প্রায় তিন বৎসর পরে শ্রীযুত কেশব কুচবিহার প্রদেশের রাজার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া ঐরূপ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ বিবাহ লইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে বিশেষান্দোলন উপস্থিত হইয়া উহাকে বিভক্ত করিয়া ফেলে এবং শ্রীযুত কেশবের বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা আপনাদিগকে পৃথক্ করিয়া সাধারণ সমাজ নাম দিয়া অন্য এক নূতন সমাজের সৃষ্টি করিয়া বসেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া সামান্য বিষয় লইয়া উভয় পক্ষীয়গণের ঐরূপ বিরোধ শ্রবণে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। কন্যার বিবাহযোগ্য বয়স সম্বন্ধীয় ব্রহ্মসমাজের নিয়ম শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ঈশ্বরেচ্ছাধীন ব্যাপার। উহাদিগকে কঠিন নিয়মে নিবদ্ধ করা চলে না; কেশব কেন ঐরূপ করিতে গিয়াছিল! কুচবিহার-বিবাহের

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ৬ই মার্চ কুচবিহার বিবাহ। ঐ কালে আঘাত পাইয়া কেশবের আধ্যাত্মিক গভীরতা লাভ। ঐ বিবাহ সম্বন্ধে ঠাকুরের মত।

কথা তুলিয়া ঠাকুরের নিকটে যদি কেহ শ্রীযুত কেশবের নিন্দাবাদ করিত, তাহা হইলে তিনি তাহাকে উত্তরে বলিতেন, কেশব উহাতে নিন্দনীয় এমন কি করিয়াছে? কেশব সংসারী, নিজ পুত্রকন্যাগণের যাহাতে কল্যাণ হয়, তাহা করিবে না? সংসারী ব্যক্তি ধর্ম্মপথে থাকিয়া ঐরূপ করিলে নিন্দার কথা কি আছে? কেশব উহাতে ধর্ম্মহানিকর কিছুই করে নাই, পরন্তু পিতার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে। ঠাকুর ঐরূপে সংসারধর্ম্মের দিক দিয়া দেখিয়া কেশবকৃত ঐ ঘটনা নির্দ্দোষ বলিয়া সর্ব্বদা প্রতিপন্ন করিতেন। সে যাহা হউক, কুচবিহার-বিবাহ-রূপ ঘটনায় বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া শ্রীযুত কেশব যে আপনাতে আপনি ডুবিয়া যাইয়া দিন দিন আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত শ্রীযুক্ত কেশব ঠাকুরের বিশেষ ভালবাসা প্রাপ্ত হইয়া এবং তাঁহাকে দেখিবার বহু অবসর পাইয়াও কিন্তু তাঁহাকে সম্যক বুঝিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ। কারণ দেখা যায়, এক পক্ষে তিনি ঠাকুরকে জীবন্ত ধর্ম্মমূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞান করিতেন—নিজ বাটীতে লইয়া যাইয়া তিনি যেখানে শয়ন, ভোজন, উপবেশন ও সমাজের কল্যাণ চিন্তা করিতেন সেই সকল স্থান ঠাকুরকে স্বয়ং দেখাইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে বলিয়াছিলেন, যাহাতে ঐ সকল স্থানের কোথাও অবস্থান করিয়া তাঁহার মন ঈশ্বরকে ভুলিয়া সংসারচিন্তা না করে—আবার যেখানে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেন, ঠাকুরকে সেখানে লইয়া যাইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন।* দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্ব্বক 'জয় বিধানের জয়' বলিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতে আমাদিগের অনেকে তাঁহাকে দেখিয়াছে।

ঠাকুরের ভাব কেশব সম্পূর্ণরূপে ধরিতে পারেন নাই। ঠাকুরের সম্বন্ধে কেশবের দুই প্রকার আচরণ।

* শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে আমরা এই ঘটনা শুনিয়াছি।

সেইরূপ অন্যপক্ষে আবার দেখা গিয়াছে, তিনি ঠাকুরের 'সর্ব্ব ধর্ম্ম সত্য—যত মত, তত পথ'-রূপ বাক্য সম্যক্ লইতে না পারিয়া, নিজ বুদ্ধির সহায়ে সকল ধর্ম্মমত হইতে সারভাগ গ্রহণ এবং অসারভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক 'নববিধান' আখ্যা দিয়া এক নূতনমতের স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার কিছুকাল পরে উক্ত মতের আবির্ভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়, শ্রীযুত কেশব ঠাকুরের সর্ব্বধর্ম্মমত-সম্বন্ধীয় চরম মীমাংসা-টিকে ঐরূপ আংশিকভাবে প্রচার করিয়াছিলেন।

নববিধান ও ঠাকুরের মত

পাশ্চাত্যবিদ্যা ও সভ্যতার প্রবল তরঙ্গ আসিয়া ভারতের প্রাচীন ব্রহ্মবিদ্যা ও সামাজিক রীতি নীতি প্রভৃতির যখন আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিতে বসিল, তখন ভারতের প্রত্যেক মনীষী ব্যক্তি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও ধর্ম্ম প্রভৃতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনয়নের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশব প্রভৃতি মনীষিগণ বঙ্গদেশে যেমন ঐ চেষ্টায় জীবনপাত করিয়াছেন, ভারতের অন্যত্রও সেইরূপ অনেক মহাত্মার ঐরূপ করিবার কথা শ্রুতি-গোচর হয়। কিন্তু ঠাকুরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাঁহাদিগের কেহই ঐবিষয়ে সম্পূর্ণ সমাধান করিয়া যাইতে পারেন নাই। ঠাকুরের নিজ জীবনে ভারতের ধর্ম্মমতসমূহের সাধনা যথাযথ সম্পন্ন করিয়া এবং উহাদিগের প্রত্যেকে সাফল্য লাভ করিয়া বুঝিলেন যে, ভারতের ধর্ম্ম ভারতের অবনতির কারণ নহে; উহার কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। দেখাইলেন যে, ঐ ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়াই ভারতের সমাজ, রীতি, নীতি, সভ্যতা প্রভৃতি সকল বিষয় দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রাচীনকালে ভারতকে গৌরবসম্পদে প্রতি-ষ্ঠিত করিয়াছিল। এখনও ঐ ধর্ম্মের সেই জীবন্ত শক্তি রহিয়াছে এবং

ভারতের জাতীয় সমস্যা ঠাকুরই সমাধান করিয়াছেন।

উহাকে সর্ব্বতোভাবে অবলম্বন করিয়া আমরা সকল বিষয়ে সচেষ্ট হইলে, তবেই সকল বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে পারিব, নতুবা নহে। ঐ ধর্ম্ম যে মানবকে কতদূর উদার করিতে পারে, তাহা ঠাকুর সর্ব্বাগ্রে নিজ জীবনাদর্শে দেখাইয়া যাইলেন, পরে, পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত নিজ শিষ্য-বর্গের বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের ভিতর ঐ উদার ধর্ম্মশক্তি সঞ্চার-পূর্ব্বক তাহাদিগকে সংসারের সকল কার্য্য কি ভাবে ধর্ম্মের সহায়করূপে সম্পন্ন করিতে হইবে তদ্বিষয়ে শিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক ভারতের পূর্ব্বোক্ত জাতীয় সমস্যার এক অপূর্ব্ব সমাধান করিয়া যাইলেন। সর্ব্ব ধর্ম্মমতের সাধনে সাফল্যলাভ করিয়া ঠাকুর যেমন পৃথিবীর আধ্যাত্মিক বিরোধ তিরোহিত করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন—ভারতীয় সকল ধর্ম্মমতের সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তেমনি আবার তিনি ভারতের ধর্ম্মবিরোধ নাশপূর্ব্বক কোন্ বিষয়াবলম্বনে আমাদিগের জাতিত্ব সর্ব্বকাল প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে থাকিবে, তদ্বিষয়ের নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

কেশবের দেহত্যাগে ঠাকুরের আচরণ।

সে যাহা হউক, শ্রীযুত কেশবের প্রতি ঠাকুরের ভালবাসা কতদূর গভীর ছিল, তাহা আমরা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জানু-য়ারী মাসে কেশবের শরীর-রক্ষার পরে ঠাকুরের আচরণে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ঐ সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমি তিন দিন শয্যা ত্যাগ করিতে পারি নাই; মনে হইয়াছিল, যেন আমার একটা অঙ্গ (পক্ষাঘাতে) পড়িয়া গিয়াছে।"

কেশবের সহিত প্রথম পরিচয়ের পরে ঠাকুরের জীবনের অন্য একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করিয়া আমরা বর্ত্তমান অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিব। ঠাকুরের ঐ সময়ে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সর্ব্বজন-মোহকর নগরসঙ্কীর্ত্তন দেখিতে বাসনা হইয়াছিল, শ্রীশ্রীজগদম্বা

তখন তাঁহাকে নিম্নলিখিত ভাবে ঐ বিষয় দেখাইয়া পূর্ণমনোরথ করিয়াছিলেন—নিজ গৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া ঠাকুর দেখিয়াছিলেন, পঞ্চবটীর দিক হইতে, ঐ অদ্ভুত সঙ্কীর্ত্তন-তরঙ্গ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া দক্ষিণেশ্বর-উদ্যানের প্রধান ফটকের দিকে প্রবাহিত হইতেছে এবং বৃক্ষান্তরালে লীন হইয়া যাইতেছে; দেখিলেন নবদ্বীপ-চন্দ্র শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে সঙ্গে লইয়া ঈশ্বরপ্রেমে তন্ময় হইয়া ঐ জনতরঙ্গের মধ্যভাগে ধীরপদে আগমন করিতেছেন এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ সকলে তাঁহার প্রেমে তন্ময় হইয়া কেহ বা অবশ ভাবে এবং কেহ বা উদ্দাম তাণ্ডবে আপনাপন অন্তরের উল্লাস প্রকাশ করিতেছে! এত জনতা হইয়াছে যে, মনে হইতেছে, লোকের যেন আর অন্ত নাই। ঐ অদ্ভুত সঙ্কীর্ত্তনদলের ভিতর কয়েকখানি মুখ ঠাকুরের স্মৃতিপটে উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল এবং ঐ দর্শনের কিছুকাল পরে তাহাদিগকে নিজ ভক্তরূপে আগমন করিতে দেখিয়া, ঠাকুর তাহাদিগের সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, পূর্ব্বজীবনে তাহারা শ্রীচৈতন্যদেবের সাঙ্গোপাঙ্গ ছিল।

ঠাকুরের সংকীর্ত্তনে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দর্শন।

সে যাহা হউক, ঐ দর্শনের কিছুকাল পরে ঠাকুর কামারপুকুরে এবং হৃদয়ের বাটী সিহড়গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত স্থানের কয়েক ক্রোশ দূরে ফুলুই-শ্যামবাজার নামক স্থান। সেখানে অনেক বৈষ্ণবের বসতি আছে এবং তাহারা নিত্য কীর্ত্তনাদি করিয়া ঐস্থানকে আনন্দপূর্ণ করে শুনিয়া, ঠাকুরের ঐস্থানে যাইয়া কীর্ত্তন শুনিতে অভিলাষ হয়। শ্যামবাজার গ্রামের পার্শ্বেই বেলটে নামক গ্রাম। ঐ গ্রামের শ্রীযুক্ত নটবর গোস্বামী ঠাকুরকে ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার বাটীতে পদধূলি দিবার জন্য নিমন্ত্রণও করিয়া-

ছিলেন। ঠাকুর এখন হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাটীতে যাইয়া সাতদিন অবস্থানপূর্ব্বক শ্যামবাজারের বৈষ্ণব-সকলের কীর্ত্তনানন্দ দর্শন করিয়াছিলেন। উক্ত স্থানের শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মল্লিক তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহাকে নিজ বাটীতে কীর্ত্তনানন্দে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। কীর্ত্তনকালে

ঠাকুরের ফুলুই-শ্যামবাজারে গমন ও অপূর্ব্ব কীর্ত্তনানন্দ। ঐ ঘটনার সময় নিরূপণ।

তাঁহার অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া বৈষ্ণবেরা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করে এবং ক্রমে সর্ব্বত্র ঐকথা প্রচার হইয়া পড়ে। শুধু শ্যামবাজার গ্রামেই যে ঐ কথা প্রচার হইয়াছিল, তাহা নহে,—রামজীবনপুর, কৃষ্ণগঞ্জ প্রভৃতি চতুষ্পার্শ্বস্থ দূর দূরান্তর গ্রামসকলেও ঐ কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। ক্রমে ঐ সকল গ্রাম হইতে দলে দলে সঙ্কীর্ত্তনদলসমূহ তাঁহার সহিত আনন্দ করিতে আগমনপূর্ব্বক শ্যামবাজারকে বিষম জনতাপূর্ণ করে এবং দিবারাত্র কীর্ত্তন চলিতে থাকে। ক্রমে রব উঠিয়া যায় যে, একজন ভগবদ্ভক্ত এইক্ষণে মৃত এবং পরক্ষণেই জীবিত হইয়া উঠিতেছে। তখন ঠাকুরকে দর্শনের জন্য লোকে গাছে চড়িয়া, ঘরের চালে উঠিয়া আহার নিদ্রা ভুলিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। ঐরূপে তিন দিন দিবারাত্র তথায় আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হইয়া লোকে ঠাকুরকে দেখিবার ও তাঁহার পদস্পর্শ করিবার জন্য যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং ঠাকুর স্নানাহারের অবকাশ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হসেন নাই। পরে হৃদয় তাঁহাকে লইয়া লুকাইয়া সিহড়ে পলাইয়া আসিলে, ঐ আনন্দমেলার অবসান হয়। শ্যামবাজার গ্রামের ঈশান চৌধুরী, নটবর গোস্বামী, ঈশান মল্লিক, শ্রীনাথ মল্লিক প্রভৃতি ব্যক্তিসকল ও তাঁহাদের বংশধরগণ ঐ ঘটনার কথা এখনও উল্লেখ করিয়া থাকেন এবং ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। কৃষ্ণগঞ্জের প্রসিদ্ধ খোলবাদক শ্রীযুত রাইচরণ দাসের সহিতও ঠাকুরের পরিচয়

হইয়াছিল। ইঁহার খোলবাদন শুনিলেই ঠাকুরের ভাবাবেশ হইত। ঘটনাটির পূর্ব্বোক্ত বিবরণ আমরা কিয়দংশ ঠাকুরের নিকটে এবং কিয়দংশ হৃদয়ের নিকটে শ্রবণ করিয়াছিলাম। উহার সময় নিরূপণ করিতে নিম্নলিখিত ভাবে সক্ষম হইয়াছি--

বরাহনগর আলামবাজারনিবাসী ঠাকুরের পরমভক্ত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ পাল কবিরাজ মহাশয়, কেশববাবুর পরে ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, ঠাকুরকে যখন তিনি প্রথমবার দর্শন করিতে গমন করেন, তখন ঠাকুর ঐ ঘটনার পরে সিহড় হইতে অল্পদিন মাত্র ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ঠাকুর ঐদিন শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবুর নিকট ফুলুই-শ্যামবাজারের ঘটনার কথা গল্প করিয়াছিলেন।

৺যোগানন্দ স্বামিজীর বাটী দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের অনতিদূরে ছিল। সেজন্য তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিলে, ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তগণ সন ১২৮৫ সাল, ইংরাজী ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার নিকটে আগমন করিতে আরম্ভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ সন ১২৮৭ সালে, ইংরাজী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন। উহার অনতিকাল পরে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসের প্রথম তারিখে শ্রীমতী জগদম্বা দাসী মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঐ ঘটনার ছয় মাস আন্দাজ পরে হৃদয় বুদ্ধি-হীনতা-বশতঃ মথুরবাবুর স্বল্পবয়স্কা পৌত্রীর চরণ পূজা করে। কন্যার পিতা উহাতে তাহার অকল্যাণ আশঙ্কা করিয়া বিশেষ রুষ্ট হয়েন এবং হৃদয়কে কালীবাটীর কর্ম্ম হইতে চিরকালের জন্য অবসর প্রদান করেন।
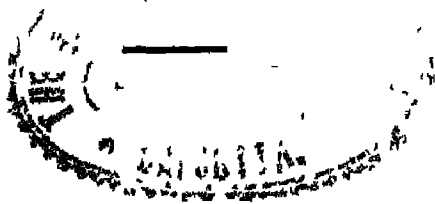
পুস্তকস্থ ঘটনাবলীর সময়নিরূপণের তালিকা।

ঠাকুরের জন্ম, সন ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন, বুধবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে, ইংরাজী ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রাত্রি ৪টার সময় হইয়াছিল।

সন	খৃষ্টাব্দ	ঘটনা।
১২৫৯	১৮৫২—১৮৫৩	কলিকাতার চতুষ্পাঠীতে আগমন। (ঠাকুরের বয়স ১৬ পূর্ণ হইয়া কয়েক মাস।)
১২৬০	১৮৫৩—১৮৫৪	চতুষ্পাঠীতে বাস, পাঠ ও পূজাদি।
১২৬১	১৮৫৪—১৮৫৫	ঐ ঐ
১২৬২	১৮৫৫—১৮৫৬	১৮ই জ্যৈষ্ঠ দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা; বিষ্ণুবিগ্রহ ভগ্ন হওয়া, ঠাকুরের বিষ্ণুঘরের পূজকের পদগ্রহণ; ১৪ই ভাদ্র, ইং ২৯শে আগষ্ট রাণীর দেবসেবার জন্য জমীদারী কেনা; কেনারাম ভট্টের নিকট ঠাকুরের দীক্ষা গ্রহণ; রামকুমারের মৃত্যু।
১২৬৩	১৮৫৬—১৮৫৭	ঠাকুরের ৺কালীর পূজকের পদ ও হৃদয়ের বিষ্ণুপূজকের পদ গ্রহণ; ঠাকুরের পাপপুরুষ দগ্ধ হওয়া ও গাত্রদাহ; ঠাকুরের প্রথমবার দেবোন্মত্তভাব ও দর্শন; ভূকৈলাসের বৈদ্যের ঔষধ সেবন।
১২৬৪	১৮৫৭—১৮৫৮	ঠাকুরের রাগানুগা পূজা দেখিয়া মথুরের আশ্চর্য্য হওয়া; ঠাকুরের রাণী রাসমণিকে

		দণ্ড দান ; হলধারীর পূজকরূপে নিযুক্ত হওয়া ও ঠাকুরকে অভিশাপ।
১২৬৫	১৮৫৮—১৮৫৯	আশ্বিন বা কার্ত্তিকে ঠাকুরের কামারপুকুর গমন , চণ্ড নামান।
১২৬৬	১৮৫৯—১৮৬০	বৈশাখ মাসে ঠাকুরের বিবাহ।
১২৬৭	১৮৬০—১৮৬১	ঠাকুরের দ্বিতীয়বার জয়রামবাটী গমন, পরে কলিকাতায় প্রত্যাগমন, মথুরের শিব ও কালীরূপে ঠাকুরকে দর্শন ; ঠাকুরের দ্বিতীয়বার দেবোন্মত্ততা ও কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদের চিকিৎসা ; ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রাণী রাসমণির দেবোত্তর দলিলে সহি করা ও পরদিন মৃত্যু।
১২৬৮	১৮৬১—১৮৬২	ঠাকুরের জননীর বুড়ো শিবের নিকটে হত্যা দেওয়া। ব্রাহ্মণীর আগমন ও ঠাকুরের তন্ত্রসাধন আরম্ভ।
১২৬৯	১৮৬২—১৮৬৩	ঠাকুরের তন্ত্রসাধন।
১২৭০	১৮৬৩—১৮৬৪	ঠাকুরের তন্ত্রসাধন সম্পূর্ণ হওয়া , পদ্মলোচন পণ্ডিতের সহিত দেখা ; মথুরের অন্নমেরু অনুষ্ঠান ; ঠাকুরের জননীর গঙ্গাবাস করিতে আগমন।
১২৭১	১৮৬৪—১৮৬৫	জটাধারীর আগমন, ঠাকুরে বাৎসল্য ও মধুর ভাব সাধন ; তোতাপুরীর আগমন ও ঠাকুরের সন্ন্যাসগ্রহণ।
১২৭২	১৮৬৫—১৮৬৬	হলধারীর কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ ও অক্ষয়ের পূজকের পদ গ্রহণ ; শ্রীমৎ

		তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বর হইতে চলিয়া যাওয়া।
১২৭৩	১৮৬৬—১৮৬৭	ঠাকুরের ছয়মাস কাল অদ্বৈত-ভূমিতে অবস্থান সম্পূর্ণ হওয়া; শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর কঠিন পীড়া আরোগ্য করা; পরে ঠাকুরের শারীরিক পীড়া ও মুসলমানধর্ম্ম সাধন।
১২৭৪	১৮৬৭—১৮৬৮	ব্রাহ্মণী ও হৃদয়ের সহিত ঠাকুরের কামারপুকুরে গমন; শ্রীশ্রীমার কামারপুকুরে আগমন; অগ্রহায়ণ মাসে ঠাকুরের কলিকাতায় প্রত্যাগমন ও মাঘ মাসে তীর্থযাত্রা।
১২৭৫	১৮৬৮—১৮৬৯	জ্যৈষ্ঠ মাসে ঠাকুরের তীর্থ হইতে ফিরা; হৃদয়ের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু, দুর্গোৎসব ও দ্বিতীয়বার বিবাহ।
১২৭৬	১৮৬৯—১৮৭০	অক্ষয়ের বিবাহ ও মৃত্যু।
১২৭৭	১৮৭০—১৮৭১	ঠাকুরের মথুরের বাটীতে ও গুরুগৃহে গমন, কলুটোলায় শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আসন গ্রহণ, পরে কালনা, নবদ্বীপ ও ভগবান দাস বাবাজীকে দর্শন।
১২৭৮	১৮৭১—১৮৭২	জুলাই মাসের ১৬ই তারিখে (১লা শ্রাবণ) মথুরের মৃত্যু। ফাল্গুন মাসে রাত্রি ৯টার সময় শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন।
১২৭৯	১৮৭২—১৮৭৩	শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে বাস।
১২৮০	১৮৭৩—১৮৭৪	জ্যৈষ্ঠ মাসে ঠাকুরের ৺ষোড়শী-পূজা, শ্রীশ্রীমার গৌরী পণ্ডিতকে দর্শন ও আন্দাজ আশ্বিনে

		(১৮৭৩, সেপ্টেম্বর) কামারপুকুরে প্রত্যাগমন। অগ্রহায়ণে রামেশ্বরের মৃত্যু।
১২৮১	১৮৭৪—১৮৭৫	(আন্দাজ ১৮৭৪ এপ্রিল) শ্রীশ্রীমার দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আসা ; শম্ভু মল্লিকের ঘর করিয়া দেওয়া, চানকে ৺অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা। ঠাকুরের শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনকে প্রথমবার দেখা।
১২৮২	১৮৭৫—১৮৭৬	(আন্দাজ ১৮৭৫, নবেম্বর) পীড়িতা হইয়া শ্রীশ্রীমার পিত্রালয়ে গমন ; ঠাকুরের জননীর মৃত্যু।
১২৮৩	১৮৭৬—১৮৭৭	কেশবের সহিত ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।
১২৮৪	১৮৭৭—১৮৭৮	ঐ ঐ (আন্দাজ ১৮৭৭ নবেম্বর) শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও হৃদয়ের কটু কথায় পুনরায় ঐ দিবসই চলিয়া যাওয়া।
১২৮৫	১৮৭৮—১৮৭৯	ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তগণের আগমন আরম্ভ।
১২৮৬	১৮৭৯—১৮৮০	শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীর ঠাকুরের নিকট আগমন।
১২৮৭	১৮৮০—১৮৮১	শ্রীশ্রীমার পুনরায় দক্ষিণেশ্বর আগমন। শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর মৃত্যু ; হৃদয়ের পদচ্যুতি ও দক্ষিণেশ্বর হইতে অন্যত্র গমন।